কাণ্ডজ্ঞান

তারাপদ রায়

সমতট প্রকাশনী

প্রচ্ছদশিল্পী : পূর্ণিমা সিংহ
প্রথম প্রকাশ : ১ এপ্রিল ১৯৫৮

প্রকাশক : অর্ঘ্যকুসুম দত্তগুপ্ত
সমতট প্রকাশনী
১৭২ রাসবিহারী এভেনিউ
ফ্ল্যাট ৩০২ কলকাতা ২৯

মুদ্রক : শ্রীগোপাল দে
শ্রীগোপাল প্রিণ্টিং ওয়ার্কস
২৫/১এ কালিদাস সিংহী লেন কলকাতা ৯
গ্রন্থনকারী : মুখার্জি বাইণ্ডিং ওয়ার্কস
১২ হরচন্দ্র মল্লিক স্ট্রীট কলকাতা ৫

স্বাতী ও সুনীলকে

এই লেখকের অন্যান্য বই :

নীলদিগন্তে এখন ম্যাজিক
ডোডো-তাতাই পালা কাহিনী

সূচীপত্র

চুরিবিদ্যা

নাবালক বয়েসে এ বিষয়ে একটি লেখা লিখেছিলাম। সম্ভবত সেটাই ছিলো আমার প্রথম রম্যরচনা। এতো বিষয় থাকতে ঐ নিষ্পাপ বয়েসে আমি কেন চুরিবিদ্যার উপরে আমার প্রথম গদ্যটি লিখেছিলাম সেটা যাঁর যেমন ইচ্ছে অনুমান করতে পারেন।

কিন্তু আমার এখনো স্পষ্ট মনে আছে। ঐ লেখাটি লিখতে গিয়ে আমি প্রভূত আনন্দ পেয়েছিলাম। লিখতে লিখতে টের পেয়েছিলাম তস্করবৃত্তির প্রতি আমার একটা সহজাত টান রয়েছে। আজ এতদিন পরে ঐ একই

বিষয়ে আবার লিখতে বসে বুঝতে পারছি, টান যতটাই থাকুক, তখন আমি এ বিষয়ে প্রায় কিছুই জানতাম না। ইতিমধ্যে দীর্ঘ পঁচিশ বছরে সঙ্গদোষে এবং কালদোষে বহু বিখ্যাত তস্করের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে ; অপর দিকে তস্করেরা এবং তস্করবান্ধব বহু কোতোয়াল সাহেবও আমার খুবই ঘনিষ্ঠ।

আমি আমার এই চুরিবিদ্যায় আপাতত শুধু খাঁটি চোরেদের কথা বলবো, আসল ও আদি চোরের দুঃখের কথা। এর মধ্যে ঠগ-জোচ্চোর-প্রতারকদের টেনে আনবো না, তার জন্যে পরে কখনো সময় পেলে চেষ্টা করবো।

চোর দুই রকম। এক পুরুষের নতুন চোর অথবা বংশানুক্রমে বনেদি চোর-বংশের সন্তান।

এই এক পুরুষের নতুন চোরদেরই কষ্ট বেশী। আজকাল সিঁদকাঠি দুর্লভ, যা দু-একটা গভীর রাতের অন্ধকারে কামারশালার পিছনের ঝোপে লুকিয়ে থেকে মশার কামড় খেয়ে কিনতে হয় তারও দাম সাংঘাতিক। কিন্তু যাঁদের বাপ-ঠাকুরদা চোর ছিলেন, তাঁরা নিশ্চয় উত্তরাধিকারসূত্রে জার্মান স্টিলের সিঁদকাঠি পেয়েছেন, সে রকম আজকাল আর কোথায় পাওয়া যাবে? আর তা ছাড়া, এখনকার কাঁচালোহার সিঁদকাঠির উপর ঠিক নির্ভর করা যায় না। তিন ইটের গাঁথুনি দেয়ালের দুটো ইট মাথার ঘাম পায়ে ফেলে খুলে ফেলেছেন এমন সময় সিঁদকাঠিটি গেলো ভেঙে, তখন সব পরিশ্রমই মাটি। তবে কলকাতার প্রেসিডেন্সি জেলে আজ কিছুদিন হলো এক দক্ষিণী চোর এসেছেন, তাঁর কাছে জানা গেছে মাদ্রাজ-বোম্বাইতে নাকি এখন স্টেনলেস স্টিলের সিঁদকাঠি পাওয়া যায়, সে যেমন সুন্দর দেখতে তেমনই মজবুত, দাম সামান্য বেশী। নতুন চোরেদের হয়তো এর পর থেকে সিঁদকাঠির সমস্যা থাকবে না।

কিন্তু অন্যান্য সমস্যা?

কালো হাফ প্যাণ্ট আর কালো স্যাণ্ডো গেঞ্জি পরে চুরি করতে যাওয়াই বহু পুরনো বিধি। কিন্তু কালো রঙের স্যাণ্ডো গেঞ্জি আজকাল

একেবারেই পাওয়া যায় না, কেন যে গেঞ্জির কলগুলি এ রকম গেঞ্জি উৎপাদন বন্ধ করে দিয়েছে, তাদের সঙ্গে এ বিষয়ে পুলিসের কোনো যোগ-সাজস আছে কি না, বলা যায় না। অনেকে বাধ্য হয়ে সাদা গেঞ্জি কিনে দ্বিগুণ খরচ করে শালকরের কাছ থেকে কালো রঙ করিয়ে নিচ্ছেন। এতে শুধু পয়সা বেশী লাগছে তাই নয়, যে শালকরের কাছেই সাদা স্যাণ্ডো গেঞ্জি কালো রঙ করতে দেওয়া হোক সে এমন মর্মভেদী দৃষ্টি নিক্ষেপ করে যে, সঙ্গে সঙ্গে বোঝা যায় যে সে সবই অনুমান করতে পারছে।

তবে কালো হাফ প্যান্টের ব্যাপারটা একটু কম জটিল। কালো হাফ-প্যান্ট চেষ্টা করলে বাজারে অল্পবিস্তর পাওয়া যায়। কিছু কিছু বিদ্যালয়ে সাদা হাফ শার্ট আর কালো হাফ প্যান্ট ইউনিফর্ম রয়েছে। আর নতুন যুগের অতিরিক্ত ভিটামিন ও প্রোটিনে এবং সচ্ছল জনকজননীর ব্যাপক স্নেহে আজকাল বহু বালকই অতি নাছুসনুছুস, তাদের ইউনিফর্মের প্যান্ট যে কোনো প্রাপ্তবয়স্ক তস্করকেই চমৎকার ফিট করে। একটা ছোট অসুবিধা রয়েছে যে প্যান্টের সঙ্গে ঐ ইউনিফর্মের দোকান থেকে একটা সাদা হাফ শার্ট এবং একজোড়া সাদা মোজাও কিনতে হয়।

এত খরচ না বাড়িয়ে হরিষা মার্কেটে অথবা কোনো মঙ্গলবার সময় করে হাওড়া হাটে গেলে শুধু কালো হাফপ্যান্টই সংগ্রহ করা যেতে পারে। একটা দুশ্চিন্তা থেকে যায়, অনেক সময় এ সব প্যান্টের রঙ খুব কাঁচা থাকে। একবার ধুতে গেলে আর কালোত্ব থাকে না, কালো খড়ির গুঁড়োর মত রঙ বেরোয়, এমনিতে কাঁচা কিন্তু অন্য কোনো কাপড়চোপড়ে লেগে গেলে সেখানে খুব পাকা, আর কিছুতেই উঠবে না।

চুরি করার তো সময়-অসময় নেই, স্থান-অস্থান নেই। একবার নতুন কালো হাফপ্যান্ট পরে একটা বাড়ির পিছনের রেন-পাইপ ধরে ঝুলতে ঝুলতে একজন চোর গৃহস্থদের ঘুমানোর জন্যে প্রতীক্ষা করছিলেন। এমন সময় প্রচণ্ড বৃষ্টি এলো, বৃষ্টিতে ভিজে তার নতুন প্যান্ট থেকে কালো পিচ্ছিল এক তরল পদার্থ বেরোতে লাগল। পিছল হয়ে যাওয়ার জন্যে তাঁর হাঁটু স্লিপ করতে লাগলো, তিনি আর রেন-পাইপ আঁকড়ে ধরে

রাখতে পারলেন না, হুড়কে নিচে পড়ে গেলেন।

আরেকবার আরেকজন ঐ রকম একটা নতুন প্যাণ্ট একবার পরার পর কাচতে গিয়ে এক পুকুর জল কালো করে ফেলেছিলেন। পাড়ার লোকেরা যেই বুঝতে পারলো এটা তাঁরই কীর্তি, এই মারে কি সেই মারে!

আসলে এভাবে চলে না, চলতে পারে না। এই বৃত্তি থেকে ক্রমশ লোক সরে যাচ্ছে, নানা বাধা ও অসুবিধার জন্যে এই প্রাচীন বিদ্যা ক্রমশ অবলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। ধরা পড়া, মার খাওয়া অথবা জেলখাটা এগুলো সনাতন সমস্যা, যাকে ইংরেজিতে বলে নর্মাল প্রফেশনাল হ্যাজার্ড—এ তো থাকবেই, এ নিয়ে কোনো প্রকৃত চোর মাথা ঘামায় না।

কিন্তু চুরি করার পোশাক, সিঁদকাঠি—এগুলি হলো আসল সমস্যা। তা ছাড়া, যেটা এখনো বলা হয়নি, গায়ে মাখা তেলের ব্যাপারটা আছে।

চুরি করতে গেলে গায়ে তেল মাখতেই হবে। এটা বহু পরীক্ষিত এবং সর্বসম্মত অতি পুরনো রীতি। দেহ তৈলাক্ত থাকার জন্যে কত চোর যে আজ পর্যন্ত শেষ মুহূর্তে রক্ষা পেয়েছেন তার ইয়ত্তা নেই।

তেল যে খুব বেশি লাগে তা নয়। সারা শরীরে তেল মাখতে নেই, সেটা অনেক সময় ব্যক্তিগত অসুবিধার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তেল মাখতে হয় ঊর্ধ্বাঙ্গে, দুই হাতে কবজি পর্যন্ত, বিশেষ করে ঘাড়ে, গলায় ও পিঠে। আর আজকালকার নতুন যুগের চোরেরা যাঁরা পুরোনোদের মতো কদমছাঁট দেন না, মাথায় মজা করে বড় চুল রেখেছেন, তাঁদের মাথার চুলেও তেল মাখাতে হবে।

আগেকার দিনে পাওয়া যেতো ক্রিম রঙের বিলিতি গ্রীজ। কি ভালো জিনিস ছিলো সেটা, আর কি চমৎকার মৌচাক-মৌচাক গন্ধ বেরোত গ্রীজটা দিয়ে। আর দামও ছিলো বেশ ন্যায্য। যাঁরা পুরনো চোর তাঁদের মনে আছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে পর্যন্ত নিউমার্কেটে ম্যাকফারলন সাহেবের দোকানে ক্রিমরঙা গ্রীজের এক পাউণ্ডের কৌটো পাওয়া যেতো ঠিক দেড় টাকায়। প্যাঁচপ্যাচে ছিলো না, গা কুটকুট করতো না। খুব সুবিধা ছিলো এই গ্রীজটায়।

আর আজকাল ঐ রকম গ্রীজ কোথায় পাওয়া যাবে! একালের চোরেরা ও সব জিনিস জন্মেও চোখে দেখেননি। তাঁরা গায়ে মাখেন পোড়া মবিল-অয়েল, তারও দাম এক বাটি তিন টাকা। সাংঘাতিক কুটকুটে এবং বিষাক্ত দ্রব্য এটি। এই পোড়া মবিলের কল্যাণে শত সহস্র নিরপরাধ তস্করের টাকায় চর্মরোগের ডাক্তারদের বিশাল রমরমাও চলছে। প্রায় সব চোরের গায়ে ঘা-পাঁচড়া, কিছুতেই সারতে চায় না। আর চুরির পরে ঐ তেল শরীর থেকে তোলা কম কঠিন নাকি!

এর মধ্যে যাঁরা শৌখিন কিংবা বড়লোক চোর আছেন, তাঁরা কেউ কেউ গায়ে হোয়াইট ভেসলিন মাখতে শুরু করেছেন, কিন্তু তারও দাম চড়তে চড়তে এক ছোট কৌটো চার টাকা-সাড়ে চার টাকায় পৌঁছেছে।

অবস্থা ক্রমশ এমন জায়গায় পৌঁছাচ্ছে যে চৌর্যবৃত্তির দিকে এখন নতুন লোককে আকর্ষণ করানো রীতিমতো অসম্ভব হয়ে যাচ্ছে আর পুরনো যাঁরা আছেন, জেলের বাইরে আছেন, তাঁরাও ক্রমশ এই রোমাঞ্চকর কাজে তাঁদের উৎসাহ হারিয়ে ফেলছেন। যে উদ্দীপনা নিয়ে একদিন তাঁরা একটি সফল চুরির জন্যে রাতের পর রাত অধীর প্রতীক্ষা করতেন এই দুর্দিনের বাজারে সেই উত্তেজনা আজ কোথায়!

কুকুরের বকলস

আমাদের কুকুরের বকলসটি ছিঁড়ে গেছে। বকলসের কোনো দোষ নেই, কুকুরটিকেও দোষ দেওয়া উচিত হবে না। বকলসটির বয়েস হয়েছে, আমাদের এই বলবান নামে কুকুরটি যে এখন প্রায় বুড়ো হতে চললো, বকলসটির বয়েস তার থেকেও বেশি। বকলসটি ছিলো বলবানের মা মদালসার। মা মরে যাওয়ার পর বলবান এই বকলসটি উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করে। তার আগে পর্যন্ত বলবানের কোনো বকলস ছিলো না।

আজ বেশ কিছুদিন হলো বকলসটির খুবই জীর্ণ অবস্থা চলছিলো। কিন্তু

কিনি কিনি করেও কেনা হয়ে উঠছিলো না। কবে সুদূর অতীতে আমার ছোট ভাই বকলসটি কোথা থেকে কিনে এনেছিলো। সে'ও অনেকদিন কলকাতায় নেই। কিন্তু আমি জানি না বকলস কোথায় পাওয়া যায়। আমার স্ত্রী-পুত্রেরও এ বিষয়ে কোনো ধারণা নেই।

অথচ একটা বকলস না কিনলেই নয়। প্রাকৃতিক প্রয়োজনে বলবানকে দুবেলা রাস্তায় একটু নিয়ে যেতেই হয় আর তখন এই অর্ধোম্মাদ প্রৌঢ় কুকুরটিকে বকলসবিহীন গলায় শুধু শিকলে বেঁধে নেওয়া সোজা নয়।

প্রথমে চেষ্টা করেছিলাম ছিন্ন বকলসটি সারাতে। যে চর্মকারের কাছে গিয়েছিলাম তিনি পঞ্চাশ পয়সায় সারিয়ে দিতে রাজী হয়েছিলেন কিন্তু জিনিসটা হাতে নিয়ে কি ভেবে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এটা কার ?' তিনি হয়তো ভেবেছিলেন ওটা কোনো মানুষের গলার, হয়তো ভেবেছিলেন ওটা আমারই গলায় শোভা পায়। তাই যখন শুনলেন ওটা কুকুরের গলার,

তিনি বকলসটি দশ হাত দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তাঁর কাঠের বাক্সের পাশে দুবার থু্‌ থু্‌ ফেলে ছি ছি করতে লাগলেন, বললেন, 'কুকুরের দ্রব্য আমরা স্পর্শ করি না।' তাঁর উত্তেজনা দেখে ভয় পেয়ে গেলাম, তাড়াতাড়ি পালিয়ে আসতে গিয়ে ছেঁড়া বকলসটি উদ্ধার করে আনা হলো না।

সুতরাং এবার একটি নতুন বকলস সংগ্রহ করতেই হবে। কিন্তু বকলস কোথায় পাওয়া যায়? পাড়ার মোড়ে একটা দোকানে লোহার জিনিস-পত্রের সঙ্গে কুকুরের শিকল বিক্রি হয়। সেখানে গিয়ে বকলসের খোঁজ করলাম। তাঁরা বললেন, 'যদি লোহার বকলস দরকার হয় তবে অর্ডার দিলে বানিয়ে দিতে পারি। কিন্তু চামড়ার কোনো জিনিস আমরা রাখি না।' চলে আসছিলাম, তাঁরা আমাকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে বললেন, 'লোহার জিনিস যখন যা দরকার হয় আসবেন। চোরের হাতকড়া থেকে পাগল বেঁধে রাখার শিকল—সবই বানিয়ে দিতে পারবো।' 'আপাতত এ সব দরকার নেই,' এই বলে দোকান থেকে বেরিয়ে পড়লাম।

বিকেলে অফিস থেকে বাড়ি ফিরে বাজারে গেলাম। প্রথমে গেলাম চামড়ার সুটকেশ ব্যাগের দোকানে। কিন্তু তাঁদের কাছে কুকুরের বকলস নেই। তবে তাঁরা বললেন উল্টো দিকের ফুটপাথে একটা ছোট দোকানে কোমরের বেল্ট বিক্রি হয়, সেখানে খোঁজ করা যেতে পারে। সেখানে গেলাম, দুঃখের কথা, সেখানেও কুকুরের বকলস নেই। ছোট বেল্ট হলে চলবে কি না বিবেচনা করতে গিয়ে দেখলাম কোনো মানুষের কোমর, এমন কি কোনো বালকের কোমরও কুকুরের গলার মতো সরু নয়। আর বেল্ট কেটে বকলস বানালে আমাদের বলবানের মর্যাদাহানি হবে।

ক্লান্ত হয়ে বাড়ি ফিরে এলাম। পরের দিন অফিসে এক ভদ্রলোক বললেন, তিনি দেখেছেন চিৎপুরের মোড়ে একটা দোকানে কুকুরের বকলস বিক্রি হয়। অফিসফেরতা যথাস্থানে গেলাম। কিন্তু কোথায় সেই বকলস-বিপণি। খুঁজতে খুঁজতে দেখি একটা সিঁড়ির উপরে লুঙ্গি পরা, গেঞ্জি গায়ে এক ভদ্রলোক তিনটি সদ্য চোখ ফোটা কুকুরছানা কোলে করে আদর করছেন। তাঁর পায়ের কাছেও আরো গোটা কয়েক ছানা শুয়ে রয়েছে,

একটু দূরে একাধিক কুকুর, তার মধ্যে একটি নিশ্চয় এই কুকুর শাবকগুলির জননী, নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে।

আমি বুঝতে পারলাম এই ভদ্রলোকই পারবেন কুকুরের বকলসের দোকানের হদিশ দিতে। কিন্তু আমার জিজ্ঞাসা শুনেই ভদ্রলোক খেপে উঠলেন। তাঁর চেঁচামেচি থেকে যেটুকু বোধগম্য হলো, তা হলো যে কুকুরের মতো নিরীহ প্রাণীকে বকলস দিয়ে বন্দী করে রাখা অমার্জনীয় দোষ, শুধু অমানুষেই এ রকম নিষ্ঠুর কাজ করতে পারে। কুকুরের বকলসের দোকান কোথায় তা তিনি জানেন না, না জানাই ভাল। কারণ জানতে পারলে তিনি সেই দোকানে আগুন লাগিয়ে দেবেন। ভদ্রলোকের গর্জন শুনে ঘুমন্ত কুকুরগুলি উঠে এসে আমাকে পর্যায়ক্রমে শুঁকতে লাগলো। আমি আস্তে আস্তে পিছু হটে শেষে এক লাফে একটা উল্টো ট্রামে উঠে পড়লাম।

পরের দিন সকালে বিছানার শুয়ে ভাবতে ভাবতে বকলস সম্পর্কে একটা বুদ্ধি এলো। ময়দানে অনেক লোক কুকুর নিয়ে আসে, সব কুকুরের গলাতেই বকলস। এদের কারো প্রভুকে জিজ্ঞাসা করলেই জানা যাবে কোথায় সেই রহস্যময় বকলস-ভাণ্ডার। সুতরাং ময়দানে গেলাম। অনেক কুকুর মন দিয়ে দেখলাম, তাদের গলার বকলস রীতিমতো পর্যবেক্ষণ করলাম, শেষে একটি চমৎকার অ্যালসেশিয়ান কুকুরের গলায় পিতলের বুটি বসানো কালো চামড়ার ঝকঝকে বকলসটি খুব পছন্দ হলো। মনে মনে কল্পনা করলাম এই রকম অলঙ্কারে আমাদের বলবানকে কেমন মানাবে। অ্যালসেশিয়ানটির প্রভু একটু দূরেই হাফপ্যান্ট পরে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে এক বিচিত্র উপায়ে দ্রুতগতিতে দৌড়োচ্ছিলেন। দৌড়োচ্ছিলেন কিন্তু একটুও এগোচ্ছিলেন না, অতীব কৌশলে স্থিতাবস্থা বজায় রাখছিলেন। প্রায় দশ মিনিট অপেক্ষা করার পর তাঁর দৌড় থামলো। আমি তাঁর দিকে একটু এগিয়ে গেলাম, কিন্তু আমি এতক্ষণ খেয়াল করিনি যে, অ্যালসেশিয়ানটিকে আমি যখন দেখছিলাম সে'ও আমাকে দেখছিলো। আমি যেই তার প্রভুর দিকে একটু এগিয়েছি সে আমার উপর বিদ্যুৎ গতিতে ঝাঁপিয়ে পড়লো। শিক্ষিত কুকুর, কামড়ালো না, আঁচড়ালো না কিন্তু তার

ধাক্কায় আমি চিত হয়ে ঘাসের উপর পড়ে গেলাম। প্রচণ্ড লাগলো, ভয়ও পেয়েছিলাম খুব। বিশাল একটা কালো দৈত্যের মতো কুকুর, কে ভয় পাবে না?

কুকুরটির প্রভু আমার দিকে এগিয়ে এসে বললেন, 'ভয় পাবেন না। কামড়াবে না।' চিরকাল আমার কুকুরই অন্যদের লাঞ্ছিত করেছে এবং এই-রকম স্তোকবাক্য আমি দিয়েছি, আজ এতকাল পরে ঠিক তার বিপরীত হলো।

আমি আস্তে উঠে বসতে যাচ্ছিলাম। ভদ্রলোক তাড়াতাড়ি হাত নেড়ে বললেন, 'আরে সর্বনাশ! এখন উঠতে যাবেন না। দেখছেন না টাইগার কেমন ফুঁসছে। আবার ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। আপনি এক কাজ করুন, আস্তে আস্তে ঘাসের উপর দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে ঐ বকুলগাছটার পিছনে সরে যান।' তিনি অঙ্গুলি নির্দেশ করে প্রায় একশো মিটার দূরবর্তী বকুল গাছটি দেখালেন।

প্রাণরক্ষার জন্যে বাধ্য হয়ে আমাকে ভদ্রলোকের নির্দেশ মানতে হলো। এই অবস্থায় বকলসের দোকানের খবর আর নেওয়া হলো না। বুক দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে সুদূর বকুলগাছের নিরাপত্তার দিকে সন্তর্পণে এগোতে লাগলাম। টাইগার নামক অ্যালসেশিয়ানটি আমার এই পশ্চাদ-পসরণ হিংস্র দৃষ্টিতে লক্ষ রাখতে লাগলো। তার প্রভু মহোদয় ইতিমধ্যে আবার সেই আশ্চর্য স্থির দৌড় আরম্ভ করে দিয়েছেন।

ছেঁচড়িয়ে ছেঁচড়িয়ে আমি মিনিটে এক মিটার গতিতে চলতে লাগলাম। আমার দুই স্থূলাঙ্গিনী প্রতিবেশিনী অতিরিক্ত গোলগাপ্পি কিংবা বাটাটাপুরী ভোজনের ক্যালরি পোড়ানোর জন্যে দ্রুত হাঁটছিলেন ময়দানের মধ্যে দিয়ে। হঠাৎ আমাকে দেখতে পেয়ে, আমার এই পরিণতি দেখে তাঁরা থমকে দাঁড়ালেন। ঘাস থেকে মাথা তুলে কি একটা ব্যাখ্যা দিতে যাচ্ছিলাম। টাইগারের স্থির চোখের দিকে চোখ পড়তেই বুকের রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে গেলো। আবার গড়াতে লাগলাম।

নৈশকাহিনী
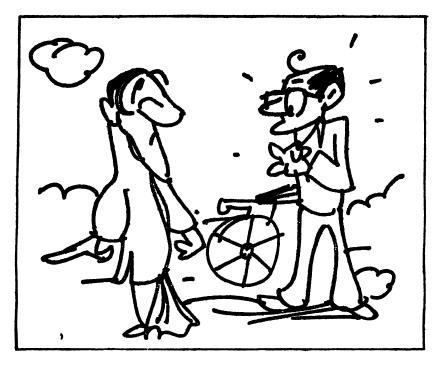
আমার এই নৈশকাহিনী রাত্রির কোনো ঘটনা নিয়ে নয়। আমার এই কাহিনীর বিষয়বস্তু হলো নেশা।

আমার বিষয় অবশ্য ঠিক নেশা নয়, নেশার পরিমাপ নিয়ে এই আলোচনা। এক টিপ নস্যি, আড়াই প্যাকেট সিগারেট, তিন হেঁচকির জর্দা, সাত ছিলিম গাঁজা কিংবা চার পেগ হুইস্কি—একেক রকম নেশার সামগ্রীর মাপ হয় একেকভাবে—অন্তত এতকাল এই ছিলো আমার সাবেকি ধারণা।

আমার সেই ধারণা গত রবিবার ধূলিসাৎ হয়ে গেছে। যথারীতি রবিবার দিন বিকেলে হাঁটতে বেরিয়েছিলাম। ফেরার পথে, তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে, হঠাৎ প্রায় বিনা নোটিশে প্রবল ঝড়-বৃষ্টি শুরু হলো। জায়গাটা জগুবাবুর

বাজারের কাছাকাছি, চারদিকে পাতাল রেলের গর্ত, কাদা-জল, লোহা-ইট। দৌড়নো দূরের কথা, এর মধ্যে তাড়াতাড়ি হাঁটাও বিপজ্জনক। একটু দূরেই ডি. এন. মিত্র স্কোয়ার, যা লোকমুখে বহুদিন হলো গাঁজা পার্ক বলে পরিচিত। স্কোয়ারটি কয়েক বছর হলো পাতাল রেলের দখলে, কিন্তু তার নাম বা নামকরণের কারণ এখনো বদলায় নি।

কোনো উপায় ছিল না। জলে ভিজে একেবারে চোপসানো অবস্থায় স্কোয়ারের সামনের ছাদ-ঢাকা, বাঁশের বেড়া দেওয়া পুরনো ঘরটার চাতালে যথাসাধ্য ছুটে গিয়ে আশ্রয় নিলাম। বৃষ্টি ও বাতাসের হাত থেকে সামান্য রক্ষা পাওয়া গেলো।

চাতালের এদিক-ওদিকে কয়েকটি চক্র বসেছে। আট-দশ জন করে একেকটি চক্র। নানা বয়েসের, নানা চেহারার অনেক রকম লোক, সকলেই ঘাস খাচ্ছেন। ঘাস মানে ইংরেজি গ্রাস, গ্রাস মানে গাঁজা। মদের আড্ডার সঙ্গে গাঁজার আড্ডার পার্থক্য হলো যে এখানে সকলেই নিঃশব্দ। নিঃশব্দে একজনের হাত থেকে অন্যের হাতে কলকে চলে যাচ্ছে, তিনি চার-পাঁচ টান দিয়ে পরের জনের হাতে তুলে দিচ্ছেন। রাস্তার মুচি, অফিসের বাবু, বাসের পকেটমার সকলে পাশাপাশি গোল হয়ে বসে। রসদ ফুরিয়ে গেলে, সঙ্গে সঙ্গে সবাই পয়সা দিয়ে আবার পুরিয়া এনে কলকে ভরে নিচ্ছে। সকলেই শিবনেত্র, কেউ কেউ সম্পূর্ণ চোখ বুজে আত্মস্থ, শুধু সময়মতো হাত উঠে যাচ্ছে পার্শ্ববর্তীর কাছ থেকে কলকে গ্রহণের জন্য। বৃষ্টিভেজা বাতাস আমোদিত হয়ে উঠেছে গঞ্জিকাধূম্রের ঘন গন্ধে।

এখানে খুব বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলে একা একাই নেশা হয়ে যাবে। অথচ বৃষ্টি আরো জোরে এসেছে এবং বাতাস অন্তত একশো কিলোমিটার বেগে বইছে। বাইরের ঝড়-বৃষ্টি থেকে মাথা বাঁচিয়ে এবং গঞ্জিকাচক্রের ধোঁয়া থেকে নাক বাঁচিয়ে একটা পাশে কোনোরকমে দাঁড়িয়ে ছিলাম, এমন সময়ে এক ভদ্রলোক আমার পাশে এসে দাঁড়ালেন।

একটু আগেই ভদ্রলোককে দেখেছি নিমীলিত নয়নে খুব আয়েসের সঙ্গে দুজন পাতাল রেলের মিস্ত্রীর মাঝখানে বসে ধূমপান উপভোগ করছিলেন।

তাঁর বোধহয় নেশা করা শেষ হয়েছে, এবার বাড়ি ফিরবেন বলে উঠে এসেছেন।

বৃষ্টির মধ্যে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থাকলে যা হয়, একটু পরেই আমাদের মধ্যে আলাপ শুরু হলো। ভদ্রলোক নিজেই উপযাচক হয়ে আমার সঙ্গে আলাপ করলেন।

ভদ্রলোকের উপাধি ভুলে গেছি। যতদূর মনে পড়ছে নাম বলেছিলেন ভূপতি। ভূপতিবাবু মধ্যবয়সী, রোগা পাকাটে চেহারা। সামান্য ময়লা তাঁতের ধুতি ও আদ্দির পাঞ্জাবি গায়ে। দেখলেই বোঝা যায় উৎসব অনুষ্ঠানে এঁর পাঞ্জাবিতে গিলে করা থাকে এবং গলায় পাকানো চাদর থাকে। মোটামুটি ভাবে কলকাতার আধা বনেদি পুরনো লোক। কথা-বার্তায় প্রকাশ পেলো শ দেড়েক হাতে-টানা রিকশা ছিলো ভূপতিবাবুর এই দু-চার মাস আগেও। তার মধ্যে একটির মাত্র লাইসেন্স ছিলো। সেই একটি লাইসেন্সেই দেড়শোটি গাড়ি চলতো। এখন পুলিসের অত্যাচারে সত্তরটা রিকশা নিজেদের পুরনো বাড়ির উঠোনে লুকিয়ে ফেলেছেন। গোটা তিরিশেক রিকশা ভবানীপুর আর বালিগঞ্জ থানায় ধরে নিয়ে গেছে। দিনকাল ভালো যাচ্ছে না, তাই সময় পেলেই দুঃখ-চিন্তা ভুলতে এখানে এসে এক ছিলিম গাঁজা টেনে যান।

কিছুক্ষণ কথাবার্তার পরে, বৃষ্টি তখন একটু ধরে এসেছে, হাওয়ার বেগও বেশ কম, ভূপতিবাবু রাস্তায় নামলেন, আমিও নামলাম। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, ভদ্রতার খাতিরে এমনি একটা প্রশ্ন, 'বাড়ি যাচ্ছেন?' ভূপতিবাবু একটু থেমে উত্তর দিলেন, 'এই সন্ধ্যাবেলা বাড়ি যাবো কি মশায়? ঐ গলির মধ্যে ময়রার দোকানে একটু দুধ খেতে যাচ্ছি। গাঁজার সঙ্গে দুধটা দরকার।' হঠাৎ ভূপতিবাবু কথা পালটিয়ে আমাকে বললেন, 'আপনি বোধহয় ভাবছেন ভদ্রলোক গাঁজা খায় কি করে?' আমি তাড়াতাড়ি বললাম, 'না না, সেকি কথা!' ভূপতিবাবু কিন্তু আমার দিকে এগিয়ে এলেন, বললেন, 'দেখুন মশায়, আমাকে ভুল বুঝবেন না। সব রকম নেশা-ভাং করে দেখেছি, অনেক মদ খেয়েছি, নামকরা মাতাল ছিলাম আমি, এই

ভবানীপুরের সব ডাকসাঁইটে মাতালেরা আমাকে দেখে লুকিয়ে পড়তো। কিন্তু গাঁজা, গাঁজার সঙ্গে কারো তুলনা হয় না।'

ভর সন্ধ্যায়, বৃষ্টির মধ্যে গেঁজেলের পাল্লা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে ভদ্রতাসূচক কি একটা মৃদু আপত্তি জানিয়ে আমি কেটে পড়ার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু ভূপতিবাবু ছাড়ার পাত্র নন। তিনি আমাকে চেপে ধরলেন, সত্যি সত্যি আমার হাত ধরে দাঁড়িয়ে পড়লেন, বললেন, 'কোন্ নেশা বড়, কোন্টা ছোট—এ নিয়ে যার যা ইচ্ছে বলে কিন্তু এ বিষয়ে আমি বিস্তর চিন্তা করেছি, মনে মনে অনেক গবেষণা করেছি, অবশেষে একটা বৈজ্ঞানিক হিসেব বের করেছি আর সেই হিসেবে গাঁজাই সর্বোত্তম।'

'আপনার এই বৈজ্ঞানিক হিসেবটা কি রকম?'

বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে ভূপতিবাবু বললেন, 'আরে মশায়, নেশা মাপতে হবে আঙুল দিয়ে।'

'আঙুল দিয়ে!' আমি একটু বিস্মিত হলাম, তারপর একটু ভেবে নিয়ে বললাম, 'হ্যাঁ, মদ কিংবা সিদ্ধির সরবত আঙুল দিয়ে মাপা যেতে পারে। মদের বেলায় দু' আঙুলে এক পেগ, তিন আঙুলে দেড় পেগ, এ রকম হিসেব হতে পারে।'

আমাকে কথা শেষ করতে দিলেন না ভূপতিবাবু, উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'থামুন তো, খালি মদ আর মদ। আপনারা ফরসা জামা-কাপড়-ওলা লোকেরা খালি মদের কথা বলেন। মদ তো পাঁচ-আঙুলে নেশা।'

আমি আকাশের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে বললাম, 'পাঁচ-আঙুলে নেশা আবার কি?'

'অশথতলার নেশা বুঝতে পারছেন না', ভূপতিবাবু এবার নিজের বিষয় পেয়ে গিয়ে আমাকে প্রাঞ্জলভাবে বোঝাতে লাগলেন, 'যত বেশি আঙুল তত বেশি উচ্চমানের নেশা। সবচেয়ে খারাপ নেশা হলো এক আঙুলের। দেখবেন ওড়িয়া পানের দোকানে পাওয়া যায়, কালো মতন খবরের কাগজে জড়িয়ে বেচে, গুড়াকু, আঙুলে লাগিয়ে দাঁত মাজতে হয়, এটা হলো সবচেয়ে নিকৃষ্ট নেশা।' একটু থেমে ভূপতিবাবু বললেন, 'এর চেয়ে

খারাপ অবশ্য চা। মাত্র আধ আঙুলের ব্যাপার। একটা আঙুল অর্ধেক করে পেয়ালার হাতলে ঢুকিয়ে দিলেই হলো। তবে চা ঠিক নেশা নয়।' বলে ভূপতিবাবু আমার দিকে তাকিয়ে একটু শুকনো হাসলেন, বোধহয় ওঁর সন্দেহ হচ্ছিল আমি খুব চা-খোর, ওঁর বিশ্লেষণে দুঃখিত হতে পারি। কিন্তু তিনি আর আমাকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে ব্যাখ্যা করে যেতে লাগলেন, 'এর পরেই আসে নস্যি, দু' আঙুলের নেশা। দু' আঙুল দিয়ে এক টিপ নাকে ঢোকানো, অতি বিশ্রী, নিচু নেশা মশায়। এর চেয়ে সিগারেট একটু ভালো। বিড়িও ঐ একই। দু' আঙুলে ধরে বুড়ো আঙুল অর্ধেক কাত করে মুখে দিয়ে টান, ঐ আড়াই আঙুলের নেশা খুব উঁচু জাতের নয়, তবে ফেলনাও নয়।'

ভূপতিবাবুর এই বিশ্লেষণ কখন শেষ হবে কে জানে, এদিকে আবার বৃষ্টি এসে গেলো মনে হচ্ছে অথচ শুনতেও খারাপ লাগছে না, এরকম আগে আর কখনো শুনিনি তো। ভূপতিবাবু সামান্য বিরতি দিয়ে আবার শুরু করে দিয়েছেন, 'এর মধ্যে আরো অনেক রকম নেশা আছে সে সব বাদ দিচ্ছি। আপনি মদের কথা বলছিলেন, মদ হলো পাঁচ-আঙুলে নেশা। পাঁচ আঙুলে গেলাস ধরে মুখে তুলতে হবে। সোজা বোতল থেকে গলায় ঢেলে খেলেও ঐ পাঁচ আঙুল। সিদ্ধির সরবতও অবশ্য তাই। দুটোই ভালো জাতের নেশা। তবে গাঁজার কাছে কিছু নয়।' এই বলে দুটো হাত জোড় করে একটি কাল্পনিক কলকে মুখের কাছে ধরে দুবার জোরে জোরে টান দিয়ে বললেন, 'একেবারে পুরো দশ আঙুলের নেশা। দু' হাতের দশ আঙুলে কলকে ধরতে হবে। এর চেয়ে বড় নেশা হয় না।'

বৃষ্টি প্রায় এসে গেলো আবার, চলে আসছিলাম, ভূপতিবাবু হাতের মুঠোটা দিয়ে আমার কবজিটা শক্ত করে ধরে বললেন, 'শেষ কথাটা শুনে যান, কুড়ি আঙুলের নেশা, সেও ঐ গাঁজাই। কাটিহারের মেলায় গেলে দেখবেন, অশত্থতলায় দারুণ ভিড়, ছিলিম মহারাজ গাঁজা খাচ্ছেন। দুই হাতে এক কলকে, দুই পায়ে এক কলকে। দুই হাত, দুই পা, দুই কলকে এসে গেছে মুখে, বৃশ্চিকাসনে গঞ্জিকা সেবন করছেন ছিলিম মহারাজ, দুই

কলকে দিয়ে গলগল করে ধোঁয়া বেরোচ্ছে।'

এতক্ষণে প্রচণ্ড বৃষ্টি এসে গেছে। ভূপতিবাবুর হাত এক ঝাঁকুনি দিয়ে ছাড়িয়ে নিয়ে আবার ভিজতে ভিজতে বাড়ির দিকে এগোলাম।

কাঠবাদাম

আমার মাতামহের একটা অ্যালুমিনিয়মের লাঠি ছিলো। এই আশ্চর্য জিনিসটি তিনি কোন জায়গা থেকে সংগ্রহ করেছিলেন তা আমার জানা নেই। বেত, বাঁশ, লোহা বা কাঠের অনেক রকম লাঠি আমি জীবনে দেখেছি। কিন্তু ওই রকম অ্যালুমিনিয়মের একটি যষ্টি এখন পর্যন্ত দেখি নি।

যেখানে যে অবস্থায় থাকি, যত রাতেই ঘুমোতে যাই না কেন, খুব ভোরবেলায় আমার ঘুম ভেঙে যায়। আর ঘুম ভেঙে গেলে আমি

বিছানায় থাকতে পারি না। তা ছাড়া আজকাল কলকাতার বাড়িতে আমার পক্ষে ভোরবেলায় জেগে কিংবা ঘুমিয়ে বিছানায় শুয়ে থাকা অসম্ভব। আমার একটি দুর্বিনীত কুকুর আছে, যার কথা অনেক সময় বলেছি। আকাশ ক্ষীণ সাদা হওয়া মাত্র সে জেগে ওঠে, তারপর দুবার হাই তুলে, তিনবার ডন-বৈঠক করে আমার মাথার কাছে এসে কুঁ কুঁ করে। এতে যদি কিছু ফল না পায় তা হলে হাতখানেক পিছিয়ে গিয়ে মৃদু ঘেউ ঘেউ করে। এর পরেও যদি আমি না উঠি, সে হয় আমার বালিশ অথবা গায়ে চাদর থাকলে সেই চাদর কামড়িয়ে টেনে নিতে থাকে। বিছানার চাদর ধরে কখনোই টানাটানি করে না, কারণ ঐ একই চাদরে আমার স্ত্রীও শুয়ে থাকেন। একবার বিছানার চাদর টেনে তাঁর ঘুম ভাঙিয়ে দেয়ার জন্যে ভদ্রমহিলা তাকে এমন শিক্ষা দিয়েছিলেন যে তারপর থেকে কুকুরটি আর ঐ কাজটি করে না।

সুতরাং ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠি। উঠে রাস্তায় বেড়াতে যাই। মর্নিং ওয়াক। এই মর্নিং ওয়াকের সময় কত লোকের হাতে কত রকম লাঠি, ছড়ি, স্টিক দেখি কিন্তু আমার দাদাবাবুর মতো সেই অ্যালুমিনিয়মের লাঠি আর কারো হাতে দেখলাম না। দেশে-বিদেশে নানা জায়গায়, বহু পার্কে, রাস্তায় আমি হেঁটেছি; গুপ্তি বসানো লাঠি, হকি স্টিকের মতো লাঠি, বাঘের মাথার মতো মুণ্ডওলা লাঠি অনেক দেখলাম, কিন্তু ঐ রকম একটি সাদা ঝকককে ছাতার বাঁটের মতো অর্ধচন্দ্রাকারে বাঁকানো একটি ধাতব দণ্ড আর কখনো কোথাও দেখলাম না।

অর্ধচন্দ্র এবং দণ্ড এই শব্দ দুটি আগের পঙ্‌ক্তিতে আমার অবচেতন মন থেকে কলমে বেরিয়ে এলো। ঐ অ্যালুমিনিয়মের লাঠিটি ছিলো আমার চরম নিগ্রহের উৎস।

সেই সব দিনে, আজ থেকে ঠিক পঁচিশ বছর আগে, তখন আমি সন্ত লেখাপড়ার পাঠ চুকিয়েছি। থাকতাম কালীঘাটের বাড়িতে। একাই থাকতাম, বছরে দু-এক মাস আমার মাতামহ এসে থাকতেন।

তখন আমি অনেক বেলা করে উঠতাম। এমনও কখনো কখনো হতো

ঘুম থেকে উঠে দেখতাম অফিস যাওয়ার সময় পেরিয়ে গেছে। আসলে আগের রাতে হয়তো খুব হইচই, আড্ডা হয়েছে, এটা তারই প্রতিফল।

আমার দাদাবাবু এসব সহ্য করতে পারতেন না। কাকডাকা ভোরে তিনি ঘুম থেকে উঠতেন, উঠে বেড়াতে বেরোনোর সময় আমার ঘরের জানলা দিয়ে ঐ অ্যালুমিনিয়মের লাঠি মারফত আমাকে পেটে একটি তীব্র খোঁচা দিতেন এবং সেই সঙ্গে 'লোম্পট' বলে কটূক্তি করতেন।

সে সব দিন কবে চলে গেছে। এখন নিজে থেকেই ইচ্ছায়-অনিচ্ছায়, সুখে-দুঃখে সকাল পাঁচটার মধ্যে আমি বিছানা থেকে উঠে পড়ি। তারপর মিনিট দশেকের মধ্যে দুর্দান্ত কুকুরটিকে শিকলদাবা করে ময়দানের দিকে এগোই।

আমি এখন যেখানে থাকি সেখান থেকে ময়দান বা গড়ের মাঠ কাছেই। আগে যেখানে থাকতাম তার কাছেই ছিলো লেক। লেকের তুলনায় ময়দান এক এলাহি ব্যাপার। দুটো একেবারে দুরকম। লেকের রাস্তাঘাট, জল, ভোরের সুন্দরীরা ময়দানে নেই। ময়দানে ভিড় হয় বিকেলে ও সন্ধ্যায়, সকালের ময়দান কেমন ফাঁকা-ফাঁকা। কয়েকজন আমার মতো কুকুরধারী আর কয়েকজন দেহ-সচেতন স্থূল বপু অবাঙালী মধ্যবয়সী-বয়সিনী ছাড়া সকালের ময়দানে লোকজন খুবই বিরল। সেদিক থেকে যে কোনো সকাল বেলার রবীন্দ্র সরোবর অর্থাৎ লেক মেলার মতো জমজমাট; কুকুর বা ভুঁড়ির জন্যে নয়, বহু শৌখিন ভ্রমণবিলাসী সকালের লেকে শুধু হাওয়া খেতেই যান।

আসলে এমন হতে পারে যে আমার এই তুলনা নিতান্তই একপেশে। ময়দানের ভালো দিকগুলো, যাকে প্লাস পয়েন্ট বলে, এখনো আমার চোখে পড়েনি, ময়দানের সঙ্গে আমার এখনো বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে নি।

সেদিন সকালে ঘুরতে ঘুরতে বাড়ি ফেরার সময় ময়দানের একটা বিশেষ প্লাস পয়েন্ট আমার চোখে পড়লো। ময়দানের চারদিকে ইতস্তত বহু বাদাম গাছ, কাঠবাদাম। ছোট বড় বহু গাছ। এই নতুন বর্ষায় কাঠ-বাদামগুলি সুপক্ক হয়েছে এবং গাছের নিচে ঝরে পড়ছে। অবশ্য তখন

পর্যন্ত এগুলি যে বাদামগাছ তা আমি খেয়াল করিনি। যখন দেখলাম কোনো কোনো গাছের নিচে বেশ কিছু লোক মাথা নিচু করে উবু হয়ে বসে বিশেষ ধৈর্য সহকারে কি যেন খুঁজছে, বুঝতে পারলাম না কি খুঁজছে! কারোর কোনো জিনিস হারিয়ে যেতে পারে, কিন্তু এত লোক এক সঙ্গে খুঁজছে সেটা একটু অস্বাভাবিক। হয়তো ফুল কুড়োচ্ছে, কিন্তু গাছটার দিকে তাকিয়ে দেখলাম বড় বড় কালো কালো পাতা, বকুল গাছ নয়, আর গাছে কোনো ফুল-ও নেই।

এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখলাম, দূরে কাছে আরো কয়েকটা গাছের নিচে এই রকম অনুসন্ধানী জনতা। কেউ হঠাৎ ঘাসের নিচে থেকে কি কাঁচা ড্রেনের ভিতর থেকে কিছু কুড়িয়ে তুলছেন, অন্যেরা ঈর্ষান্বিত দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকাচ্ছে।

কিছু না বুঝেই, কুকুরটাকে একটা ছোট চারাগাছের সঙ্গে বেঁধে আমিও সকলের মতো খুঁজতে লেগে গেলাম। খুঁজতে খুজতে, কি খুঁজছি সেটা অন্যদের কথাবার্তা শুনে জানতে পারলাম। কাঠবাদাম খুঁজছি। পাকা কাঠবাদাম গাছ থেকে মাটিতে পড়ছে, সেটাই সবাই খুঁজছে। মাথা উঁচু করে গাছটার দিকে তাকালাম, তা আমি গাছপালা বিশেষ চিনি না, তবু মনে হলো এটাই বাদাম গাছ।

দু-একজন যাঁরা খুঁজে পেয়েছেন, তাঁদের কাছে শুনলাম কাঠবাদাম অতি স্বাস্থ্যকর ফল, খুবই মূল্যবান। বড়বাজারে এর কেজি দু শো টাকা। একজনের হাতে ফলটির চেহারা একটু ভালো করে দেখে নিলাম। ছোটবেলার আম কুড়ানোর অভিজ্ঞতা নিয়োগ করে, গাছের গোড়ায় যেখানে খুব ভিড় সেখান থেকে বেশ দূরে গাছের শেষ মাথা বরাবর একটু নিরিবিলিতে দুর্লভ কাঠবাদামের অনুসন্ধান করতে লাগলাম।

এবং কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই ফললাভ করলাম। ঐ তো একটা ভাঙা ইটের ফালির নিচে পাশাপাশি দুটো কাঠবাদাম রয়েছে। আমি তাড়াতাড়ি নিচু হয়ে বাদাম দুটো কুড়োতে গেলাম। সঙ্গে সঙ্গে কোথায় একটা টান ধরলো, প্রথমে ভেবেছিলাম কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী পেছন থেকে

লাথি মেরেছেন, কিন্তু তা নয়, বহুদিনের অব্যবহারে কোমর থেকে শিরদাঁড়া-বাহী যে যন্ত্রপাতি সেটা বিকল হয়ে গেছে, শিরা-তন্তু-পেশী সবকিছু মিশে কেমন জট পাকিয়ে গেছে। নিচু হওয়ামাত্র সেই জটে টান পড়ে বিদ্যুতের চাবুকের মতো লাগলো সারা শরীরে। প্রসারিত ডান হাত বাদাম দুটি পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়া গেলো না। মাটি থেকে তিন ইঞ্চি উপরে হাতটা ঝুলে রইলো। এই সুযোগে পাশ থেকে এক প্রবলকায়া, সুযোগ-সন্ধানী রাজপুতানী আমার হাতের নিচ দিয়ে তাঁর হীরকাঙ্গুরীয় খচিত হাত বাড়িয়ে বাদাম দুটি নিমেষের মধ্যে তুলে নিলেন।

আমি তখন আর সোজা হয়ে দাঁড়াতেও পারছি না। আবার নিচুও হতে পারছি না। এই রকম ঘোড়ার জুতো আকৃতির এক ভিখিরি অনেক-দিন আগে হাজরা মোড়ে ভিক্ষা করতো। কোনোদিন তাকে ভুলেও এক পয়সা দিইনি। আজ এই চরম দুর্দিনে সেই হতভাগ্য ভিক্ষুকটির কথা মনে পড়লো। তখন ভাবতাম লোকটা ইচ্ছে করে ঐ রকম করছে, আজ এতদিন পরে তার কষ্ট অনুভব করতে পারলাম।

আমার বাদাম আহরণকারী সঙ্গী-সঙ্গিনীরা ফল সন্ধানে এতই ব্যস্ত যে তাঁরা আমার এই শারীরিক বিপর্যয় বুঝতে পারলেন না। কিন্তু আমার প্রভুভক্ত কুকুরটি কিছু টের পেয়েছিলো, সে শিকড় শুদ্ধ চারাগাছটি তুলে উত্তেজিত হয়ে আমার দিকে এগিয়ে এলো। ঐ রকম অর্ধ-অধঃপতিত অবস্থায় তার প্রভুকে সে কখনোই দেখে নি।

একহাতে চারাগাছের ডালে ভর দিয়ে, অন্য হাতে কুকুরের গলার বকলস আঁকড়িয়ে কোনো রকমে একটা ড্রামের মতো প্রায় গড়িয়ে গড়িয়ে বাড়ি ফিরলাম।

এখন আমার শোয়া-বসা, হাঁটাচলা সব কিছুতেই কষ্ট। ডাক্তার মর্নিং ওয়াক সম্পূর্ণ বন্ধ করে দিয়েছেন। আমিও আবার বেলা করে সাড়ে সাতটা-আটটায় ঘুম থেকে উঠি। দাদাবাবু বেঁচে থাকলে আবার আমার পেটে অ্যালুমিনিয়মের লাঠি দিয়ে খোঁচা মেরে বলতেন, ('লোম্পট')।
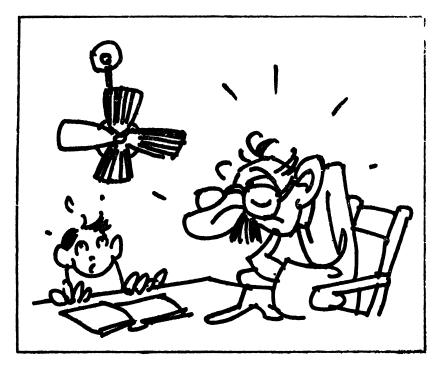
'এসি পাখা ডিসি পাখা আকাশের কানে কানে
শিশি বোতল রেগুলেটার সরু সরু গানে গানে'

কোনো পণ্ডিত পাঠক যাতে মনে না করেন যে এই অসামান্য পঙ্‌ক্তি দুটি এই ব্যর্থ কবির রচনা, সেই জন্যে প্রথমেই তাঁর ভ্রম নিরসন করা দরকার। এই শ্লোকটি মূলত সুকুমার রায়ের এবং প্রয়োজনবোধে এর কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়েছিলেন আমার স্বর্গীয় অগ্রজ। আমার দাদা সাত বছর আগে পরলোকে গিয়েছেন। তাঁকে নিয়ে রসিকতা করবো না, কিন্তু ঘটনাটা একটু বলি।

অনেকদিন কবিতা লেখা হয়নি। একটা কবিতা লেখার খুব চেষ্টা করছিলাম, কলম দিয়ে ঝলমল করে বেরিয়ে এলো,

'এসি পাখা ডিসি পাখা আকাশের কানে কানে...'

একটু পরে হৃদয়ঙ্গম হলো লিখনদেবী চান না যে আমি কবিতা লিখি, সুতরাং আবার কাণ্ডজ্ঞান।

এসি পাখা আজকাল সব বাড়িতেই আছে, কিন্তু এই শ্লোকের ডিসি পাখাটি ছিলো আমাদের কালীঘাট বাড়িতে। এই পাখাটিকে অনেকেই স্বচক্ষে দেখেছে, এই কলকাতা শহরের বহু নামকরা লোক আছেন যাঁরা এই পাখাটির হাওয়া খেয়েছেন, তাঁদের কেউ কেউ এখনো চোখ বুজে একটু চেষ্টা করলেই পাখাটিকে স্পষ্ট দেখতে পান বনবন করে ঘুরছে।

কোনো সাধারণ জিনিস ছিলো না আমাদের এই পাখাটি। অন্য পাখায় যেখানে তিনটি ব্লেড থাকে, এর ছিলো চারটি। প্রত্যেকটি এক সমকোণে নব্বুই ডিগ্রিতে পাশেরটির লম্ব। তিনটি ব্লেড ছিলো টিন বা ঐ জাতীয় কোনো ধাতুজ দ্রব্যের। কয়েক বছর পর পর একেকবার একেক রকম রঙ করতে করতে পাখাটি শেষ পর্যন্ত একটা ঝাপসা কালো রঙের চেহারা ধারণ করেছিলো। সম্পূর্ণ কালো নয়, যখন অন্ধকারে চলতো তখনও ঝাপসা ভাবটা দেখা যেতো।

এর অবশ্য অন্য একটি কারণ ছিলো। ঐ পাখাটির চতুর্থ ব্লেডটি ছিলো কাঠের এবং সেটা কি কাঠ ছিলো, ভগবান জানেন, তাতে বিশেষ কোনো রঙ ধরতো না। তা ছাড়া একবার সামান্য হালকা রঙ করার পরই কাঠের ব্লেডটি একটু বেঁকে যায়, তারপর থেকে রঙ করার সময় ওটাকে বাদ দিয়েই রঙ করা হতো।

পাখাটির গায়ে অর্ধস্পষ্ট ইংরেজি হরফে লেখা ছিলো, Government of Bengal, Excise Department, তার নিচে (98), ব্র্যাকেটেই।

আমাদের কোনো কোনো আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবের ধারণা ছিলো পাখাটি আমরা গভর্মেন্টের কোথাও থেকে চুরি করেছি। এক নীতিবাগীশ মাস্টারমশাই আমার ছোটভাই বিজনকে পড়াতেন, ঐ পাখাটাই ছিলো পড়ার জায়গায়, তিনি ওটার হাওয়া কিছুতেই খেতে চাইতেন না, এদিকে বিজনের গরমে লেখাপড়া হতো না, শেষ পর্যন্ত বিজনের লেখাপড়াটাই

বরবাদ হয়ে গেলো।

অন্য কারো কারো বিশ্বাস ছিলো যে আমার পূর্বপুরুষেরা প্রচুর মদ-গাঁজা খেতেন, এই বাবদ সরকারের আবগারি বিভাগের প্রচুর আয় হতো এবং এই সব বিবেচনা করে এই ইলেকট্রিক পাখাটি সদাশয় সরকার বাহাদুর আমাদের পরিবারকে উপহার দিয়েছিলেন।

এসব কোনো কথাই সত্য নয়। আমার আগের চৌদ্দ পুরুষে কারো সরকারের সঙ্গে কোনো সম্বন্ধই ছিলো না। সরকারের ঘর থেকে পাখা চুরি করে আনা কিংবা সরকারের কাছ থেকে পাখা পুরস্কার পাওয়ার যোগ্যতা আমাদের বংশের ছিলো না।

রহস্যটা এই যে, সরকারি ডিসপোজাল থেকে আমার দাদাবাবু এই পাখাটি এগারো টাকা আট আনা দিয়ে নীলামে কিনেছিলেন, সেও অনন্ত-কাল আগে।

রঙটা কখনো রঙ করা হয়নি, বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিলো, কিন্তু সরকারী হরফগুলি পাঠ করা যেতো। এমনিতে কৌতূহলী লোকদের বোঝালে বুঝতো, কিন্তু মুশকিল ছিলো ঐ নাইনটি-এইট সংখ্যাটি নিয়ে।

পাখাটি কি আটানব্বুই সালের, তার মানে আঠারো শো আটানব্বুই। তার মাত্র কয়েক বছর আগে ইডেন গার্ডেনে কলকাতার প্রথম ইলেকট্রিক আলো এসেছে, কলকাতার লোকে দল বেঁধে সন্ধ্যাবেলা সেই আলো দেখতে যেতো। সেই অর্থে পাখাটি যথেষ্ট প্রাচীন। তা হতেও পারে। আবার এমনো হতে পারে যে পাখাটি এক্সাইজ ডিপার্টমেন্টের আটানব্বুই নম্বর পাখা ছিলো। সে আমলে আবগারি বিভাগ কত বড় ছিলো, তাদের এই আটানব্বুইটা কিংবা ততোধিক পাখা কিভাবে ব্যবহৃত হতো, তাদের শরীর বা মাথা এতো গরম হতো কেন, এসব প্রশ্নও সঙ্গে সঙ্গে এসে যায়।

এসব তাত্ত্বিক প্রশ্ন না তুলে পাখাটির আগাগোড়া, যতটুকু এখনো মনে আছে, বর্ণনা করছি।

আমাদের ঐ পাখাটির সবচেয়ে বিচিত্র অংশটি ছিলো এর রেগুলেটার এবং সেই জন্যেই বোধহয় আমার দাদা এসি পাখা ডিসি পাখার গানে

রেগুলেটার শব্দটি ঢুকিয়েছিলেন।

আটাত্তর আর. পি. এম-এর গ্রামোফোন রেকর্ডের বাক্সের মতো আকারের কালো চৌকো রেগুলেটার, তার উপরের দিকে একটি সিংহের ছবি আঁকা, যার থাবার নিচে একটি মরা মোষ কিংবা গরু পড়ে রয়েছে।

রেগুলেটারটির আটটি ঘর, কিন্তু এক থেকে আট সব ঘরেই সমান গতিতে চলতো এবং সে সাংঘাতিক গতি। ছু'মিনিট-আড়াই মিনিট পর পর রেগুলেটারটি একটু কেঁপে উঠতো, তখন পাখাটা একটু কমে যেতো।

আধঘণ্টা পাখা চললে রেগুলেটার গনগনে গরম হয়ে যেতো। এ সময় অনেক লোক না বুঝে হাত দিয়ে লাফিয়ে উঠেছে, রেগুলেটারের ছোঁয়ায় হাতে ফোস্কা পড়ে গেছে।

আমাদের কিন্তু খুবই সুবিধে হয়েছিলো। আমরা ঐ রেগুলেটারের গায়ে ধরে পাঁউরুটি টোস্ট করে নিতাম। রেগুলেটারের উপরের দিকে টিনের কৌটোয় বসিয়ে আমার দিদিমা তাঁর দোক্তার ধনে-মৌরি ভেজে নিতেন।

খুবই কাজের ছিলো ঐ রেগুলেটার কিন্তু শেষের দিকে পাখাটা বিরুদ্ধাচরণ শুরু করলো। পাখাটা খুললেই গোঁ-গোঁ করে বুনো ষাঁড়ের মতো করতে থাকতো। পুরো পাড়া থরথর করে কাঁপতে থাকতো। অনেক বাড়ির কম পাওয়ারের বাল্‌ব্‌ পুট করে ফেটে চৌচির হয়ে যেতো। অনেকের রেডিওতে এক সঙ্গে তিন-চারটে সেণ্টার চলে আসতো।

আমাদের কোনো অসুবিধা হতো না। অন্তিম পর্বে পাখাটা চালানোর একটু আগেই দেখে নিতাম আমাদের নিজেদের জিনিসপত্র, আলো-পাখা, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম সব বন্ধ আছে কি না। বন্ধ না থাকলে সব বন্ধ করে নিশ্চিন্ত হয়ে তারপর পাখাটা চালু করতাম।

সবচেয়ে সুবিধে ছিলো রাতের বেলায়। পাখাটা চালালে আর অন্ধকার ঘরে আলোর দরকার হতো না। পাখাটার ভিতর থেকে আলো ঠিকরে ঠিকরে বেরিয়ে আসতো, শুধু আমাদের ঘরে নয়, জানালা দরজা খোলা থাকলে আশপাশের ঘরবাড়ি আলোয় আলোময় হয়ে যেতো।

পাড়ার লোকেরা অনেক চেষ্টা করেছিলো, থানা-পুলিশ, আইন-আদালত। কিন্তু কেউ তাদের পাত্তা দেয়নি। এই বিচিত্র পাখার কথা কেউ বিশ্বাস করেনি। অবশ্য আমরা খুব নির্দয় ছিলাম না। একবার এক প্রতিবেশী নবদম্পতির অনুরোধে তাদের ফুলশয্যার সময় দুই সপ্তাহ আমরা পাখাটি বন্ধ রেখেছিলাম।

আরেকবার পাশের বাড়ির ছাদে পাড়ার ছেলেরা রবীন্দ্রজয়ন্তী করেছিলো, ছাদে ইলেকট্রিক ছিলো না, তাদের আলো পাওয়ার জন্য আমরা পাখাটি আমাদের বিনা প্রয়োজনেই চালিয়ে ছিলাম।

অবশেষে আমাদের প্রকৃত ক্ষতি হয় চীনযুদ্ধের সময় বাষট্টি সালে। ব্ল্যাকআউট আইন ভঙ্গ করার অপরাধে একদিন সরেজমিন তদন্ত করে সিভিল ডিফেন্স দফতর আমাদের পাখাটি বাজেয়াপ্ত করে।

তারপর আর পাখাটির কোনো খোঁজ পাইনি। আজ যখন চারদিকে অন্ধকার, অঘোষিত ব্ল্যাকআউট, সেই পাখাটির কথা কখনও কখনও মনে পড়ে।

বিদ্যুৎ বিভ্রাট

না। লোড শেডিং নিয়ে আমি কিছু লিখতে যাচ্ছি না। লেখার কোনো মানে হয় না।

বৈষ্ণব কবিতার প্রেমের মতো, রবীন্দ্রনাথের বর্ষার মতো একালের লেখকেরা ভালো-খারাপ সম্ভব-অসম্ভব পাতার পর পাতা লোড শেডিং-এর বিষয়ে লিখেছেন ; ইয়ার্কি, রাগ, দুঃখ সব ঢেলেছেন বিদ্যুৎশূন্যতার বিরহে।

আর এ বিষয়ে অধিক লেখা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। কারণ অন্য। মফস্বলে যে সব এলাকায় সাপ বেশি সেখানে সাপের নাম উচ্চারণ করে না, বলে লতা। কেউ যদি ভুল করে কখনো সাপ বলে ফেলেন সঙ্গে সঙ্গে শ্রোতারা জিব কেটে দুবার লতা-লতা বলেন।

লোড শেডিং-এর ব্যাপারটাও অনেকটা নাকি তাই। লোড শেডিং-এর
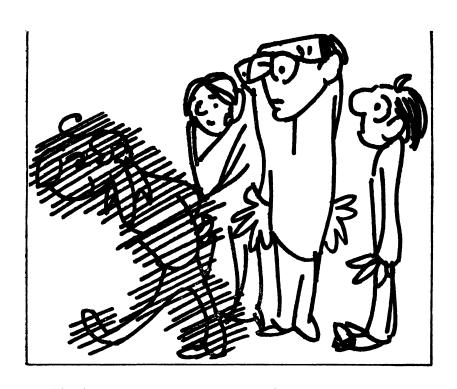
কথা উঠলেই বেশ আলো-পাখা চলছিলো, সেটা বন্ধ হয়ে গেলো। শুধু কথা উঠলে বা আলোচনা করলে নয়, মনে মনে ভাবলে, কাগজে-কলমে লিখলে পর্যন্ত লোড শেডিং ঘাড়ে এসে পড়ে। আমার এক মেসোমশায় মাঝে-মধ্যেই লোড শেডিং-এর স্বপ্ন দেখেন, এবং প্রত্যেকবারই ঘুম ভেঙে দেখেন আলো-পাখা নেই, গরমে দরদর করে ঘামছেন।

তাছাড়া সত্যি বলি, এতদিনে আমাদের লোড শেডিং-এর সঙ্গে একটা আত্মীয়তাও দাঁড়িয়ে গেছে। খারাপ হোক, যতই খারাপ, একেবারে বাড়ির লোক হয়ে গেছে সে। যেন বাড়ির ছোট ছেলেটি, হঠাৎ বাউণ্ডুলে হয়ে কবি হয়ে গেছে অথবা রাজনীতি করছে। কাঁধে ঝোলা ব্যাগ, উস্কো-খুস্কো চুল, ময়লা পাঞ্জাবি, পায়ে নিঃশব্দ রবারের চটি, আসা-যাওয়া কিছু ঠিক নেই। সারা রাত ছিলো না, সকালে আধ ঘণ্টা ছিলো, তারপর আবার চলে গেছে, দুপুরে খাওয়ার সময় হয়ে গেলো এখনো দেখা নেই। এখন

অভ্যেস হয়ে গেছে, সে এলে খুশি হই, কিন্তু তার জন্যে আর অপেক্ষা করা হয় না, তাকে বাদ দিয়েই বাড়ির স্নান-খাওয়া সারা হয়ে যায়। রাস্তাঘাটে দেখা হলে কেউ যদি তার কথা জিজ্ঞাসা করে, উত্তর দিই, 'না, সকাল থেকে নেই, বিকেলে থাকবে কি না বলতে পারছি না।'

পরম স্নেহের শ্রীমান লোড শেডিং-এর কথা আপাতত থাক। বরং লোড শেডিং নিবারক যন্ত্রাদি নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে।

টর্চ লাইট, সে তো বহুকাল ধরেই আছে কিন্তু বছর পনেরো-বিশ আগে প্রথম দেখি টর্চলাইট পাখা। ছোটো একটা টর্চের মাথায় যেখানে বাল্ব ও কাচ থাকে সেখানে একটা দুই ইঞ্চি ব্যাসের প্ল্যাস্টিকের পাখা লাগানো। লোড শেডিং-এর যুগ তখন বহু দূরে, এই জিনিসটি সেই সুদূর অতীতে যাঁর মাথা থেকে বেরিয়েছিলো তাঁর দূরদৃষ্টির প্রশংসা করতেই হয়।

সেই সময় কেনা হয় নি, নিতান্তই কৌতূহল বশে একদিন ফুটপাথে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হকারের কাছে সেটা ভালো করে দেখেছিলাম ; তবে দাম বড়ো বেশি মনে হয়েছিলো। সত্তরের দশকের মাঝামাঝি যখন পাকাভাবে লোড শেডিং-এর অনুপ্রবেশ ঘটলো কলকাতায় তখন ঐ টর্চপাখা একটা কিনে ফেলি।

কি চমৎকার দেখতে, লাল প্ল্যাস্টিকের খোলের মধ্যে ব্যাটারি, মাথায় কালো রঙের ছোটো ছোটো তিনটে ব্লেড, একেবারে দাড়ি কামানোর ব্লেডেরই সাইজ, পাখার এই বাঁটগুলোকে কেন ব্লেড বলে এতদিনে বোধগম্য হলো। সে যা হোক, কি বিদ্যুৎ-গতি এই বিদ্যুৎহীন পাখার। টেবিলের উপর চালিয়ে দেখছিলাম, আমাদের পোষা কুকুরটি, যার অনুসন্ধিৎসা প্রচণ্ড প্রবল এবং যার যে কোনো রকম অনুসন্ধিৎসা নিবারণ করার একমাত্র উপায় শুঁকে দেখা, যতটা নিকট থেকে সম্ভব শুঁকে দেখা, সেই সরল নিরীহ কুকুরটি টর্চপাখাটার রহস্য বুঝতে গিয়ে নাকে-ঠোঁটে রক্তারক্তি করে ফেললো। তার চেয়েও মারাত্মক সে দু' পায়ে দাঁড়িয়ে টেবিলের উপরে পাখাটাকে দেখতে গিয়েছিলো, পাখার আঘাতে তার চৈতন্য লুপ্ত হলো, নাক দিয়ে রক্ত পড়ছে, চোখের মণি স্থির, টেবিল থেকে দু'হাত দূরে

ছিটকিয়ে দু' পায়ে নিশ্চল হয়ে কুকুরটি তিন মিনিট স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। ঘটনার আকস্মিকতায় আমরাও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গিয়েছিলাম, অবশেষে ছুটে গিয়ে জল নিয়ে এসে তার মুখে চোখে ঝাপটা দিই, আবার সে চার পায়ে দাঁড়ায়।

এই টর্চপাখার গতি যত তীব্র, হাওয়া তত ব্যাপক নয়। কথাটা একটু মিথ্যে হয়ে গেলো, আসলে এর হাওয়ার বিস্তৃতি অতি কম। একজন মানুষের যদি কোনো কারণে কান গরম হয়ে যায় তাহলে তার দু' কানে দুটো পাখায় বেশ কাজ হবে। সমস্ত মুখে হাওয়া খেতে গেলে আট-দশটা এরকম পাখা চাই, দু' গালের জন্য দুটো, কপালের জন্য দুটো, নাকের জন্যে একটা, মুখের জন্যে একটা, চিবুকটা একটু ঠাণ্ডা রাখতে গেলে তার জন্যে আলাদা একটা, তা ছাড়া দুটো কান তো আছেই। নাক আর মুখের জন্যে দুটো পাখা থাকলে ঠোঁটের জন্যে আর আলাদা করে দরকার পড়বে বলে মনে হয় না।

এক জোড়া বড় ব্যাটারিতে টর্চপাখাটি চলে। জোড়া ব্যাটারির পরমায়ু আধঘণ্টা, মিনিট কুড়ি-পঁচিশ পরেই নিস্তেজ হয়ে পড়ে, তিরিশ মিনিট পরে আর ঘোরেই না। সুতরাং খরচের কথা ভেবে টর্চপাখা আর ব্যবহার করা হলো না, কিছুদিন পরে এক নিরপরাধ শিশুর অন্নপ্রাশনে সেটা ভালো করে মুছে-টুছে উপহার দিয়ে দিলাম; তারপর থেকে মনটা একটু খচ্‌খচ্‌ করছে।

টর্চপাখার পরে দেখি প্রায় ঐ একই রকম জিনিস, তবে তাতে আলো আর পাখা এক সঙ্গে। আর তার ব্যাটারিটা অন্যরকম। জিনিসটি আমার মতো আয়ের লোকের পক্ষে বেশ দুর্মূল্য তবে আমার এক বন্ধুর অফিসে আমি খুব ভালো করে এই ব্যাপারটা দেখেছি। লোড শেডিং হয়ে যাওয়ার পর বেশ কিছুক্ষণ অন্ধকারে, তারপর অন্ধকারের মধ্যে বারান্দা দিয়ে খড়ম পায়ে হেঁটে যাওয়ার খট খট শব্দ আসতে লাগলো, তারপর অল্প চুপচাপ, ঠিক চুপচাপ নয়, অনেকটা দেশলাই কাঠি জ্বালানোর শব্দের মতো, একটু-আধটু আলোর ঝিলিকও কদাচিৎ দেখা যাচ্ছে, যেন কেউ দেশলাই

জ্বালানোর ব্যর্থ চেষ্টা করছে ; সব মিলে একটা ভৌতিক পরিবেশ। আমার বন্ধুর অফিসটি ছিলো এক দমবন্ধ বাড়ির দোতলার সিঁড়ির পিছনের জানলা-বিহীন সিঁড়িকোঠায়, প্রখর মধ্যাহ্নে সে ঘরে অমাবস্যার অন্ধকার, তার মধ্যে ঐ অপ্রাকৃত অবস্থা, যার সব শেষে ছিলো এক অদৃশ্য বৃদ্ধের গলার কাশি ও সঙ্গে সঙ্গে ক্ষীণ আর্তনাদ। বলাবাহুল্য, এই সব শব্দই বেরোত ঐ আলো-পাখার যন্ত্রটি থেকে এবং ঐ অন্তিম আর্তনাদটির পরেই এক ফুট একটি ফ্লুরোসেণ্ট টিউব কিঞ্চিৎ জ্বলে উঠতো, একটি টিনের পাখাও ঘোরার চেষ্টা করতো প্রাণপণ।

আমার বন্ধুটি আজ কিছুদিন হলো অফিসটি উঠিয়ে দিয়েছে। সে ঐ আলোর টিউবটি আলকাতরা দিয়ে আধাআধি অন্ধকার করে দিয়েছে আর পাখাটি একটি ভূতের মুখোশ দিয়ে ঢেকে দিয়েছে, পাখাটি ঘুরলেই মুখোশটি ঘোরে। সে এখন 'ভূতের বাসা' বলে একটি কোম্পানি করেছে, মেলায় মেলায় ঘুরে বেড়ায়। মাত্র উনিশ পয়সা টিকিট, ভালোই চলছে তার ব্যবসা।

তার ব্যবসা ভালো চলুক কিন্তু ইতিমধ্যে লোড শেডিং নিবারক আরো বহু যন্ত্র আমার দৃষ্টিগোচর হয়েছে। কোনোটা ব্যাটারিতে চলে, সেই ব্যাটারিকে আবার নিয়মিত জল খাওয়াতে হয়। আবার কোনোটা তেলে বা ডিজেলে। এই রকম একটা দেখেছি এক শাড়ির দোকানে, চারটি টিউব ক্ষীণ জ্বলে উঠেছে কিন্তু তেলের ধোঁয়ায় ধোঁয়াকার, প্রায় কিছুই দেখা যাচ্ছে না; সেই আলো-আঁধারি কুয়াশার মধ্যে বিক্রেতা ও গ্রাহিকার লেন-দেন হচ্ছে। কিছুই স্পষ্ট নয়, যেন কোনো বিমূর্ত ছবি, যেন নবীন কবির প্রথম প্রেমের কবিতা, যেন প্রিয় ছায়াচিত্রের শেষ দৃশ্যে পাতাঝরা অপরাহ্নে নায়ক-নায়িকার আবার দেখা হয়েছে।

রসিকতা করে লাভ নেই। আদত কথাটা এবার বলি। কয়েকদিন হলো একটা জেনারেটর কিনেছি। ভালোই চলছিলো। একটু শব্দ হতো, তা হোক, দিনের বেলায় চললে চড়ুইগুলো ঘরে ঢুকতে সাহস পেতো না, সন্ধ্যার পরে বন্ধু-বান্ধব আসতো না। আগে মোমবাতি জ্বালাতাম,

দু-একজন আসতো ; এখন একদম ফাঁকা, ফটফট শব্দে তাদের নাকি অসুবিধা হয়। তা হোক, আমার তাতে কি আসে যায়, কিন্তু গতকাল থেকে মাথার উপরে পাখাটা উল্টোদিকে ঘুরছে আর তার পাশে একশো পাওয়ারের ইলেকটিক বাল্‌ব্‌টা নীলরঙের বেড ল্যাম্প হয়ে গেছে। জেনারেটরটা একটু পরীক্ষা করতে গেলাম, অনেকদিন আগে আমার কুকুর দু' পায়ে তিন মিনিট দাঁড়িয়েছিলো, এবার ঝাঁকি খেয়ে আমি চার পায়ে তিন মিনিট দাঁড়িয়ে রইলাম।

ডাকাতের হাতে

এতক্ষণ ভদ্রলোককে কেউই লক্ষ করেনি। ভদ্রলোক মেজের এক প্রান্তে দেয়াল ঘেঁষে গালে হাত দিয়ে বসেছিলেন।

ঘরময় দুরন্ত উত্তেজনা ও বিশৃঙ্খলা। পুলিসের লোক, খবরের কাগজের লোক—কে কাকে লক্ষ করে! একটু আগে বাজারের পিছনে ব্যাঙ্কের এই একতলার ঘরে ডাকাতি হয়ে গেছে।

পুলিসের কর্তারা ব্যাঙ্কের এজেন্ট ও ক্যাশিয়ারের কাছ থেকে ডাকাতির বিবরণ ও অপহৃত অর্থের পরিমাণ জেনে নিচ্ছিলেন। স্থানীয় থানার ছোট দারোগাবাবু তাঁর কালো নোটবুকে টুকে নিচ্ছিলেন, তা হলে একশো টাকার নোটের বাণ্ডিল সাতাশটা, পঞ্চাশ টাকার নোটের বাণ্ডিল সতেরোটা, কুড়ি টাকার নোটের···' এমন সময়ে ভদ্রলোক হঠাৎ ঘরের অন্যপ্রান্ত থেকে উঠে এসে দারোগাবাবুর সামনে কিরকম যেন হাঁটু মুড়ে আধা ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিতে দাঁড়ালেন।

ভদ্রলোকের উর্ধ্বাঙ্গে একটি হ্যাণ্ডলুমের ঘন গেরুয়া রঙের পাঞ্জাবি, পাঞ্জাবিটির ঝুল বেশ লম্বা এবং তাই রক্ষা, কারণ তাঁর নিম্নাঙ্গ সম্পূর্ণ শূন্য, কোনো কাপড়-চোপড় নেই। পাঞ্জাবির কাপড় বেশ মোটা বলে পাঞ্জাবির তলায় কোমরের নিচে কিছু আছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না।

ভদ্রলোককে লক্ষ করা মাত্র তাড়াতাড়ি পুলিসকে দেখিয়ে ব্যাঙ্কের

এজেন্ট সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'এই তো যার কথা বলছিলাম, এই যে···।' ভদ্রলোকের আশ্চর্য পোশাক এবং বিহ্বল চেহারা আর তার সঙ্গে এজেন্ট সাহেবের উত্তেজনা দেখে, পুলিসের এক কর্তা যিনি কাউন্টারে হেলান দিয়ে এতক্ষণ কাউন্টার টিপে টিপে কতটা শক্ত পরীক্ষা করে দেখছিলেন, তিনি মুহূর্তে বুঝে ফেললেন; এই ব্যক্তি অবশ্যই ডাকাতদের একজন। তিনি চাপা গলায় নির্দেশ দিলেন, 'অ্যারেস্ট হিম'। সঙ্গে সঙ্গে দুজন সেপাই দুদিক থেকে ছুটে গেলো।

কিন্তু এরই মধ্যে এজেন্ট, ক্যাশিয়ার সবাই হা-হা করে উঠলেন, 'আরে করেন কি? করেন কি? উনি ডাকাত নন।'

'উনি ডাকাত নন, তাহলে উনি কি?' পুলিসের ছোট সাহেব গর্জে উঠলেন।

'উনি মিস্টার ছকু চৌধুরী। বাঁশের ব্যবসায়ী। আমাদের ক্লায়েন্ট'।

ব্যাঙ্কের তরফে এই উত্তরে চমকিত হয়ে পুলিসেরা একটু নিরস্ত হলেন, শুধু ছোট সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনাদের ব্যাঙ্কের ক্লায়েণ্টরা আজকাল এই রকম পোশাক পরে আসেন নাকি?'

ছকু চৌধুরী এতক্ষণে হাত জোড় করে পুলিস সাহেবের সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। ঠিক দাঁড়িয়েছেন বলা যায় না, পা দুটো হাঁটুর কাছে ত্রিভুজের মতো ভাঁজ করে পাঞ্জাবির ঝুল দ্বারা যতটা লজ্জা নিবারণ করা সম্ভব তার চেষ্টা করে যাচ্ছেন।

পিছনে থানার জমাদারসাহেব রুল হাতে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তাঁর উপরওলাদের সম্মুখে এই অর্ধোলঙ্গ ব্যক্তিটির দাঁড়ানোর ভঙ্গির এই বেয়াদবি তার পক্ষে সহ্য করা অসম্ভব। জমাদার রুল উঁচিয়ে বললেন, 'এই, সিধা হো যাও, সোজা দাঁড়াও।'

জমাদারের আদেশ পেয়ে ছকু চৌধুরী কাকুতি-মিনতি করতে লাগলেন, 'না স্যার, আমাকে সোজা হয়ে দাঁড়াতে বলবেন না। সে আমি পারব না।'

অবশ্য এত কাকুতি-মিনতি করার প্রয়োজন ছিলো না। প্রায় সবাই ইতিমধ্যে বুঝতে পেরেছিলেন ছকু চৌধুরী এতক্ষণ যে কারণে মেজেতে বসে ছিলেন এখন সেই কারণেই বাঁকা হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। লজ্জা নিবারণ ছাড়া তাঁর আর কোনো উদ্দেশ্য নেই।

সদ্য ডাকাতি হওয়া ঘরের আবহাওয়া আগেই থমথমে ছিলো, এর পরে আরো থমথমে হয়ে উঠলো। সবাই চুপচাপ। অবশেষে পুলিসের ছোট-সাহেব নীরবতা ভাঙলেন, 'আপনি ডাকাত নন, ঠিক আছে। কিন্তু আপনি শুধু পাঞ্জাবি পরে ব্যাঙ্কে এসেছেন কেন? ভদ্রসমাজে যাতায়াত নেই আপনার?'

ছকু চৌধুরী থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে বললেন, 'না স্যার, আমার লুঙ্গি…'; সঙ্গে সঙ্গে ছকুবাবুর অর্ধসমাপ্ত বাক্যটি ব্যাঙ্কের এজেন্টসাহেব অনুমোদন করলেন, 'হ্যাঁ, ছকুবাবুর লুঙ্গি…।'

ডাকাতির তদন্তের মধ্যে এইরকম একটি সামান্য লুঙ্গির প্রসঙ্গ আসায় পুলিসের লোকেরা খুব চটে উঠলেন, ছোটসাহেব আবার ধমকে উঠলেন,

'কিসের লুঙ্গি ? এসব কি ইয়ার্কি হচ্ছে ?'

এবার ছকুবাবু একেবারে মুষড়িয়ে পড়লেন, 'স্যার, আমার লুঙ্গিটা ডাকাতেরা কেড়ে নিয়ে গেছে।' পুলিস সাহেবদের অবাক হবার পালা, 'লুঙ্গি ডাকাতেরা কেড়ে নিয়ে গেলো ? সোনার সুতো দিয়ে বোনা, নাকি বেনারসি লুঙ্গি ? ডাকাতদেরও কি আজকাল কাণ্ডজ্ঞান লোপ পেয়েছে ?'

ব্যাঙ্কের ক্যাশিয়ারবাবু ব্যাখ্যা করে বললেন, 'না ঠিক তা নয় ; ডাকাতদের টাকা বেশি হয়ে গিয়েছিলো। তারা বোধহয় আশা করেনি যে এত টাকা পাবে। দুটো মাত্র বড় বড় বাজারের থলে এনেছিলো, সে দুটো পুরোপুরি ভরে গেলে তখন কি আর করবে, সামনের কাউন্টারে ছকুবাবু টাকা জমা দিতে এসেছিলেন, ওঁকে দুজনে মিলে জাপটিয়ে ধরে ওঁর লুঙ্গিটা খুলে নিয়ে বাকি টাকা বস্তার মতো করে বেঁধে ফেললো।'

পুলিস সাহেব হতবাক্, 'বলেন কি মশায় ? লুঙ্গিটা খুলে নিয়ে নিলো ?'

ছকুবাবুর পক্ষ সমর্থন করে ক্যাশিয়ারবাবু বললেন, 'ছকুবাবু খুব ভালো লোক, স্যার। আমাদের পুরনো কাস্টমার। প্রথমে উনি কেন, আমরা কেউই ধরতে পারি নি, ডাকাতেরা কেন ওঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। আমরা ভাবলাম ডাকাতেরা ভেবেছে ওঁর কাছে অনেক টাকা আছে, কিন্তু ওঁর ওই সামান্য দু' হাজার আড়াই হাজার টাকা ডাকাতেরা ছুঁলো না। শুধু ওঁকে ধরে ওঁর লুঙ্গিটা খুলে নিলো। ছকুবাবু যখন বুঝতে পারলেন যে লুঙ্গিটা খুলে নিচ্ছে, তিনি যথেষ্ট বাধা দিয়েছিলেন স্যার, কেন দেবেন না, বলুন। আমরাও হকচকিয়ে গিয়েছিলাম, না হলে স্যার, ব্যাঙ্ক ডাকাতি তো সব জায়গাতেই হচ্ছে, আমাদের সব টাকাই তো ইন্সিওর করা, আমাদের তাতে কিছু এসে যায় না, কিন্তু ব্যাঙ্কের ভিতর থেকে পুরনো খদ্দেরের লুঙ্গি নেবে, এ কি রকম অত্যাচার!'

ক্যাশিয়ারবাবুর ভরসা পেয়ে পুলিসদের হতবাক্ অবস্থা দেখে ছকুবাবু এতক্ষণে একটু সাহস অর্জন করেছেন, পুলিস সাহেবের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তিনি বললেন, 'স্যার, আমার কি হবে ?' পুলিসসাহেব এবার একটু ঠাণ্ডা ভাবেই বললেন, 'কি হবে আপনার, যা শুনলাম, আপনার টাকা-পয়সা

তো কিছু যায় নি। এখন কিছুক্ষণ ওই সিঁড়ির নিচে চুপচাপ বসে থাকুন। তারপর সন্ধ্যার সময় যেই লোড শেডিং হবে, অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে বাড়ি ফিরে যাবেন।'

'কিন্তু আমি স্যার, আর বাড়ি ফিরতে পারবো না স্যার। লুঙ্গিটা আমার নয় স্যার।' ছকু চৌধুরীর এই কথা শুনে পুলিস সাহেব আরো বিচলিত হলেন, 'লুঙ্গিটা আপনার নয় ?'

ছকু চৌধুরী আবার হাতজোড় করলেন, 'স্যার, সত্যি বলছি স্যার, লুঙ্গিটা আমার শালার। দুদিনের জন্যে কলকাতায় বেড়াতে এসেছে, দুপুরে চৌরঙ্গীতে পাতাল রেলের গর্ত দেখতে বেরিয়েছে। ভাবলাম পাঁচ মিনিটের জন্যে যাই ব্যাঙ্কে টাকাটা জমা দিয়ে আসি। টাকা-পয়সা সব ঠিক রইলো, শুধু গেলো আমার শালার লুঙ্গিটা!' ছকু চৌধুরী হাউহাউ করে কেঁদে উঠলেন, 'আমার শালা যখন জানতে পারবে আমি তার লুঙ্গি পরে বেরিয়ে ছিলাম, আমি কি করে তাকে মুখ দেখাবো, আমার শ্বশুরবাড়ির লোকদের কাছে আমি কি করে মুখ দেখাবো ? ডাকাতেরা আমার এ কি সর্বনাশ করে গেলো, স্যার!'

ব্যাঙ্ক আর পুলিসের লোকেরা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে ছকু চৌধুরীর কান্না দেখতে লাগলেন। খবরের কাগজের লোকেরা ঝপাঝপ ছবি তুলতে লাগলেন।

পুনশ্চ: কোনো পাঠক বা পাঠিকার যদি এরকম সন্দেহ হয় যে এই কাহিনীর সঙ্গে সম্প্রতি সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনো ডাকাতির খবরের কোনো সম্পর্ক আছে, তাঁর ভুল নিরসন করার জন্যে জানাই, এই কাহিনীর সঙ্গে কোনো বাস্তব ঘটনা বা চরিত্রের কোনো যোগাযোগ নেই।

ভয়ঙ্কর

আমার বান্ধবীরা এবং বন্ধুপত্নীরা যখন নবীনা জননী ছিলেন, তখন তাঁদের কেউ কেউ অথবা অনেকেই, শিশু সন্তানদের আমার নাম করে ভয়
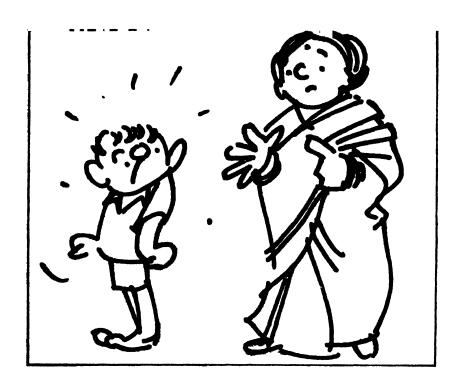
দেখাতেন। এক বছরের ছেলেটি ঘুমোতে চাইছে না, কিংবা দুই বছরের কন্যাটি 'ব্যা ব্যা ব্ল্যাক শিপ' ছড়াটি মুখস্থ করতে চাইছে না, এর খুবই সহজ প্রতিষেধক মায়েদের কাছে ছিলো, 'দাঁড়াও, দেখাচ্ছি তোমাকে, এখনই তারাপদকে ডেকে আনছি।' সবচেয়ে দুর্দান্ত শিশুটি, যে রাত বারোটার সময় বাজারে যাবে বলে নাকি সুরে কান্না ধরেছে, সে'ও এর পরে মুহূর্তের মধ্যে স্তব্ধ হয়ে যেতো, চোখ বুজে মড়ার মতো পড়ে থাকতো।

সেদিনের সেই নবীনা জননীরা, তাঁদের কেউ কেউ এখন দিদিমা হয়েছেন, আজকাল কদাচিৎ দেখা হয় তাঁদের সঙ্গে। দেখা হলে একটাই জিজ্ঞাসা আছে আমার, তাঁরা তাঁদের তৃতীয় প্রজন্মকে, নাতি-নাতনীদের একই ভাবে এখনো ভয় দেখান কি না?

বলা বাহুল্য, আমার অস্বাভাবিক কণ্ঠস্বরই আমার এই ভয়ঙ্করত্বের একমাত্র কারণ। প্রথম যৌবনে যখন আমার গলার স্বর সদ্য বদলাতে

শুরু করেছে তখনই আমি বহুলোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম। কলেজে পড়ার সময় গরমের ছুটিতে দেশের বাড়িতে যাচ্ছিলাম কলকাতা থেকে, তখন জমজমাট পাকিস্তানী আমল, সিরাজগঞ্জ ঘাট স্টেশনে কুলিকে চেঁচিয়ে ডাকছি, এক দেড়েল দারোগা আমাকে ধরে ফেললেন, আমাকে ধমকাতে লাগলেন আসল গলায় কথা বলার জন্যে। তিনি স্পষ্টই আমাকে বললেন যে তাঁর নাম হাবিব দারোগা, আমার মতো বহু উঠতি বদমাস তিনি দেখেছেন এবং শায়েস্তা করেছেন, আমি কেন গলা চুরি করেছি এবং নকল গলায় কথা বলছি তা তিনি ভালই জানেন এবং যদি আসল গলায় কথা না বলি তা হলে আমার উপযুক্ত শিক্ষার বন্দোবস্ত করা হবে।

বেকায়দায় পড়ে আমি বহু চেষ্টা করতে লাগলাম আমার কর্কশ কণ্ঠস্বর মোলায়েম করতে, কঠোর পরিশ্রমে আমার মাথার ঘাম পায়ে ঝরতে লাগলো কিন্তু একেই বোধহয় কাকস্য পরিবেদনা বলে—গলার ভেতর থেকে একইভাবে কাকের কণ্ঠের আওয়াজ বেরোতে লাগলো। কণ্ঠনালী যথাসম্ভব সূক্ষ্ম করে চেষ্টা করলাম হঠাৎ চিলের ডাকের মতো একটা তীক্ষ্ণ চিঁচিঁ শব্দ বেরিয়ে এলো, যত দারোগাসাহেব ধমকান, 'থামো, চুপ করো, ইয়ার্কি মৎ করো', আমি ঠকঠক করে কাঁপতে থাকি, গলা থেকে তীক্ষ্ণ, তীক্ষ্ণতর চিঁচিঁ শব্দ বেরিয়ে আসতে থাকে—আমি সহস্র প্রয়াসেও সেই শব্দস্রোত সংবরণ করতে পারি না।

সেই অবিরাম চিঁচিঁ ধ্বনি শুনে সিরাজগঞ্জ ঘাট রেলস্টেশনের জি. আর. পি'র ঘরের সামনে রীতিমতো ভিড় জমে গেলো, সেই উৎকণ্ঠাময় মুহূর্তেও শুনতে পেলাম অনেকে বলাবলি করছে, 'চোরাই সোনা গিলে ফেলেছে, দারোগা সাহেব পেট টিপে বার করছেন,' অনেকেই দারোগা সাহেবকে 'সাবাস, সাবাস' করতে লাগলো।

রক্ষার কথা, কৌতূহলী জনতার মধ্যে একজন প্রভাবশালী স্থানীয় মুসলমান ব্যক্তি ছিলেন, যিনি আমাকে চিনতেন, তারই দয়ায় সেদিন উদ্ধার পাই এবং তারপর থেকে আজ পর্যন্ত পুলিসের সামনে পারতপক্ষে মুখ খুলি নি।

আমার এই সাংঘাতিক কণ্ঠস্বরের অভিজ্ঞতা সবসময়েই খুব অপ্রীতিকর হয়েছে তা নয়। কাণ্ডজ্ঞানহীন অনেক লোক আমার গলার আওয়াজ শুনে কখনো কখনো ধরে নিয়েছে আমি ধ্রুপদী সঙ্গীতের কোনো ওস্তাদ গাইয়ে। অচেনা লোকদের মধ্যে এতে বেশ সম্মান পাওয়া যায়, হয়তো বা কিছু অতিরিক্ত খাতির-যত্নও পাওয়া যায়। কিন্তু সত্যিকারের অসুবিধা হয় শেষের দিকে যখন কোনো বিয়ের আসরে বা সভামঞ্চে হারমোনিয়ামটি এগিয়ে দিয়ে সবাই অনুরোধ করতে থাকে, 'দাদা, এইবার ধরুন।' আমি অবশ্য বুদ্ধি করে কখনো ধরিনি, কারণ ধরলে কি হবে তা আমি জানি।

জানি, মানে ঠিক কখনো গান গাইনি, তবে সভায় দাঁড়িয়ে মাঝে-মধ্যে কবিতা পড়েছি। এদিকে এই রকম কণ্ঠস্বর আর তাছাড়া সভায় দাঁড়ালেই আমার পা সুদ্ধ সমস্ত শরীর থরথর করে কাঁপতে থাকে। বহুবার এমন হয়েছে, কবিতা পড়ার শুরুতেই গলার গমকে মাইক সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ হয়ে গেছে, অথচ মাইকের দোকানের মিস্তিরি ছাড়া কেউ টেরই পায়নি যে যন্ত্রটি বিকল হয়েছে; আমার ভয়ঙ্কর কণ্ঠস্বরে সভাকক্ষ থমথম করছে, বারান্দায় যারা জটলা করছিলো তারা একি হলো ভেবে দৌড়ে হলের মধ্যে ঢুকে পড়েছে; এদিকে আমার আপাদমস্তক এণ্টেনা খোলা টি ভি'র প্রতিচ্ছবির মতো প্রচণ্ড দুলছে। একবার এইরকম একটা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে বেরিয়ে আসার সময় শুনলাম, একদল মহিলা আমার দিকে তাকিয়ে আলোচনা করছেন। মৃগী রোগীদের স্টেজে উঠতে দেওয়া উচিত কি না, এই নিয়ে রীতিমতো তর্ক চলছে তাঁদের মধ্যে।

এর থেকেও অধিক বিপদে পড়েছিলাম প্রথম চাকরিতে ঢোকার পর। কি একটা কাজে ভুল করেছিলাম, না উল্টোপাল্টা করে ফেলেছিলাম, সহকর্মীরা পরামর্শ দিলেন উপরওলার কাছে গিয়ে দুঃখ প্রকাশ করতে। উপরওলার সঙ্গে তখন আমার সাক্ষাৎ-পরিচয় নেই, আমি তাঁর সই চিনি, তিনি হয়তো আমার হাতের লেখা চেনেন। আমি যখন হাফডোর খুলে তাঁর ঘরে ঢুকেছি, তিনি মাথা নিচু করে ফাইলে কি যেন খুঁটিয়ে দেখছিলেন। যথাসাধ্য মসৃণ গলা করে যেই বলেছি, 'স্যার…', তিনি হঠাৎ আমার কণ্ঠ-

স্বর শুনে চেয়ার ছেড়ে অন্যমনস্কভাবে লাফিয়ে উঠেছেন, সামনেই আমাকে দেখে কোনো রকমে ধাতস্থ হয়ে বললেন, 'কি চাই?' আমি কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ ভাবে আমার সামান্য পরিচয় দিয়ে দুঃখ প্রকাশ করার চেষ্টা করতে লাগলাম। কিন্তু উপরওলা সাহেব যতই আমার গলা শোনেন, ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতে থাকেন, 'দেখুন আমাকে ভয় দেখানোর চেষ্টা করবেন না, ও সব গলাবাজি আমি ভয় পাই না।' আমি যত বলি 'না স্যার, গলাবাজি নয়, আমার গলাই এই রকম', তিনি লাফাতে থাকেন, 'আমাকে শাসাবেন না। নতুন এসেছেন, আমাকে চেনেন না, শাসানিতে ভয় পাওয়ার মতো অফিসার আমি নই।'

বেশ কিছুদিন পরে এই ভদ্রলোকের আমার সম্পর্কে ভুল ভাঙে। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন আমার কণ্ঠস্বর সত্যিই অকৃত্রিম এবং শেষাশেষি তাঁর সঙ্গে প্রভু-ভৃত্য সম্পর্কিত এক ধরনের বন্ধুত্বও আমার হয়েছিলো। কিন্তু তখনো হঠাৎ পেছন থেকে আমি যদি তাঁকে ডাকতাম বা কিছু বলতাম তিনি সেই প্রথম দিনের মতোই চমকে লাফিয়ে উঠতেন।

বহুকাল আমার সেই প্রাক্তন উপরওলার সঙ্গে দেখা হয়নি। গত সপ্তাহে শুনলাম তিনি খুব অসুস্থ, শয্যাশায়ী; জীবনের আশা প্রায় নেই বললেই চলে, রবিবার সকালে তাঁকে দেখতে গেলাম। শীর্ণ শরীর, বিছানার সঙ্গে লেগে রয়েছে, হাঁটাচলা সব বন্ধ। চোখ বুজে শুয়ে রয়েছেন, আমি সামনে গিয়ে দাঁড়াতে, একটু পরে নড়েচড়ে অল্প চোখ খুলে ক্ষীণ-কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কে?' শুনতে পাবেন না ভেবে আমি কানের কাছে মুখ নামিয়ে বললাম, 'আজ্ঞে, আমি তারাপদ।' সঙ্গে সঙ্গে সেই প্রথম দিনের প্রতিক্রিয়া, ভদ্রলোক চমকে বিছানার উপর লাফিয়ে উঠলেন। আমি ভয় পেলাম, উত্তেজনায় মারা না পড়েন।

কিন্তু না, তিনি মারা যান নি। আমার ঐ শব্দযোগের পর তিনি সম্পূর্ণ সচল হয়ে গেছেন, হাঁটাচলা করছেন, খবর পেলাম, বাজারে পর্যন্ত যাচ্ছেন। তাঁর চিকিৎসকেরা স্তম্ভিত হয়ে গেছেন।

পদ্মাসন

সকালবেলা বাজার করতে দেরি হয়ে গিয়েছিলো, তাড়াতাড়ি দাড়ি কামিয়ে অফিস যাওয়ার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিলাম। এমন সময় জরুরী খবর এলো আমার এক মামাশ্বশুর সকালবেলা পদ্মাসন করতে গিয়ে আটকিয়ে গিয়েছেন।

ভদ্রলোক কাছেই থাকেন, সুতরাং এই বিপদে সর্বপ্রথমে আমাকেই খবর দিয়েছেন। বিপদটা সত্যি যে কি, তা আমি প্রথমে বুঝে উঠতে পারিনি। যদি পদ্মাসন করতে না পারেন, আটকিয়ে যান, করবেন না; আর তা ছাড়া আমি তো আর যোগব্যায়ামের শিক্ষক নই, সত্যি কথা বলতে গেলে যোগব্যায়ামের য-ও আমি জানি না, এ ব্যাপারে আমার কি করার আছে ?

আমার এই মামাশ্বশুর, গজেনবাবু, আজ কিছুদিন হলো যোগব্যায়ামে খুবই উৎসাহিত হয়ে পড়েছেন। নানা জনের কাছে এ সম্পর্কে নানা কথা শুনে তিনি যোগব্যায়ামের চার্ট কিনে নিজেই ছবি দেখে দেখে আসন শুরু করেন।

যোগব্যায়ামের বহুল প্রচলিত আসনগুলির মধ্যে একটি হলো ঐ পদ্মাসন। আপাতভাবে ছবি দেখে আসনটি যত সহজ মনে হয় তা নয়, আবার খুব জটিল তা'ও নয়। আসলে একেক রকম আসন একেক জনকে পুষিয়ে যায়। যে পারে সে সহজেই পারে, যে পারে না সে হাজার চেষ্টা করেও পারে না, অনেকটা কবিতা লেখা বা গান গাওয়ার মতোই।

আগে আমরা কাঠের পিঁড়িতে জোড়াসন হয়ে বসে ভাত খেতুম। পদ্মাসন এই জোড়াসনেরই ঠিক পরের ধাপ। জোড়াসনে পায়ের পাতা দুটো উরুর নিচে থাকে, আর পদ্মাসনে সেটা উরুর উপরে চেপে বসিয়ে দিতে হয়; হাঁটু, পায়ের গোড়ালি এবং উরু কাপে কাপে আটকিয়ে যায়; এই আসনের সঙ্গে ঠিক মতো নিঃশ্বাসের ব্যায়াম করলে নাকি শূন্যে ভাসমান অবস্থায় থাকা যায়, সাধু-সন্ন্যাসীরা তাই করে বাতাসে ওড়েন।

এত কথা আমার জানা ছিলো না। মাত্র তিনদিন আগে, গত শনিবার সন্ধ্যাবেলা আমার মামাশ্বশুর মশায় একঘণ্টা ধরে সমস্ত আমাকে বিশ্লেষণ করে বুঝিয়েছেন। তারপর আজকেই এই অবস্থা।

মামাশ্বশুর মশায়ের গৃহভৃত্য আমাকে ডাকতে এসেছিলো। এই লোকটির কোনো নাম নেই, আসলে ওর নাম ছিলো বোধহয় নিখিল, মামাশ্বশুর মশায়ের বাবার নামও তাই। তখন তিনি ওর নতুন নামকরণ করেন মংলু। কিন্তু সে এই নাম গ্রহণ করতে রাজী হয় নি, এই নামে ডাকলে সাড়া দেয় না। আমি মামাশ্বশুর মশায়কে বলেছিলাম সাহেবদের কায়দায় ওকে 'বয়' অথবা 'বেয়ারা' বলে ডাকতে, কিন্তু তিনি সাত্ত্বিক মানুষ, এই বিজাতীয় পরামর্শে তিনি মোটেই রাজী হন নি। ফল, লোকটিকে এই, ওই, হ্যাঁরে, ওরে সম্বোধন করেই চালাতে হচ্ছে।

আমি লোকটাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'হ্যাঁরে কি হয়েছে ঠিক করে বল

তো ?' সে ভালো করে গুছিয়ে বলতে পারলো না, কিন্তু তার উত্তেজনা এবং ভাবভঙ্গি দেখে মনে হলো ঘটনাটা সত্যিই গুরুতর।

মামাশ্বশুর মশায়ের বাড়ি গিয়ে দেখলাম রীতিমতো জটিল অবস্থা। বাইরের ঘরে ভিড়, ভিতরে শোবার ঘরের মেঝেতে কম্বল পেতে তিনি যোগাসন করছিলেন, সেখানে এবং বারান্দায়ও অনেক লোক। 'কি হলো' জিজ্ঞাসা করাতে সকলের কাছ থেকে একই জবাব পেলাম, 'আসন করতে গিয়ে আটকিয়ে গেছেন।' ভিড় ঠেলে শোবার ঘরে গিয়ে দেখি মামাশ্বশুর মশায় নতুন কেনা লাল কম্বলের উপরে তাঁর সাধের পদ্মাসনে বসে রয়েছেন। তবে তাঁর মুখে স্বর্গীয় প্রশান্তির পরিবর্তে প্রচণ্ড উদ্বেগ।

কিছুক্ষণের মধ্যে ব্যাপারটা অনুধাবন করতে পারলাম। সত্যিই উনি পদ্মাসনে আটকিয়ে গেছেন। আজই প্রথম বহু চেষ্টার পরে অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে পদ্মাসনে বসেছেন কিন্তু তার পরেই আটকে গিয়েছেন, এখন আর বেরিয়ে আসতে পারছেন না। তাঁর দুই পায়ের পাতা উরুর উপরে চেপে বসে গেছে, গিঁটে-গিঁটে ফিট করে গেছে দুই গোড়ালি, এখন আর এই প্যাঁচ খুলতে পারছেন না।

প্রায় দু' ঘণ্টা এই অবস্থায় আছেন। এটাই সর্বকালের দীর্ঘতম সময়ের পদ্মাসনের রেকর্ড, ঠিকমতো ভাবে পেশ করলে বুক অফ রেকর্ডেও স্থান পেতে পারে। তবে এতক্ষণ পদ্মাসনে থাকলে শূন্যে উঠে যাওয়ার যে সম্ভাবনা থাকে তা অবশ্য দেখা যাচ্ছে না। মামাশ্বশুর মশায় বোধহয় মুখ বিকৃত করে সেই উড্ডয়ন-প্রবণতাকেই প্রতিরোধ করার চেষ্টা করছেন। জানলা দিয়ে বেরোনো এত বড় শরীরের পক্ষে সম্ভব নয়, মামীশাশুড়ি মহাশয়া বুদ্ধি করে ঘরের দরজাটা ভেজিয়ে দিয়েছেন যাতে তাঁর পতিদেবতা মহোদয় ফুরুৎ করে উড়ে না যান।

অবশ্য দেখেশুনে মনে হচ্ছে সে সম্ভাবনা খুবই কম। কিন্তু উড়তে পারুন বা না পারুন, অন্তত এই পদ্মাসনের বেড়াজাল ছিঁড়ে তাঁকে অন্য দশজন সাধারণ মানুষের মতো হাঁটাচলা, ওঠা-বসা তো করতে হবে; সংসার

আছে, অফিস আছে, আহার-নিদ্রা, শয়ন-ভোজন আছে, এই ভাবে পদ্মাসনে আটকে থাকলে তো চলবে না।

মুখ-চোখের বিকৃতি এবং উন্মুক্ত শরীরের বিভিন্ন অংশের পেশী সঞ্চালন দেখে বুঝতে পারলাম তিনিও প্রাণপণ চেষ্টা করছেন পদ্মাসন খুলে বেরিয়ে আসতে। দরদর করে সারা শরীর দিয়ে ঘাম পড়ছে তাঁর।

পাড়ার ডাক্তারকে খবর দেওয়া হয়েছিলো। তিনি পুরনো আমলের বুড়ো চিকিৎসক, কিন্তু জন্মেও কোনো রোগীকে এ অবস্থায় দেখেন নি। মামাশ্বশুর মশায়ের চারপাশে তিন-চার পাক দিয়ে তিনি বললেন, 'গজেনবাবুকে হাসপাতালে নিয়ে যান।'

হাসপাতালে নেওয়া কি সোজা কথা! অফিস পড়ে রইলো। পাড়ার কয়েকটি ছেলের সাহায্যে একটি টেম্পো ভাড়া করে তারপর পাশের বাড়ি থেকে একটি বেশ বড় কাঁঠাল কাঠের পিঁড়ি ধার করে সেই পিঁড়ির উপরে তাঁকে বসিয়ে বিয়ের কনেকে যেভাবে পিঁড়িতে তুলে সাতপাক দেওয়া হয় সেইভাবে শূন্যে তুলে টেম্পোতে বসিয়ে দেওয়া হলো।

এখন হাসপাতালে কি হবে কে জানে? মামাশ্বশুর মশায় কতদিন এইরকম আটকিয়ে থাকবেন তা-ই বা কে বলতে পারে?

তবে বেডের জন্যে অসুবিধে হবে না নিশ্চয়। কারণ মামাশ্বশুর মশায়ের কোনো বেড দরকার নেই, তিনি তো বসেই আছেন, বেডে শোয়ার অবস্থায় পৌঁছালেই তিনি বাড়ি ফিরে আসবেন, তখন আর হাসপাতালের দরকার নেই।

সেই আমি

কয়েকবছর হলো আয়নার সামনে দাঁড়ানো প্রায় ছেড়ে দিয়েছি। দিনের মধ্যে দু-এক বার দাড়ি কামানোর জন্যে অথবা চুল আঁচড়ানোর জন্যে যখন বাধ্য হয়ে নিষ্ঠুর মুকুরের সামনে দাঁড়াতে হয়, নিজের প্রতিবিম্ব দেখে চমকে উঠি।

এ লোকটা কে ? এই স্ফীতোদর, স্থূল বদন, তাম্বুলক্লিষ্ট দন্ত-বিকশিত এই চোরা কারবারি অথবা কালোবাজারির মতো চেহারায় গোলগাল, নির্বোধ-দর্শন মানুষটা, আমি ? সঙ্কোচে আমার মোষের মতো কাঁধের ওপরের মোটা মাথা নত হয়ে আসে। তাড়াতাড়ি চুল আঁচড়ানো কিংবা দাড়ি কামানো সেরে ফেলি।

যাঁরা আমাকে গত দশ-পনেরো বছর দেখেন নি, কিন্তু আগে চিনতেন, এখন যদি আমাকে দেখেন মনে কষ্ট পাবেন। যদি তাঁদের কারো হৃদয়ে মায়া-মমতা বলে কিছু থাকে তা হলে আমার বর্তমান রূপ দেখে চোখে হয়তো জল আসবে। আমার সেই নবদূর্বাদল শ্যাম চিক্কণ কান্তি—সে এখন কোথায়, সেই ফুরফুরে লোকটির এখন জল্লাদের মতো অবয়ব হয়েছে।

অবশ্য একদিনে বা এক সপ্তাহে আমার এই দুরবস্থা হয় নি। ধীরে ধীরে আমার মেদোন্নতি হয়েছে। আধাগরীব সংসারী মানুষ। ছাই-ভস্ম যখন

যা পেয়েছি, খেয়েছি। সবই শরীরের মধ্যে গিয়ে রক্ত-মাংসে পরিণত হয়েছে এবং আমার এই অবস্থা করেছে।

এখন সবাই বলেন, সময় থাকতে সাবধান হওয়া উচিত ছিলো। কিন্তু সময়মতো সাবধান হইনি একথা বলা খুব উচিত হবে না। রোগা হওয়া ও মেদ কমানোর উপরে অন্তত সাত-আটটা ইংরেজি বই কিনে মন দিয়ে লাল-নীল পেন্সিলে দাগিয়ে দাগিয়ে পড়েছি। ইচ্ছে করলেই আমি এখন 'নিজের মেদ নিজে কমান' কিংবা 'রোগা হওয়ার সহজ উপায়' নামে বাংলায় বেস্ট-সেলার লিখে ফেলতে পারি। কিংবা হয়তো আরো বেশি বিক্রি হবে যদি মোটা মহিলাদের জন্যে 'তিন দিনে তন্বী' বলে গ্রন্থ রচনা করি। আমার সেই বইয়ের পরামর্শ অনুসরণ করে হলফ নিয়ে বলতে পারি, এই মরপৃথিবীতে কারো দশ গ্রাম ওজন-ও কমবে না, তবে আমার কিছু অর্থাগম হবে।

অন্তত পক্ষে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এই যে, ঐ বিলিতি গ্রন্থগুলির উপদেশগুলি পালন করে আমার কোনো লাভ হয় নি। শুধু ব্যায়াম, যোগব্যায়াম বা ডায়েট কণ্ট্রোল নয়, এই বিলিতি নির্দেশগুলি রোগা হওয়ার যুদ্ধে আমাকে বহু জটিল অভিজ্ঞতা এনে দিয়েছে।

একটা বইতে ছিলো, যখনই সম্ভব হামাগুড়ি দিতে হবে। বাড়ির মধ্যে যতক্ষণ থাকবো চেষ্টা করতে হবে হামাগুড়ির ওপর থাকতে। এতে ভুঁড়ি কমবে, মেদও কমবে। ঘরের মধ্যে হাঁটাচলা সবই চার পায়ে। বাইরের দরজার ছিটকিনি নিচের দিকে করে নিয়েছিলাম যাতে বেল বাজলে নিজে হামাগুড়ি দিয়ে গিয়ে খুলতে পারি। অবশ্য এতে একটা সুবিধে হতো, ফেরিওলা বা ভিখিরি হলে গৃহস্বামীকে চতুষ্পদে দেখা মাত্র পৃষ্ঠপ্রদর্শন করতো। কিন্তু আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব দেখে চমকে যেতেন। আমার এক বৃদ্ধা পিসিমা আমাকে এই রকম চারপায়ে দরজা খুলতে দেখে রীতিমতো কান্নাকাটি জুড়ে দেন। কিন্তু তাতেও আমি নিরস্ত হইনি। তবে যখন হাঁটু ছড়ে ছড়ে চওড়া কড়া পড়ে গেলো অথচ ওজন কমলো না, তখন আমি জীবনে দ্বিতীয়বার হামাগুড়ি দেওয়া ছেড়ে নিজের পায়ে উঠে দাঁড়ালাম।

শুধু হামাগুড়ি নয়, শীর্ষাসন থেকে ডিগবাজি পর্যন্ত নানা জাতের পরামর্শ ছিলো এই বিদেশী বইগুলিতে। একটা বইতে ছিল দৈনিক আধঘণ্টা করে পেটে অলিভ অয়েল মেখে রোদ্দুরে ভুঁড়ির মেদ পোড়ানোর সচিত্র নির্দেশ। অলিভ অয়েলের মূল্য অত্যন্ত বেশী এবং সেই সঙ্গে আমার ভুঁড়ির আয়তনও অতিশয় জাঁদরেল, তাই এই মহার্ঘ নির্দেশনামাটি মান্য করা সম্ভব হয় নি।

কিন্তু অর্থদণ্ড থেকে সম্পূর্ণ অব্যাহতি পাই নি। একবার খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন দেখে প্রলুব্ধ হয়েছিলাম। একজন বেঢপ মানুষ মাত্র তিন সপ্তাহে একটি যন্ত্রের সাহায্যে কেমন চিত্রতারকার মতো সুঠাম স্বাস্থ্যের অধিকারী হয়েছে, ছবি সহ সেই বর্ণনা দেখে ভি পি ডাকে যথেষ্ট অর্থব্যয় করে যন্ত্রটি আনিয়ে নিলাম। যন্ত্রটি, দাম বেশি বটে, খুবই সরল। দুটো লোহার ডাণ্ডার মধ্যে একটা স্প্রিং লাগানো, সেই লোহার ডাণ্ডা দুটি দুই হাতে ধরে স্প্রিংটাকে সারাদিন ধরে টানতে হবে আর ছাড়তে হবে।

প্রথম দিনেই মহা দুর্ঘটনার সম্মুখীন হলাম। স্প্রিংটা জোরে টেনে নিয়ে যেই ছেড়ে দিয়েছি হঠাৎ তীরবেগে সম্পূর্ণ যন্ত্রটা আমার হাত ছিটকে বেরিয়ে গেলো এবং ছাদ পর্যন্ত উঠে গিয়ে বুমেরাংয়ের মতো আমার দিকেই ঘুরে এলো। ছোটবেলায় দিনের পর দিন লেখাপড়া পণ্ড করে কপাটি খেলেছি। এতদিনে সেই কপাটি খেলার শিক্ষা কাজে লাগলো। খণ্ডমুহূর্তের মধ্যে ব্যাপারটা অনুধাবন করা মাত্র তড়িদ্‌গতিতে শরীরটা কাত করে যন্ত্রটির ছোঁয়া থেকে নিজেকে রক্ষা করলাম। কিন্তু শেষ রক্ষা হলো না। ঘরের একপ্রান্তে সদ্য নিযুক্তা পরিচারিকা ঠাকরুন মেজে মুছছিলেন, তাঁর মাথায় গিয়ে যন্ত্রটি লাগলো, তিনি সঙ্গে সঙ্গে হাত-পা ছড়িয়ে 'ওরে বাবারে' বলে মেজেতে শুয়ে পড়লেন। তাঁর কাতর আর্তনাদ শুনে রান্নাঘর থেকে খুন্তি হাতে গৃহিণী ছুটে এলেন এবং পরিচারিকার ঐ পরিণতি দেখে আমার দিকে সন্দেহজনক এবং অগ্নিবর্ষী চোখে তাকাতে লাগলেন। পরদিন সাতসকালে পরিচারিকার পতিদেবতা এবং ছয় জন দেবর আমাকে বাড়ি চড়াও হয়ে চমৎকার ভাষায় অভিনন্দিত করলেন এবং আমি যদি ভবিষ্যতে সামলে না

চলি এবং এক বিন্দুও বেচাল হই তা হলে তাঁরা আমার টেংরি লেংরি করে দিতে ইতস্তত করবেন না—এ কথা জানিয়ে গেলেন। অবশ্য এ নিয়ে সামান্য মতভেদ হয়েছিলো ; এক দেবর হুমকি দিয়েছিলেন টেংরি লেংরি করে দেবেন, অপর এক দেবর তাঁকে সংশোধন করে বলেছিলেন, 'দূর পাঁঠা, টেংরি আবার লেংরি কি, বল লেংরি-টেংরি করে দেবো।' এই দুটো ঠিক কি জিনিস এবং দুটোর মধ্যে পার্থক্য কি ধরতে না পারলেও বুঝতে পারলাম দুটোই সমান বিপজ্জনক।

মূলকথা, যন্ত্রব্যায়ামও পরিত্যাগ করতে হলো। এরপরে এক সহকর্মীর কু-পরামর্শে নিউ মার্কেট থেকে নগদ পঞ্চাশ টাকা দিয়ে একটা হাওয়া-বেল্ট কিনেছিলাম। ছয় ইঞ্চি চওড়া ভেতরে হাওয়া ঢোকানো চামড়া ও রবারের তৈরি এই বেল্টটি পেট জুড়ে চেপে বাঁধতে হয়, এতে ভুঁড়ি ধীরে ধীরে চুপসে যায় ; নড়াচড়া, চলাফেরার সঙ্গে সঙ্গে ফাঁপানো বেল্টের দোলানিতে মেদের ম্যাসাজ চলতে থাকে।

ঐ পঞ্চাশ টাকাই জলে গিয়েছিলো। জিনিসটা মাত্র দেড় মিনিট ব্যবহার করেছিলাম। পেটে চেপে বাঁধতেই দম বন্ধ হয়ে এলো, চোখে অন্ধকার দেখতে লাগলাম, আরেকটু হলেই মারা পড়েছিলাম আর কি!

বেল্টটাকে ফেরত দিতে গিয়েছিলাম, দেখলাম অনুরূপ বেল্ট হাতে আরো দুজন লোক দোকানীর সঙ্গে ঝগড়া করছেন। আর ভেতরে যেতে সাহস পেলাম না।

জিনিসটা বাড়ির সামনের সেলুনে তিন টাকায় বেচে দিয়েছি, তারা ওতে ক্ষুর ধার করে।

পুনশ্চ : আমার ওজন আরও তিন কেজি বেড়েছে।

শিশুশিক্ষা

এক বাড়িতে বাইরের ঘরে বসে অপেক্ষা করছিলাম গৃহস্বামীর জন্যে। কিছুই খেয়াল করিনি, হঠাৎ পায়ের গোড়ালিতে একটা দংশনের যন্ত্রণা

অনুভব করলাম। পা দুটো ছিলো একটা নিচু বেতের টেবিলের তলায়। তাড়াতাড়ি চমকে উঠে দেখি একটি দশ-বারো মাস বয়েসের শিশু কখন নিঃশব্দে হামাগুড়ি দিয়ে টেবিলের নিচে ঢুকে জুতোর ওপরে আমার গোড়ালির মাংস তীক্ষ্ণ দুধদাঁত দিয়ে কামড়ে ধরেছে। যখন ঘরে ঢুকেছিলাম ঘর খালিই ছিলো কিংবা হয়তো শিশুটি সোফা-টোফার পিছনে হামাগুড়ি দিয়ে ঘুরছিলো; এমন-ও হতে পারে ভিতরের ঘর থেকে পর্দার নিচ দিয়ে চলে এসেছে, অন্যমনস্ক থাকায় আমি টের পাই নি। অবশ্য একটু পরেই বাড়ির ভিতরে শোরগোল শোনা গেলো, 'ডাকু কোথায় গেলো, ডাকু ?' বুঝলাম এই অবোধ শিশুটিই নিজ যোগ্যতায় এই সামান্য বয়েসে এই নাম অর্জন করেছে।

খুঁজে খুঁজে বাইরের ঘরে এসে এক পরিচারিকা ডাকুকে উদ্ধার করে নিয়ে গেলেন। ততক্ষণে তার ধারালো দংশন থেকে আমি আমার পা

ছাড়িয়ে নিয়েছি, চারটে দাঁত গর্ত হয়ে বসে গেছে, সেখানে লাল মুক্তোর মত রক্তের বিন্দু।

মনে পড়লো কয়েক বছর আগে যোধপুর পার্কে এক বাড়িতে সদর গেটে নোটিশ দেখেছিলাম,

Beware of Children—শিশু হইতে সাবধান।

সেদিন ঐ নোটিশটি দেখে কৌতুক অনুভব করেছিলাম, গৃহস্বামীর সস্নেহ বিপদসঙ্কেত যথেষ্টই আনন্দ দিয়েছিলো। কিন্তু আজ এতদিন পরে ঐ রকম একটি বিজ্ঞপ্তির প্রকৃত অর্থ আমার হৃদয়ঙ্গম হলো।

অবশ্য এ রকম অভিজ্ঞতা এই প্রথম নয়। একবার এক বিবাহবাসরে একটু তাড়াতাড়ি পৌঁছে গিয়েছিলাম। বিশাল হলঘরে একা-একা তাকিয়া ঠেসান দিয়ে বসে থাকতে বেশ ভালই লাগছিল। কিন্তু বিপদ বাধালো একপাল শিশু। তারা অবশ্য দশ-বারো মাস বয়েসের নয়, তার চেয়ে বেশ বড়, সাত-আট বছরের দল একটা। তারা চোর-চোর খেলা আরম্ভ করলো। প্রথমে বুঝতে পারিনি, খেলা আরম্ভ হওয়ার পরে ধরতে পারলাম আমাকেই তারা বুড়ি বানিয়েছে। একজন চোর আর বাকিরা চোরের হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্যে বুড়ি ছুঁয়ে অর্থাৎ আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে পরিত্রাণ পেতে লাগলো। ফলে অনতিবিলম্বে আমাকে উঠে পড়তে হলো, কিন্তু তাতে রক্ষা নেই, প্রথমে শিশুরা তাদের বুড়িকে চেপে ধরে আটকে রাখার চেষ্টা করলো এবং তারপরেও যখন আমি গায়ের জোরে তাদের হাত ছাড়িয়ে বেরিয়ে এলাম, এক দঙ্গল ক্ষুদে শয়তান আমার চারদিকে ঘুরে ঘুরে হাততালি দিয়ে 'বুড়ি পালালো', 'বুড়ি পালালো' বলে নাচতে লাগলো। তখন বিয়েবাড়িতে লোকসমাগম শুরু হয়েছে ; সুন্দরী রমণীরা এবং সুবেশ ভদ্রলোকেরা আমার এই কৌতুককর অবস্থা নিয়ে যথেষ্ট মজা পেলেন। সেদিন সেই বিবাহবাসর থেকে কিছু না খেয়েই বাড়ি ফিরে এসেছিলাম, কারণ বেশিক্ষণ এ ভাবে থাকা সম্ভব ছিলো না।

এ সব আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা। তবে আমি এর চেয়েও অনেক হিংস্র এবং নিষ্ঠুর শিশুর কথা শুনেছি যারা বাড়িতে বাইরের লোক পেলে

তাকে ছাতা দিয়ে খোঁচায় কিংবা রবারের বল ছুঁড়ে মারে। আমার স্ত্রী একদিন এক বাড়ি থেকে খোঁড়াতে খোঁড়াতে ফিরে এসেছিলেন, তাঁর প্রিয় বান্ধবীর পুত্র তার খেলার ছোট ক্রিকেট ব্যাট দিয়ে তাঁর হাঁটুতে বিনা প্ররোচনায় অতর্কিতে প্রচণ্ডভাবে আঘাত করে। শিশুটির জনকজননী তখন সামনের সোফায় হাসিমুখে বসেছিলেন, শুধু আমার স্ত্রী যখন আর্তনাদ করে ওঠেন, বলেছিলেন, 'ছিঃ বাবলু, অত জোরে মারতে নেই।'

অনেক সরল চেহারার শিশুকে দেখে বোঝার উপায় নেই তাদের কি প্রকৃতি। তাদের ভাসা ভাসা চোখ, পাতলা ঠোঁট, এলোমেলো চুল দেখে অমলতার প্রতীক বলে মনে হয়। কিছুতেই বোঝার উপায় নেই এই শিশুটিই দশ মিনিট আগে ইস্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে সিঁড়ির উপরে একজন অচেনা ভদ্রলোককে ল্যাং দিয়ে ফেলে দিয়েছে কিংবা এই মুহূর্তেই সে পারে আলমারির মাথার উপরে উঠে গগনভেদী হুঁউউ চিৎকার করে যে কোনো অপ্রস্তুত ব্যক্তির উপরে আচম্বিতে লাফিয়ে পড়তে।

এ সব দৈহিক নির্যাতন ছাড়াও মৌখিক ব্যাপারেও শিশুদের দৌড় কিছু কম নয়। আমার এক প্রতিবেশীর কন্যা 'বাবা', 'মা' ইত্যাদি প্রথম যে তিন চারটি শব্দ শেখে তার মধ্যে একটি ছিলো 'শালা'। বাড়িতে কেউ এলেই তাকে 'শালা-শালা' করে গালাগাল করতে থাকতো। সুখের বিষয় সে তখনো 'শ' উচ্চারণ করতে পারতো না। ফলে সে বলতো 'শালা-শালা'—কিন্তু শোনাতো থালা-থালা। তার মা বাইরের লোকদের বলতেন, 'ও খুব ঘটি-বাটি-থালা নিয়ে খেলতে ভালোবাসে, তাই খালি থালা-থালা বলে।'

এর চেয়ে একটু বড় যারা তারা অনেক রকম দুষ্ট বুদ্ধি ও ইয়ার্কি ইস্কুল থেকে, কখনো বড়দের কাছ থেকে শিখে ফেলে। কিছুদিন আগেও যে কোনো বিবাহযোগ্য অথচ অবিবাহিত ছেলে বা মেয়েকে এই রকম শিশুদের অন্তত একটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হতো। প্রশ্নটি অতি সরল, বাটা বানান কি? সঙ্গে সঙ্গে যে কেউ বলবে, কেন বি এ টি এ। আর তখনই প্রশ্ন আসবে, 'কি হলো, তুমি বিয়েটিয়ে করবে না?'

অবশ্য তরলমতি প্রাপ্ত বয়স্কেরাও অনেক সময় শিশুদের প্ররোচিত

করেন। সেদিন এক বাড়িতে একটি বছরতিনেকের শিশু তার দুধ খাওয়ার স্টেনলেস স্টিলের বাটিটা হাতে করে নিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলো, 'বল তো, এটা কি?' আমি অবাক হয়ে বললাম, 'কেন, এটা একটা বাটি।' ছেলেটা আমাকে মুহূর্তের অবকাশ না দিয়ে বললো, 'তোর বৌয়ের সঙ্গে সাঁতার কাটি।' তার এই সাহসে এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষায় আমি যথেষ্ট পুলকিত হলাম। আমি রেগে না যাওয়ায় সে যথেষ্টই দুঃখিত হলো।

পরে জানতে পেরেছি এক তরুণ সাংবাদিক তার ভাগিনেয়কে এই চমৎকার বাক্যালাপটি প্রথম শিক্ষা দেয় এবং এখন সংক্রামকভাবে এটি শিশুদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে।

শিশুদের বিরুদ্ধে সব খারাপ কথা লেখার পরে একটি চমৎকার দৃশ্যের বর্ণনা করি। সেদিন পার্কে দেখলাম একটি সদ্য দাঁড়াতে শেখা শিশু থপ থপ করে হাঁটতে চেষ্টা করছে, দু' কদম গিয়েই পড়ে যাচ্ছে। দেখি তার গলায় সুতো দিয়ে ঝোলানো আছে একটা টিনের চাকতি, তাতে লাল অক্ষরে লেখা ইংরেজি 'এল'। অর্থাৎ লার্নার, মোটরগাড়ি চালানো শেখার সময় গাড়িতে যেমন লাগানো থাকে, শিশুটির মা সদ্য হাঁটিয়ের গলায় সেরকম ঝুলিয়ে দিয়েছেন। সে যদি আপনার গায়ে পড়ে তার কোনো দায়িত্ব নেই।

ঘুম

ঘুমের কথা লিখতে গেলে প্রথমেই সেই বিখ্যাত বালিকাটির কথা বলে নেওয়া ভালো।

ছাত্রজীবনে এবং তারপরেও কিছুদিন গৃহশিক্ষকতা করেন নি এমন বাঙালী বিরল। আমার বন্ধু-বান্ধবেরা সকলেই টিউশনি করেছেন, কিণ্ডারগার্টেন থেকে এম. এ. পরীক্ষার ছাত্র-ছাত্রী পর্যন্ত যে যার যোগ্যতা অনুযায়ী পড়ানোর চেষ্টা করেছেন। আমার এই বন্ধুরা প্রায় সকলেই দাবি করেন উপরিউক্ত বালিকাটি তাঁরই ছাত্রী ছিলো।

বালিকাটির ছিলো ঘুমের দোষ। ঘুমের জন্যে পড়াশুনা তার মাথায়

উঠেছিলো। আমি নিজেও তাকে কিছুদিন পড়িয়েছি। সে এক অসামান্য অভিজ্ঞতা। প্রথম সপ্তাহে কিছু বুঝতে পারি নি। কিন্তু দ্বিতীয় সপ্তাহেও যখন দেখলাম যা পড়া দিয়েছি কিছুই করে রাখছে না, তার উপরে পড়তে বসে কেবলই হাই তোলে; হাই শুধু হাই, হাইয়ের পর হাই; আমি ছাত্রীটিকে এক চোট খুব ধমকালাম। বেশ ধমকানোর পরে মেয়েটির কাছে সোজাসুজি জানতে চাইলাম, 'পড়া করে রাখো নি কেন?' মেয়েটি নির্বিকার কণ্ঠে একটা ছোট হাই দমন করতে করতে উল্টো প্রশ্ন করলো, 'কখন পড়বো, স্যার?'

আমি বললাম, 'কেন, সন্ধ্যাবেলা।'

'সন্ধ্যাবেলা বড় ঘুম পায়, স্যার।' মেয়েটি এবার আর তার হাই-তোলা আটকাতে পারলো না।'

কিন্তু আমি ছাড়লাম না, 'ঠিক আছে, সন্ধ্যাবেলাই ঘুমোবে। সকাল-

বেলা ঘুম থেকে উঠে পড়া করবে।'

মেয়েটি ইতিমধ্যেই বাঁ হাতের তর্জনী ও মধ্যমার সাহায্যে ছোট একটা তুড়ি তুলে সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাসের মতো একটা বিপুল হাই ঠেকানোর চেষ্টা করছিলো। ঐ অবস্থাতেই আলতো করে উত্তর দিলো, 'সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে বড়ো খিদে পায়, স্যার।'

আমি বললাম, 'ঠিক আছে, তোমাকে না খেয়ে পড়তে বসতে হবে না, তুমি আগে খেয়ে নেবে।'

মেয়েটি এবার আমতা আমতা করে বললো, 'না স্যার, খেলে আমি পড়তে পারবো না।'

আমি অবাক হয়ে গেলাম, 'কেন?'

মেয়েটি অম্লানবদনে বললো, 'খেলেই আমার ভীষণ ঘুম পায়।'

সেই মুহূর্তে আমি মেয়েটিকে চিনতে পারলাম। এই সেই বিখ্যাত বালিকা যার কথা অনেক শুনেছি, অনেক পড়েছি। যার ঘুম থেকে উঠলেই খিদে পায়, আর খেলেই ঘুম পায়।

খাওয়া-ঘুম-খাওয়া-ঘুম-খাওয়া—এই রকম চক্রাকারে চলেছে এর জীবনযাত্রা, এর মধ্যে আর কিছুর জন্যে কোনো ফুরসত নেই। অর্থনীতির ভাষায় যাকে বলে কুটিল চক্র বা ভিসাস্ সার্কল, যার উদাহরণ হলো ভারি শিল্প নেই বলে আমরা গরিব এবং আমরা গরিব বলেই আমাদের ভারি শিল্প নেই। এই মেয়েটিও একই রকম কুটিল বৃত্তে আবদ্ধ, ঘুমোলেই খিদে আর খেলেই ঘুম।

কিন্তু অন্যের ঘুম নিয়ে রসিকতা করার অধিকার আমার নেই। আমি ঘুমোইনি এমন কোনো জায়গা নেই। যে কোনো জায়গায় সামান্য এলিয়ে পড়তে পারলেই আমি ঘুমিয়ে পড়ি। বাসের হ্যাণ্ডেল ধরে দাঁড়িয়ে, ট্রেনের পাদানিতে ঝুলতে ঝুলতে বিভিন্ন বিপজ্জনক অবস্থায় আমি ঘুমিয়েছি। একবার চিৎ সাঁতার দিতে দিতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, আড়াই ঘণ্টা পরে ঘুম ভেঙে দেখি—নদীর ঘাটে ছিলাম, মধ্য নদীতে চলে এসেছি; গায়ের চামড়া সাদা হয়ে কুঁচকে গেছে।

ক্লাবে বা বৈঠকখানায় আড্ডা দিতে দিতে, অফিসের টেবিলে ফাইল করতে করতে, এমন কি প্রমত্ত যৌবনে নিজের ফুলশয্যার রাতে আমি নাক ডাকিয়ে ঘুমিয়েছি।

আমি যখন প্রথম অফিসে ঢুকেছি, কালীঘাটের বাড়িতে তখন একা-একা, সকালবেলা ঘুম থেকে উঠতে অনেকদিন দেরি হয়ে যেতো, আগের দিন হয়তো খুব রাত জাগা হয়েছে। এই রকম এক দেরির দিন, বেলায় উঠে চা খেয়ে খবরের কাগজ পড়তে পড়তে আবার ঘুমিয়ে পড়েছি। দ্বিতীয় দফায় ঘুম থেকে উঠে স্নান-খাওয়া করে অফিস যেতে সাড়ে বারোটা হয়ে গেলো। ওপরওলা আমাকে ধরলেন, দেরির ব্যাখ্যা চাইলেন। তখন আমার সত্যভাষণের প্রতি খুব ঝোঁক ছিলো, মুখ কাঁচুমাচু করে বললাম, 'স্যার, ঘুম থেকে উঠে আবার ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।' ভদ্রলোকের মুখ দেখে মনে হলো আমার কথা শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেছেন, চোখ থেকে চশমা খুলে অবাক দৃষ্টিতে আমাকে নিরীক্ষণ করতে লাগলেন। তারপর আবার চশমাটা চোখে দিয়ে ঠাণ্ডা গলায় প্রশ্ন করলেন, 'সে কি মশাই! আপনি বাড়িতেও ঘুমোন নাকি?'

আমার সেই ওপরওলা বেশ কিছুদিন হলো চাকরি থেকে অবসর নিয়েছেন। মধ্যে একদিন রাস্তায় দেখা হয়েছিলো, আমাকে দেখে খুশি হয়ে এগিয়ে এলেন। আমাকে বললেন, 'আপনাকেই খুঁজছিলাম, আপনি আমার দুঃখটা বুঝবেন।'

আমি বললাম, 'কিসের দুঃখ আপনার? আপনার চেহারা দেখে তো শরীর ভালোই মনে হচ্ছে।' ভদ্রলোক ম্লান হেসে বললেন, 'শরীর যে খারাপ ঠিক তা নয়। কিন্তু ঘুমের একটু কষ্ট পাচ্ছি। আপনি কষ্টটা একটু বুঝতে পারবেন, তাই বারবার আপনার কথাই মনে হচ্ছিল।'

আমি স্বাভাবিকভাবেই জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনার রাতে ঘুম হচ্ছে না?'

ভদ্রলোক মাথা নেড়ে বললেন, 'না, সেকথা বলা ঠিক হবে না। রাতে ঘুম মোটামুটি হচ্ছে।'

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, 'তবে ?'

উনি বললেন, 'তবে আর কি ? সকাল বেলায় ঘুম থেকে উঠে, হাতমুখ ধুয়ে, চা খেয়ে, খবরের কাগজ পড়ে আরেকটু ঘুমিয়ে নিই। আর তো কাজ নেই, কি আর করবো বলুন ?'

আমার সমাহিত মুখের দিকে তাকিয়ে আমার প্রাক্তন ওপরওলা নিজেই বলে চললেন, 'না, সত্যি কথা বলছি। সকালবেলা ঘুমোতে খুব কষ্ট হয় না। তারপর ঘুম থেকে উঠে স্নান-খাওয়া সেরে মধ্যাহ্ন নিদ্রা। দুপুরে আর এই বুড়ো বয়সে কি-ই বা করার আছে; কষ্টেস্রষ্টে একটু ঘুমিয়ে নিই। কিন্তু আসল অসুবিধা হয় ঐ বিকেলের দিকে। বিকেলের চা খেয়ে কত চেষ্টা করি কিছুতেই আর ঘুম আসতে চায় না। সে যে কী কষ্ট, রাত ন'টার আগে আর কিছুতেই ঘুম আসবে না।'

ভদ্রলোক সত্যি কথা বলছেন, নাকি আমার নিদ্রালু স্বভাবকে ঠাট্টা করছেন, কিছু বুঝতে না পেরে একটি ক্ষীণ নমস্কার করে তাঁর হাত থেকে বেরিয়ে এলাম।

পুনশ্চ : একজন পাঠিকা অভিযোগ করেছেন 'কাণ্ডজ্ঞান-এ' বড় কুকুরের উৎপাত। সুতরাং ঘুমের প্রসঙ্গে কুকুরের কথা বলবো না, তবে একটা বেড়ালের কথা বলি।

এই পত্রিকারই এক বিখ্যাত লেখিকার বাড়িতে অগুন্তি বেড়াল। তারই একটা, আমার চোখের সামনে, ইঁদুর তাড়া করে লাফ দিয়ে উঠলো আলমারির মাথায়। আলমারির পিছনে ইঁদুর। ওত পেতে স্থির হয়ে বসে রইলো বেড়ালটি, ওত পেতেই ঘুমিয়ে পড়লো। বেড়ালের যে নাক ডাকে সেই প্রথম জানলাম। সেই গুরু গুরু নাক ডাকতে ডাকতেই বেড়ালটি আলমারির মাথা থেকে নিচে পড়ে গেলো। এরপর এক সেকেণ্ড নীরবতা, তারপর ঐ পতিত অবস্থাতেই আবার সে নাক ডাকিয়ে ঘুমোতে লাগলো।

গামছা

মানুষ ধাপে ধাপে নামতে নামতে অধঃপতনের গহ্বরের অতলে তলিয়ে যায়। আমার অবস্থা তাই দাঁড়িয়েছে। বেশ চলছিলো চোর-ডাকাত, কুকুর-বিড়াল নিয়ে। হঠাৎ মনে হলো কত রকম ভালো জিনিস আছে এই পৃথিবীতে, সে সব নিয়েও কাণ্ডজ্ঞানে কিছু লেখা দরকার।

ভালো-ভালো জিনিসের কথা ভাবতে গিয়ে আমার প্রথমেই মনে পড়লো গামছার কথা! গামছা ভালো জিনিস, আমার এই কথা শুনে কোনো কোনো তরুণী পাঠিকা হয়তো নাক সিটকোবেন, ভাববেন এটাই আমার চূড়ান্ত অধঃপতন। কিন্তু আমার চূড়ান্ত অধঃপতন এত সহজে হবে না, তার জন্যে আরো বেশ কিছুদিন অপেক্ষা করলে ভালো হয়। ইতিমধ্যে গামছা সম্পর্কে লিখে ফেলি।

মাননীয় পাঠিকা, আপনার বাড়িতে যদি পুরনো কাশীরাম দাসের

মহাভারত থাকে, একবার দয়া করে খুলে দেখবেন শ্রীকৃষ্ণের বস্ত্র-হরণের সেই বিখ্যাত ছবিটি। গলাজলে গোপাঙ্গনারা হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে মিনতি করছেন শ্রীকৃষ্ণের কাছে আর জলের কিনারায় এক গাছের ডালে নির্বিকার স্মিতহাস শ্রীকৃষ্ণ বসে রয়েছেন, আর গাছের ডালে সারি-সারি ঝুলছে লুকিয়ে নিয়ে আসা স্নানরতা কামিনীদের কাপড়। ভালো করে লক্ষ করলে দেখতে পাবেন এই পরিধেয়গুলি শাড়ি, গাউন বা সালোয়ার-কামিজ নয়, নিতান্তই গামছা।

খুব ছোটবেলায় তখনো ভালো করে পড়তে শিখিনি, মাতুলালয়ে খুল্লমাতামহী মহাভারত পড়ছিলেন, আমি তাঁকে ছবিটি দেখিয়ে, 'গাছের ওপর ওগুলো কি, ছোটো দিদিমা?' এই প্রশ্ন করেছিলাম, তিনি পড়া না থামিয়ে ছবিটির দিকে এক পলক দৃষ্টি দিয়ে বলেছিলেন, 'কেন, 'ওগুলো তো গামছা।'

আমার আশঙ্কা, সেই থেকে আমার অবচেতন মনে গামছার প্রতি একটা আসক্তি জন্মে গেছে।

এ-সব ঐতিহাসিক তথ্য থাক, শুধু গামছা বিষয়ে বিশদ আলোচনায় যাওয়ার আগে একটা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বলবো। মফঃস্বলের পুকুর পাড়ে আমি মানুষ হয়েছি, পরে বড় হয়ে কলকাতার লেকেও দু-চারবার সাঁতার কেটেছি, আমি চাক্ষুষ জানি যে মহিলাদের ওয়ান-পিস সুইমিং কস্টুম হিসেবে গামছার কোনো তুলনা হয় না। কলকাতায় হয়তো চলবে না, কিন্তু ফ্রান্সে, ফ্লোরিডায় কিংবা ক্যালিফোর্নিয়াতে সুইমিং কস্টুম হিসেবে গামছার চালান দিয়ে যে কেউ লক্ষপতি হওয়ার চেষ্টা করতে পারেন। এই রঙীন জালি-জালি, খসখসে পরিধেয় জলকেলি-আসক্তা মেম-ললনাদের খুবই প্রিয় হবে বলে আশা করা মোটেই অন্যায় হবে না।

কিন্তু গামছা সেই অর্থে কোনো শৌখিন জিনিস নয়। কোনো ফেলনা জিনিসও নয়। একালে গামছার ব্যবহার একটু কমেছে, কলকাতায় এবং শহরাঞ্চলে অনেকেই তোয়ালের ভক্ত। কিন্তু সত্যি কথা বলতে গেলে গামছার সঙ্গে তোয়ালের কোনো তুলনাই হয় না। গামছার দাম কম,

গামছা পরিষ্কার করা সোজা, গামছা যত পুরনো হবে তত মোলায়েম হবে। তার সঙ্গে একবার ময়লা হলে আর কিছুতেই পরিষ্কার হবে না, তেলচিটে গন্ধ, রোঁয়াওঠা শুঁয়োপোকার মতো তোয়ালের তুলনার কোনো প্রশ্নই ওঠে না, তবে একদিন অন্তর যদি একটা করে নতুন তোয়ালে ব্যবহার করা যায়, তাহলে সে কথা আলাদা।

তবে পুরনো তোয়ালে, রাগ করে, ধোপার বাড়ি থেকে কাচানোর পরও ময়লা লেগে থাকায়, ফেলে দেওয়া উচিত হবে না। পুরনো তোয়ালে দিয়ে চমৎকার পা মোছা যায়, গামছা দিয়ে মাথা-হাত-মুখ মুছে পুরনো তোয়ালে দিয়ে পা মোছা যাবে। আর পুরনো তোয়ালে দিয়ে ঘরমোছার ন্যাতা পরিচারিকারা খুব পছন্দ করেন, তাছাড়া সেলাই করে চমৎকার আঁশটে-জল নিরোধক বাজারের মাছের থলি হয়।

তবে শুধু গা মোছা বা স্নান করার জন্যে নয়, নানা প্রয়োজনে গামছার মতো জিনিস নেই। বিশ-তিরিশ বছর আগে পাড়ায় চোর ধরা পড়লে তাকে সবাই মিলে পিটিয়ে মেরে ফেলা হতো না। তাকে গামছা দিয়ে বেঁধে থানায় নিয়ে যাওয়া হতো। আমাদের পণ্ডিতিয়া রোডের পুরনো বাসায় এই কয়েক বছর আগেও ভোরবেলা একতলার জানলায় দাঁড়িয়ে দেখেছি হাত পিঠমোড়া করে গামছা দিয়ে বেঁধে পাড়ার লোকেরা হইহই করতে করতে সদ্য ধৃত চোরকে থানায় নিয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু গলায় গামছা দিয়ে টাকা আদায় করার ব্যাপারটা বোধহয় খুব সোজা নয়। একটা রেলের অফিসের সদর দরজার বাইরে আজ পনেরো বছর ধরে দুজন স্থায়ী ব্যবসায়ীকে প্রায় নিয়মিতই দেখতে পাই। তাঁদের একজন গামছা বেচেন, বহু বর্ণের, বহু আকারের ও আয়তনের গামছা নিয়ে শীত-গ্রীষ্মে, রোদে-জলে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকেন। অপরজন হলেন এক কাবুলিওয়ালা ভদ্রলোক, ইনি নতুন যুগের কাবুলি, পাগড়িহীন, পরনে প্যান্ট ও হাওয়াই শার্ট, কখনো সফরি সুট, দিনের পর দিন, মাসের পর মাস খাতকের এবং তাঁর সুদের জন্যে এঁর অনন্ত প্রতীক্ষা। মাঝে-মধ্যে তাঁকে তাঁর খদ্দেরদের সঙ্গে কথা কাটাকাটি, ঝগড়া-ঝাঁটি করতেও দেখি।

কিন্তু সহজলভ্য হওয়া সত্ত্বেও কোনোদিন তাঁকে গামছা ব্যবহার করতে দেখিনি। কৌতূহলবশত গামছাওলাকে একদিন জিজ্ঞাসাও করেছিলাম। না, কাবুলি ভদ্রলোক গত পনেরো বছরে একবারও একটি গামছা খরিদ করেননি।

গামছা ছাড়া বাঙালীর উৎসব অনুষ্ঠান অচল। বিয়ে হবে না—পাত্রের গামছা চাই, পাত্রীর গামছা চাই, পুরুতের গামছা চাই, নাপিতের গামছা চাই, ধোপার গামছা, ঝি-চাকরকে গামছা দিতে হবে, ক্যাটারার না থাকলে পরিবেশনকারীদেরও গামছা দিতে হবে।

অন্নপ্রাশনে গামছা লাগবে, শ্রাদ্ধে অবশ্যই। যে কোনো পূজোয় পুরুতের জন্যে গামছা চাই। তবে এই পূজোর গামছা যাঁরা বানান, তাঁরা নমস্য, তাঁরা দক্ষ কারিগর। দুই ইঞ্চি বাই তিন ইঞ্চি, মাত্র ছয় বর্গ ইঞ্চি আয়তনের দশ-বারোটি সুতো জুড়ে এই ক্ষুদ্রতম বস্ত্রখণ্ডটি তৈরী হয়, এর দাম এখনো এই বাজারেও এক টাকায় পৌঁছয় নি। এই জিনিসগুলি পুরুতঠাকুরদের কি প্রয়োজনে লাগে জানতে ইচ্ছে হয়।

এর চেয়ে সামান্য বড় আয়তনের একটি গামছা পরে একবার বাসী বিয়ের দিন এক নতুন বরকে আনুষ্ঠানিক স্নান করতে দেখেছিলাম। তার হয়তো ধারণা ছিলো, এ গামছা যখন নাপিত পাবে তখন যত ছোটই হোক আমার কি? দুঃখের বিষয় স্নান করার সময় সে টের পেলো চতুর্দিকে মহিলা পরিবৃত হয়ে ছোট গামছা পরে স্নান করা কত কঠিন। ফলে বাজার থেকে একটি প্রমাণ সাইজের গামছা আনতে বরপক্ষের একজনকে ছুটতে হলো।

স্থানাভাবে সব কথা বলা সম্ভব নয়। তবে গামছা সম্পর্কে একটা শেষ উপদেশ দিয়ে রাখি। গামছা কিনতে হবে দোলের দু'দিন আগে। কেনার পর জলে চুবিয়ে রাখলে অন্তত তিন বালতি রঙ বেরোবে। দোলের জন্য আলাদা করে রঙ কিনতে হবে না, তা ছাড়া এ খুবই পাকা রঙ, যদি অন্য কোনো কাপড়ে লাগে কখনোই ওঠে না।

টাকা-পয়সা
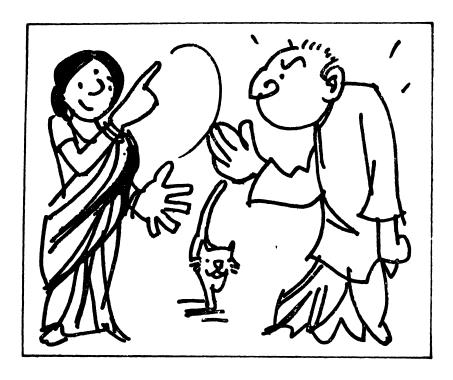
আর হাসি-ঠাট্টা নয়। এবার আমরা টাকা-পয়সার কথা আলোচনা করবো।

প্রথমেই মিতব্যয়িতার কথা আসবে। সেই সূত্রে প্রসিদ্ধ দুই কৃপণের গল্প আপনাদের আরেকবার মনে করিয়ে দিচ্ছি।

পয়সামারি গ্রামের কৃপণ কুলতিলক শ্রীযুক্ত আধকড়ি গুপ্ত হঠাৎ খবর পেলেন যে নদীর ওপারে সিকিসরাই গ্রামের টঙ্করঞ্জন নামে এক ব্যক্তির কার্পণ্যের খ্যাতি তাঁর প্রতিষ্ঠাকে ম্লান করে দিয়েছে। অনেক শোনার পরে একদিন আধকড়িবাবু সিকিসরাই গ্রামে গেলেন টঙ্করঞ্জনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। দুঃখের বিষয়, টঙ্করঞ্জন তখন বাড়ি ছিলেন না। আধকড়ি-বাবু খ্যাতনামা কঞ্জুষ, টঙ্করঞ্জনের বাড়িতেও যাঁর খ্যাতি পৌঁছেছিলো।

টঙ্করঞ্জনের মেয়ে আনাদাসী দরজা খুলেছিলো, সে যখন শুনলো ইনিই আধকড়িবাবু, স্বভাবতই খুব ভদ্রতা করতে লাগলো। বসতে বললো, বিশ্রাম করতে বললো। কিন্তু আধকড়ি যখন শুনলেন তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীর ফিরতে দেরি হবে তিনি আর বসলেন না। তখন মেয়েটি বললো, 'তা হলে যাওয়ার আগে একটু মিষ্টিমুখ করুন। একটা সন্দেশ খেয়ে যান।' এই বলে আনাদাসী হাতটা গোল করে ঘুরিয়ে শূন্যে একটি কাল্পনিক সন্দেশের আকার রচনা করে অতিথিকে আপ্যায়িত করলো।

টঙ্করঞ্জন যখন বাড়ি ফিরে শুনলেন, কৃপণকুলতিলক তাঁর বাড়িতে পদধূলি দিয়েছিলেন, প্রথমেই খোঁজ নিলেন আপ্যায়নের কোনো ত্রুটি হয়েছে কিনা। মেয়ে বললো, 'না বাবা, আমি তাঁকে সন্দেশ খাইয়েছি।' বলে শূন্যে বৃত্ত রচনা করে কাল্পনিক সন্দেশটি বাবাকে দেখালো। সেই উড়ো সন্দেশ দেখে টঙ্করঞ্জনের মাথা খুব গরম হয়ে গেলো, মেয়েকে মারলেন টেনে এক চড়, 'বজ্জাত মেয়ে, বাবার পয়সা বেশি দেখেছো? হাত গোল-গোল করে অত বড় সন্দেশ দেখাতে গেলে কেন, আঙুল মুঠো করে ছোটো সন্দেশ দেখাতে পারো নি?'

এ নিতান্তই গল্প, মেঠো গল্প। এর পরে একটি প্রচলিত প্রবাদের কথা বলি। 'ভাজা মাছটি উলটে খেতে জানে না', এই বিশিষ্টার্থক বাক্যটির মধ্যে একটি গোলমেলে কঠিন ব্যাপার আছে।

ভাজা মাছ উলটে খাওয়া খুব সোজা ব্যাপার নয়। পুরো প্রক্রিয়াটা এই রকম। থালার একপাশে মাছ ভাজাটি থাকবে, ভাত খাওয়ার শুরুতে মাছ ভাজাটি উলটিয়ে অন্য পাশে নিয়ে যেতে হবে। এ পাশে থালার গায়ে যে তেলটুকু লেগে থাকবে সেটুকু দিয়ে মেখে দু' মুঠো ভাত খেয়ে তারপরে ওপাশ থেকে মাছ ভাজাটিকে এপাশে নিয়ে এসে আবার উলটে দিতে হবে। এবার ওপাশের ওলটানো জায়গায় লেগে থাকা তেলটুকু মেখে আবার দু' গ্রাস, তারপর আবার মাছ তুলে নিয়ে অপর পাশে উলটে দিয়ে এ পাশের তেল দিয়ে আর চারটি ভাত। এই ভাবে বাঁ পাশ ডান পাশ করে উলটিয়ে উলটিয়ে মাছ ভাজাটি অক্ষত রেখে

পুরো ভাত খেয়ে নিতে হবে, থালার ভাত নিঃশেষ হয়ে যাবে, কিন্তু যেমন মাছ ভাজা তেমনি রবে।

পুরো ব্যাপারটি গুছিয়ে বলা জ্যামিতির উপপাদ্য কষার মতোই কঠিন। তবু ব্যাপারটি যাঁরা অনুধাবন করতে পেরেছেন নিশ্চয়ই বুঝছেন ভাজা-মাছ উলটে খাওয়া সোজা কাজ নয়। তার চেয়েও বড় কথা কৃপণতা অথবা কঞ্জুষপনার এর চেয়ে নিষ্ঠুর উদাহরণ আর হয় না। ছোটদের গল্পে এক কৃপণ জলে রসগোল্লার ছায়া ফেলে সেই জলটা খেতো, রসগোল্লাটা না খেয়ে তুলে রাখতো; কিন্তু তার চেয়ে অনেক বেশি নির্মম ও কঠিন এই মাছ ভাজা উলটে খাওয়ার কাহিনী।

এ সব প্রবাদ বা উপকথার গল্প থাক। আমাদের আশেপাশেই অনেক কৃপণ আছেন যাঁদের দেখে চট করে কৃপণ বলে ধরা যায় না।

একবার এক রবিবারের সকালে এক ধনবান গৃহস্থের বাড়িতে গিয়ে দেখেছিলাম গৃহকর্তা ভৃত্যের উপর প্রচণ্ড রাগারাগি করছেন বাজার থেকে সে দশ-পয়সা দিয়ে নিমপাতা কিনে এনেছে বলে, কারণ বাড়ির একটু দূরেই কালীঘাট পার্ক, (তখনো কালীঘাট পার্কে সত্যিই বেশ কয়েকটা নিমগাছ ছিলো), সেখানে একটা টেবিল নিয়ে গিয়ে অনায়াসেই টেবিলের উপর দাঁড়িয়ে দু-চার টাকার নিমপাতা পেড়ে আনা যায়, তার বদলে কিনা নগদ দশ পয়সা খরচ করে বাজার থেকে নিম পাতা! সব লাট সাহেবের বাচ্চা।

মজার কথা, আমাকে দেখে গৃহকর্তা একটুও দমলেন না, তাঁর এই রাগারাগি যে কিঞ্চিৎ অসঙ্গত তা বোঝার ক্ষমতাই তাঁর নেই। তিনি আমাকে সাক্ষী মেনে চাকরের উপর গজরাতে লাগলেন, 'দেখুন তো, বাড়ির পাশে কালীঘাট পার্ক, আর বাজার থেকে নিমপাতা কেনে!'

কলেজ স্ট্রিটে এক বড়লোক মুদ্রাকরকে দেখেছি ঘোর গ্রীষ্মে আলো-পাখা বন্ধ করে চেয়ারে বসে দরদর করে ঘামছেন আর মরচে ধরা আলপিন ঘষে ঘষে পরিষ্কার করছেন। তিনি যে অত মরচে ধরা আলপিন কোথায় পেতেন, ভগবান জানেন।

এক ভদ্রলোককে দেখেছি মাসকাবারি সরষের তেল বড় বড় শিশিতে ভরে রাখেন। শিশির গায়ে ওষুধের মিক্সচারের বোতলের মতো কাগজ কেটে দাগ লাগানো। এই দাগ লাগানো শিশিতে তেল ভরে তিনি লোহার আলমারিতে রেখে দেন। প্রতিদিন সকাল বেলা এক দাগ করে সরষের তেল, একেবারে বাঁধা নিয়ম। চারটি শিশিতে আটটা করে বত্রিশটা দাগ! কোনো দিন কোনো বিশেষ ব্যাপার থাকলে, ঐ কালেভদ্রে এক দাগ বেশি। কোনো মাসেই সে বাড়িতে মাসের শেষে সরষের তেল ফুরিয়ে যায় না। সে বাড়িতে শুধু সরষের তেল নয়, আটা, ময়দা, চিনি, চাল সবই এই রকম পরিষ্কার মাপ করা। ভদ্রলোকের সকাল বেলাটা চমৎকার কেটে যায় লোহার আলমারি খুলে জিনিসপত্র বের করতে আর বন্ধ করতে। ফলে খবরের কাগজ পড়ার ফুরসত নেই, খবরের কাগজ নেওয়া ছেড়ে দিয়েছেন, সময় পান না বলে আজকাল বাজারও প্রায়ই করেন না।

কৃপণের ব্যবহারে আমি নিজের জীবনে দুবার খুবই আহত হয়েছি। এক বিখ্যাত ভদ্রলোকের আমার কাছে কোনো একটা ব্যাপারে কিছু প্রয়োজন ছিলো। তিনি আমাকে কফি হাউসে আসতে অনুরোধ করেছিলেন। অনেকক্ষণ কথাবার্তার পর এবং অনেক ভেবেচিন্তে তিনি আমাকে এক পেয়ালা কফি খাওয়ালেন। সে সময় এক পেয়ালা কফির দাম ছিলো পঞ্চাশ পয়সা। কফি খাওয়ার পরে বিল মিটিয়ে তিনি আমার সামনে পকেট থেকে একটা মোটা ডায়েরি বের করে ঐ তারিখের পাতায় লিখলেন, 'চ্যারিটি—৫০ পয়সা'।

এর চেয়েও মর্মান্তিক আমার এক বন্ধুর ব্যবহার। তারও হিসেব লেখার ব্যাপার, কিন্তু সে হিসাব একটু অন্য রকম। তার বাড়িতেও এক সকাল-বেলায় আমি যাওয়ায় সে খুব খুশি হয়ে চাকরকে ডেকে দু-টাকার জিলিপি সিঙ্গাড়া আনালো। দুজনে মিলে খেলাম। খাওয়ার পরে দেখি অনেকক্ষণ ধরে জমা-খরচের খাতায় কি লিখলো। শুধু জিলিপি-সিঙ্গাড়া দু-টাকা লিখতে এত সময়? সে উঠে একটু অন্য ঘরে যেতেই আমি জমা-খরচ খাতাটা খুলে দেখলাম, ছয় লাইন হিসাব :—

জিলিপি	১০	এক টাকা
সিঙ্গাড়া	৫	এক টাকা
জিলিপি	৬	তারাপদ
জিলিপি	৪	আমি
সিঙ্গাড়া	৩	তারাপদ
সিঙ্গাড়া	২	আমি।

পাগলের কাণ্ডজ্ঞান

এবারের কাণ্ডজ্ঞান পাগলের কাণ্ডজ্ঞান। এ বিষয়ে কারো মনে যদি কোনো সংশয় থাকে অনুগ্রহ করে এ সপ্তাহে কাণ্ডজ্ঞান পড়বেন না।

এক পাগল ভদ্রলোক তাঁর বাড়ির রাস্তার দিকের বারান্দায় বসে একটি জলভরা গামলায় ছিপ ফেলে মাছ ধরছিলেন। পথ দিয়ে যেতে যেতে এই দৃশ্য দেখে কৌতূহলী একজন জিজ্ঞাসা করলেন, 'মশায়, ক'টা ধরা পড়লো ?' এর উত্তরে ঐ পাগল ভদ্রলোক কি বলেছিলেন তা নিয়ে কিঞ্চিৎ মতভেদ আছে। একটি বিখ্যাত শিশুকাহিনীতে আছে, ঐ পাগল ভদ্রলোক দাঁত খিঁচিয়ে জবাব দিয়েছিলেন, 'আপনাকে নিয়ে তিনটে। এর আগে আর দুটো বোকা ধরেছি।'

অন্য একটি ততোধিক বিখ্যাত গল্প অনুসারে প্রশ্ন শুনে পাগল ভদ্রলোক লজ্জায় জিব কেটে বলেছিলেন, 'কি বলছেন দাদা, বারান্দায় গামলার মধ্যে মাছ আসবে কি করে ? পাগল নাকি ?'

গল্প দুটি দু'রকম। কিন্তু দুটি ক্ষেত্রেই বারান্দায় মৎস্যশিকারী পাগল ভদ্রলোককে আপাতদৃষ্টিতে যতটা কাণ্ডজ্ঞানহীন মনে হয়েছিলো, তিনি আসলে তা নন।

এ অবশ্য গল্পের পাগলের কথা কিন্তু বাস্তবজীবনেও সত্যিকারের পাগলের কাণ্ডজ্ঞান কিছু কম নয়।

পাগল দু'রকম। রাস্তার পাগল ও ঘরের পাগল। প্রথমে রাস্তার

পাগলের কথা বলি। রাস্তার পাগল মানে ঘরের বাইরের মুক্ত পাগল। প্রত্যেক রাস্তায়, মোড়ে, চৌমাথায়, বাজারে অন্তত একজন করে পাগল আছে। একজন থাকলে অবশ্য বিশেষ কোনো অসুবিধা হয় না, বরং এলাকাটি মোটামুটি বেশ জমজমাট থাকে। কিন্তু পাগলের সংখ্যা একের বেশি হয়ে গেলে অনেক সময় গোলমাল বেধে যায়। একজন পাগল আরেকজন পাগলকে কদাচিৎ সহ্য করতে পারে। নিরীহ, নির্বিরোধী পাগল ল্যাম্পপোস্টে হেলান দিয়ে অনর্গল বিড়বিড় করছে, কারোর ক্ষতি করছে না, তাকে নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। তার পাগলামির বহিঃপ্রকাশ অতি সামান্যই। পাঁচ-সাত মিনিট পর পর রাস্তার যে কোনো মহিলাকে মিষ্টি হেসে জিজ্ঞাসা করে, 'হ্যালো, জাপান যাচ্ছেন কবে?'

সঙ্গত কারণেই পাড়ার লোকেরা এই লোকটির নাম দিয়েছিলো জাপানি পাগল। লোকটি এ পাড়ার লোক নয়, তার পূর্বজীবনের কথা বিশেষ কেউ জানে না। কেউ কেউ বলে স্পাই, কারো ধারণা খবরের

কাগজের রিপোর্টার। ভালোই ছিল লোকটা। হঠাৎ কোথা থেকে এই পাড়াতেই এক চঞ্চল উন্মাদ এসে উপস্থিত হয়েছে। সে অতিদ্রুত গলির এমাথা থেকে ওমাথা পারচারি করছে, আর প্রায় প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা করছে, 'টাইম কত ?' কেউ যদি সময় কত বললো, সে গম্ভীর হয়ে তাকে বলছে, 'তা হলে তো খুব দেরি হয়ে গেলো ?' অনেক সময়ই অচেনা ব্যক্তিরা এই রকম বাক্যালাপে একটু ঘাবড়ে যান।

তবুও মোটামুটি চলছিলো, কিন্তু গোলমাল বাধলো সেদিন, যখন দুজনেরই খদ্দের এক হয়ে গেলো। প্রথমজন যখন এক মহিলাকে কবে জাপান যাবেন বলে প্রশ্ন করছে, দ্বিতীয়জন তার কাছেই টাইম জানতে এলো। মহিলাটি অন্য পাড়ার, তিনি দ্রুত পদক্ষেপে গলি ত্যাগ করলেন। কিন্তু দুই পাগল পরস্পরেব দিকে রোষকষায়িত লোচনে বহুক্ষণ তাকিয়ে রইলো। তারপর প্রথম পাগল বেশ শান্ত হয়ে হাতজোড় করে বললো, 'দাদা, এইটুকু ছোটো গলি, এখানে দুজন পাগলের স্থান হবে না।' দ্বিতীয় পাগল কি বুঝল কে জানে, সেই যে পাড়া ছেড়ে চলে গেলো আর এলো না। প্রথম পাগল এখনো রোদবৃষ্টিতে সেই একই ল্যাম্পপোস্টে দাঁড়িয়ে থাকে এবং কিছুক্ষণ পর পর সম্ভাব্য জাপানযাত্রিণীদের কাছে তাদের যাত্রার তারিখ জানতে চেয়ে মিষ্টি হাসে।

দ্বিতীয় পাগলটি অবশ্য এর মধ্যে বড় রাস্তায় পৌঁছে গেছে এবং পাগলামির কলাকৌশল বদল করেছে। এখন সে ট্রাফিক কণ্ট্রোল করে। কর্তব্যরত হোমগারড বা ট্রাফিক পুলিশকে সাহায্য করার যথাসাধ্য চেষ্টা করে।

কে যেন বলেছিলেন, সমস্ত পাগলেরই মনের বাসনা হলো ট্রাফিক কণ্ট্রোল করা, এইটাই হলো উন্মাদনার সিদ্ধিলাভের শেষ সোপান। কোথা থেকে একটা ছোটো লাঠি কুড়িয়ে নেয় এরা, কখনো এক টুকরো কাপড় বা চট জোগাড় করে। কখনো পতাকা উড়িয়ে রেললাইনের পয়েন্টসম্যানের মতো, কখনো ছড়ি নাচিয়ে ড্রিলমাষ্টারের মতো এরা ট্রাফিক দমন করে। এইরকম একজন পাগল একজন ঘুমন্ত ট্রাফিক পুলিশের সহায়তায় গত

শনিবার সন্ধ্যায় পার্কস্ট্রিটের মোড়ে এমন জটলা পাকিয়ে দিয়েছিলো, সেই ট্রাফিকের জট হ্যারিসন রোড পর্যন্ত আটকিয়ে দেয়।

কিন্তু এই দ্বিতীয় পাগলও কাণ্ডজ্ঞানহীন নয়। তার আছে পরিমিত বোধ, তার আছে এলাকা বোধ। ট্রাফিকের জট পুরো পাকিয়ে গেলে, শিশুর হাতের গুলিসুতোর মতো যখন গাড়িগুলো একেবারে জড়িয়ে যায়, যখন মিনিবাস আর ট্যাক্সিগুলো মর্মভেদী আর্তনাদ করতে থাকে, সে তখন রাস্তা থেকে উঠে আসে, ফুটপাথের উপরে পানের দোকানের আয়নায় নিজেকে লজ্জিতভাবে দেখতে থাকে।

ট্রাফিকবিলাসী পাগলদের এলাকাবোধের কোনো তুলনা নেই। আমাদের পূর্ববর্ণিত পাগল লোকটি বাঙ্গালী যুবক, পার্কস্ট্রিটের মোড় পর্যন্ত সে যাবে, তার ওপারে কখনো সে যাবে না। রিপন স্ট্রিটে, ফ্রি স্কুল স্ট্রিটে ট্রাফিকের দায়িত্ব এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান পাগলের, সে আবার তার পাড়া ছেড়ে কোনো বাঙ্গালী পাড়ায় যাবে না। মল্লিকবাজারে গাড়ি নিয়ন্ত্রণ করে একজন বিহারী মুসলমান পাগল, বেন্টিঙ্ক স্ট্রিটে ছেঁড়া জুতো হাতে চিনেম্যান পাগলকে গাড়ি দমন করতে দেখেছি। আর হিন্দুস্থানী হলে তো কথাই নেই, হাওড়া স্টেশন থেকে সোজা নেমে বড়বাজারে; তার আবার ঠেলাগাড়ি, রিকশা এইসবের কন্টোল করার দিকেই ঝোক। প্রচণ্ড অধ্যবসায় সহকারে আশিটা স্থাণু ঠেলাগাড়িকে দুই ইঞ্চি দুই ইঞ্চি করে ঠেলে ফাঁক করে, একদিন খুব ভোরবেলা দেখেছি, হিন্দুস্থানী এক পাগল দুটো গলির মুখ সম্পূর্ণ আটকিয়ে বন্ধ করে দিল। তারপর সেই আশিটা ঠেলাগাড়ির ফাঁক বুজিয়ে গলির মুখ খোলা, সে এক অসম্ভব অবস্থা।

তবু রাস্তার পাগল ভালো। রাস্তার পাগল দেখে ভয় পাওয়ার কিছু নেই, তাকে রাতদিন পাবলিকের সঙ্গে মেলামেশা করে চলতে হয়, অনেক ঘা খেয়েছে সে, তাকে না ঘাঁটালে সে কখনোই খুব বিপজ্জনক হবে না।

কিন্তু ঘরের পাগল সাংঘাতিক হতে পারে। বন্ধুর বাড়ির দরজার কলিংবেল টিপে অপেক্ষা করছেন, এমন সময় পাশের বাড়ির পাগল পা

টিপে টিপে পিছনে এসে আচমকা আপনার গলা টিপে ধরলো, এ রকম অনায়াসেই হতে পারে।

ঘরের পাগল শুধু বাড়িতে নয়, অফিসেও আছে। একটা অফিসের খ্যাতি ও প্রতিপত্তি নির্ভর করে সেই অফিসে কতজন নির্ভরযোগ্য পাগল আছে তার উপরে। অনেকে হয়তো জানেন না বহু পুলিশের দারোগা পাগল। দুজন উন্মাদ বড়বাবু আর একজন উন্মাদ পোস্টমাস্টারকে আমি ব্যক্তিগতভাবে চিনি। বহুতল বাড়িগুলির লিফটম্যানদের মধ্যে অন্তত শতকরা পঁচিশ জন পাগল, কেবল টেনে টেনে ভুরুর লোম (নিজের) ছিঁড়ছে আর বিড়বিড় করছে অথবা মিটমিট করে হাসছে, সাততলা বললে তেরো-তলায় নামিয়ে দিচ্ছে।

কিন্তু তবুও লিফট ওঠানামা করছে, থানা-পুলিশ অফিস-কাছারি যা হোক করে চলছে, ডাক বিলি হচ্ছে। পাগলদের কাণ্ডজ্ঞান আছে বলেই না এ সব সম্ভব হচ্ছে।

দুঃখের বিষয়, রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদে বা হরিণঘাটা দুধের ডেয়ারিতে কোনো পাগল নেই, তাই তাদের আজ এত বেহাল, এত দুরবস্থা।

ভিখিরি

ভিখিরিদের নিয়ে কোনো রকম রসিকতা করা উচিত হবে কি না, গরিব অসহায় ভিখিরিদের ঠাট্টা করা নীতিসঙ্গত কি না এ সব প্রশ্ন আমার মনেও রয়েছে। কিন্তু সারাজীবন ধরে ভিখিরিরা আমার প্রতি যে নির্দয় ব্যবহার করেছে তা মনে করলে আমার তাদের ওপর একটুও মায়া হয় না।

বছর খানেক আগে খবরের কাগজে পড়েছিলাম, বৈদ্যনাথে একদল দেহাতি তীর্থযাত্রী অসংখ্য ভিখিরিকে প্রচণ্ড পেটায় এবং বহু ভিখিরি তাঁদের আক্রমণে প্রাণত্যাগ করে। কাহিনীটি নিঃসন্দেহে করুণ, সংবাদপত্রে বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়নি, আমার এখনো জানতে ইচ্ছে করে কি এমন কারণ ঘটেছিল যাতে ভিখিরিদের উপর নিরীহ দেহাতি

তীর্থযাত্রীরা এ রকম মারমুখো হয়ে ওঠেন।

আমার অসুবিধে হলো আমার অবয়বের জন্যেই হোক অথবা আমার চলাফেরার ভঙ্গির জন্যেই হোক, আমার চেহারার মধ্যে বোধহয় একটা ধনাঢ্য অথচ দয়ালু অথচ দুর্বল ভাব আছে। রাস্তা-ঘাটে, মেলায়-বাজারে ভিখিরিরা আমাকে ছেঁকে ধরে। রাসবিহারী অ্যাভিনিউয়ের মতো বিরাট রাস্তায় একদিকের ফুটপাথ দিয়ে আমি যাচ্ছি, অন্যদিকের ফুটপাথে একজন খোঁড়া ভিখিরি লাঠি ভর দিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ ঐ প্রান্ত থেকে সামনের সমস্ত সম্ভাব্য দাতাদের ফেলে রেখে ট্রাম, বাস, ট্যাক্সি নস্যাৎ করে সে আমার সামনে ছুটে এসে দাঁড়াল। তাকে যত এড়িয়ে যাই, সে তত দক্ষ হকি খেলোয়াড়ের মতো লাঠি হাতে আমার পথ আটকে দাঁড়ায়।

গত সপ্তাহে এক বিকেলবেলায় নিউমার্কেটের পাশের রাস্তায় গায়ে আলকাতরা-কেরোসিন মাখা, সেই সঙ্গে ন্যাকড়ার ফালি জড়ানো দুজন

নকল কুষ্ঠরোগী দুদিক থেকে গড়াতে গড়াতে, আমি কিছু টের পাওয়ার আগে, আমাকে দুজনের মাঝখানে আটকে ফেলল। শেষে বাধ্য হয়ে দুজনের মধ্যে একটা সিকি ফেলে দিয়ে বললাম, 'দুজনে ভাগ করে নাও।' একটা সিকি মানে পঁচিশ পয়সা, দু' ভাগে ভাগ করা সোজা কাজ নয়। এতক্ষণ উভয়ে মৃত্যপথযাত্রীর মতো চাপা গোঁ গোঁ স্বরে করুণ বিলাপ করছিল, মুহূর্তের মধ্যে দুজনেই খাড়া হয়ে বসল, সিকির সমবণ্টন নিয়ে লাগাল প্রচণ্ড বচসা, শুরু হলো অকথ্য গালাগাল। এই সুযোগে আমি ওদের মধ্য দিয়ে পাশ কাটিয়ে বাঁচলাম।

তবে এর চেয়ে আরো মারাত্মক হলো যানবাহনের ভিখিরিরা। যান-বাহনের ভিখিরি প্রধানত দু' রকম। প্রথম হলো, চলন্ত যানবাহনের মধ্যে ভিখিরি, যেমন শহরতলীর রেলগাড়িতে, কলকাতা স্টেটবাসে। যে ভিড়ের মধ্যে একটা সরষের দানা পর্যন্ত গলানো সম্ভব নয়, তার মধ্য দিয়ে অবলীলাক্রমে অন্ধ ভিখিরি গলায় হারমোনিয়ম ঝুলিয়ে গান গাইতে গাইতে চলে যায়। অবশ্য সবচেয়ে আকর্ষণীয় হলো এক মাদ্রাজী ভিখিরি। সে সকলের কোলে কোলে ইংরেজিতে ছাপা কার্ড ফেলে দিয়ে যায়। কার্ড পড়লে জানা যাবে যে সে বোবা। তার বাবা বোবা, তার মা বোবা, তার শ্বশুর-শাশুড়ি, কাকা-জ্যাঠা, পিসেমশায়-মেসোমশায়, স্ত্রী-পুত্র-কন্যা, ভাই-বোন, শ্যালক-শ্যালিকা সব বোবা, বিধাতার নির্মম পরিহাসে তার আত্মীয়স্বজন, চৌদ্দ পুরুষ কেউ কথা বলতে পারে না।

এই সূত্রে এই বোবা ভিখিরির কথা বলতে গিয়ে একটা বিলিতি গল্প মনে পড়ল। পথচারী নির্দিষ্ট জায়গায় ভিক্ষা দিতে গিয়ে দেখেন সেখানে একজন নতুন ভিখিরি। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এখানে যে অন্ধ ভিখিরিটি বসতো সে কোথায় গেল?' নতুন ভিখিরিটি বলল, 'আজ্ঞে, ও একটু সিনেমা দেখতে গেছে। ওর পয়সা আমাকে দিতে পারেন, আমি হলাম সামনের মোড়ের বোবা ভিখিরি। ও আমাকে এখানে বসিয়ে রেখে গেছে।'

যানবাহনের ভিখিরির কথাটা আগে শেষ করে নিই। যানবাহনের বিশেষ করে রেলগাড়ির ভিখিরিদের যাঁরা কখনো পয়সা দেন, দেখবেন, লক্ষ

করে দেখবেন, অন্ধ এবং খঞ্জ ভিখিরিরা কি রকম ভাবে চলন্ত ট্রেনের এক কামরা থেকে অন্য কামরায় হ্যাণ্ডেল ধরে তড়িৎ গতিতে চলে যান।

কিন্তু এরা তবু মন্দের ভাল। যানবাহনের বাইরে দ্বিতীয় যে জাতের ভিখিরিরা দণ্ডায়মান, যারা গাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে বিরক্ত করে, তাদের সম্পর্কে সাবধান। এরা নোংরা হাতে বা ভাঙা কাঠি দিয়ে বারবার কনুই ছুঁয়ে দেবে, তাতেও নিস্তার নেই, পয়সা না পেলে গাড়ি ছাড়ার প্রাক্ মুহূর্তে এরা ভীষণ হিংস্র হয়ে পড়ে, ধারালো নখ দিয়ে হাত বা কনুই যা জানলার কাছে পায়, আঁচড়ে দেয়।

আমাদের পুরনো পাড়ায় এক ভিখিরি পরিবার প্রতিবছর মাঘের শীতের রাতে এসে পৌঁছাত। স্বামী, স্ত্রী, ছেলে, ছেলের বউ, আরও ছেলে, বহু মেয়ে মায় দুটো কুকুর সুদ্ধ হাঁড়িকলসী চটকম্বল সব নিয়ে তারা আসতো শীত শেষের কোনো এক মধ্য-রজনীতে। তারপর চারমাস থেকে আষাঢ়ের প্রথমে কোথায় চলে যেত। আবার ফিরে আসত ঠিক সময়ে।

এ সব নিয়ে আমার মাথাব্যথা ছিল না। আমার গোলমাল ছিল অন্য জায়গায়। এই পরিবারটির কর্তা, যাকে পাড়ার ছেলেরা নাম দিয়েছিল বন্যামামা, সে পরিবার-পরিজন নিয়ে মাঘের এক বিধ্বংসী বন্যায় প্রতিবার বাস্তুহারা হতো। আমি নিজেও বাস্তুহারা, পৃথিবীর সব বাস্তুহারা আমার ভাই, তবু মাঘমাসের বন্যায় বাস্তুহারা, প্রত্যেক বৎসর বন্যায় বাস্তুহারা, ব্যাপারটা আমার কেমন খটমট মনে হতো।

সারাটা দিন পুরো পরিবারটি ঝিম মেরে পড়ে থাকত। রাত বারোটায় শুরু হতো তাদের তৎপরতা। থালা হাতে, বাটি হাতে, এমন কি ছেঁড়া গামছা হাতে পরিবারের সব লোকজন ছড়িয়ে পড়ত পাড়ায়, চারদিকে, 'মা, একটা বাসি রুটি দাও গো মা।' তাদের করুণ বিলাপের সঙ্গে সুর মিলিয়ে তাদের কুকুর দুটি পর্যন্ত কেঁউ কেঁউ করে কাঁদত।

একবার একটু নির্মম হয়েছিলাম। রাত্রি সওয়া বারোটায় পরিবারের খোদকর্তা বন্যামামা সেদিন আমাদের দরজায় বাসি রুটির জন্যে কঠিন আবেদন জানাতে লাগল। আমি আর সহ্য করতে পারিনি, বললাম, 'রাত

মাত্র অর্ধেক হয়েছে, এখনো রুটি বাসি হয়নি।' আমার স্ত্রী-পুত্র এতক্ষণ অঘোরে ঘুমোচ্ছিলেন, তাঁরা ঘুমঘোরে কি করে আমার মন্তব্য শ্রবণ করলেন কে জানে, হঠাৎ উঠে বসে আমার ওপর হম্বিতম্বি করতে লাগলেন, 'ছিঃ ছিঃ, গরীব অসহায়দের খিদে নিয়ে ঠাট্টা করছ, জানো, আজ বাদে কাল আমাদেরও এই অবস্থা হতে পারে।'

অবশ্য বন্যামামার চেয়ে নাছোড়বান্দা ভিখিরিও আছে। বউবাজারের মোড়ে এক ভিখিরি ছিল বেছে বেছে পথচারীর দুই পা জড়িয়ে ধরত, শেষে এমন অবস্থা হয়েছিল যে, জানাশোনা লোক পারতপক্ষে মোড়ের ঐ দিকটায় যেত না। অবশেষে মোড়ের ক্ষতিগ্রস্ত দোকানিরা লোকটাকে জোর করে একটা দিল্লীগামী ট্রাকে তুলে তাড়িয়ে দেয়। দোকানিরা চাঁদা তুলে ট্রাকওলার হাতে দিয়ে বলল, 'ইসকো দিল্লীমে ছোড় দেও।' আমি দৈবাৎ সেইখানে উপস্থিত ছিলাম, দ্রুতগামী ট্রাকে অনিচ্ছুক দিল্লীযাত্রীর করুণ বিলাপে মনটা খারাপ হয়ে গেল।

তবে সব ভিখিরিই এক রকম নয়। অনেক কুলীন ভিখিরিও আছে। কুলীন ভিখিরির সব চেয়ে ভাল গল্পটি হয়তো অনেকেই জানে, তাই প্রথম পুরুষে গল্পটি লেখা সমীচীন হবে না, গল্পটি তৃতীয় পুরুষে লিখছি।

তারাপদবাবু পার্কের বেঞ্চিতে বসেছিলেন। সামনে অনেক পোড়া সিগারেটের টুকরো। একজন ভিখিরি সেগুলো কুড়োচ্ছে, বেছে বেছে তুলে জামার পকেটে রাখছে। তারাপদবাবু দেখলেন তাঁর পায়ের কাছেই দুটো বড় টুকরো প্রায় আধ-খাওয়া সিগারেট পড়ে আছে। ভিখারিটি দেখেনি ভেবে তিনি সেইদিকে তার মনোযোগ আকর্ষণ করলেন। সিগারেট দুটির দিকে ক্ষণিক তাকিয়ে তারাপদবাবুর দিকে অগ্নিবর্ষী দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, ভিখারিটি রীতিমতো দম্ভের সঙ্গে বলল, 'ফিলটার ছাড়া খাই না।'

পদবী ও নাম

দৈনিক পত্রিকার দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় যেখানে শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনগুলি মুদ্রিত হয়, সেখানে নাম-পদবী পরিবর্তন নামে একটি কলম আছে। কর্মখালি কিংবা পাত্রপাত্রীর কলমের মতো না হলেও নাম-পদবী পরিবর্তন কলমটির চাহিদাও কিছু কম নয়।

প্রায় প্রতিদিনই খবরের কাগজের ঐ দ্বিতীয় পৃষ্ঠাতে চোখে পড়বে 'আমি খাঁদু পাল আলিপুর আদালতে এফিডেবিট করিয়া গত ২৫ অক্টোবর হইতে শ্যামল রায় হইলাম।' অধিকাংশ এফিডেবিট ও বিজ্ঞপ্তিই পদবী পরিবর্তনের। কোনো কারণে পুরনো পৈতৃক পদবীটি আধুনিক যুবকের পছন্দ হচ্ছে না, নগা মাইতি আদালতে এফিডেবিট করে নিজেকে নগেন্দ্র মৈত্র বলে ঘোষণা করছেন। অনেকে পদবী পালটানোর সময় একই খরচে

হচ্ছে বলে নামও পালটে ফেলছেন। অনেকে আগের নাম ও পদবীর ধারে-কাছে থাকছেন, যেমন ঐ নগা মাইতি থেকে নগেন্দ্র মৈত্র কিংবা ভ্যাবল সর্দার থেকে ভবলাল সরকার।

একটি দ্বিতীয় দল আছেন যাঁরা খোল নলচে সহ তাঁদের পূর্বপরিচয় পালটে ফেলছেন। এঁদের মধ্যে আবার কেউ কেউ বিখ্যাত লোকের নাম গ্রহণ করছেন। একটা বিজ্ঞাপন অনেকদিন আগে দেখেছিলাম, 'আমি নকুড়চন্দ্র হুই হাওড়া আদালতে এফিডেবিট পূর্বক সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় হইয়াছি।'

এই সব বিজ্ঞাপনদাতাদের মতিগতি, মানসিকতা তবু বোঝা যায়, কিন্তু একটা বিজ্ঞাপন অল্পদিন আগে দেখেছিলাম যেখানে জয়ন্ত দাস বলে এক ব্যক্তি জানিয়েছেন যে তিনি জয়ন্তানুজ রায়চৌধুরী হলেন। সম্ভবত তিনি নিজের নামটিকে ভারি ও জবরদস্ত করতে চাইছেন। এরই বিপরীত আরেকজন, তিনি বিজ্ঞাপন দিয়েছেন, 'গত মহালয়া হইতে আমি জাতি-ভেদমূলক চক্রবর্তী উপাধি পরিত্যাগ করিয়া 'ভাই' উপাধি গ্রহণ করিয়াছি। অতঃপর নারায়ণ চক্রবর্তীর স্থলে নারায়ণ ভাই নামে পরিচিত হইব।'

পদবী নিয়ে বিশেষ কিছু লেখা অবশ্য আমার সাজে না। আমার যে রায় পদবী এ নিতান্তই জোলো উপাধি, এর জাত গোত্র বলে কিছু নেই। বহু লোক আমাকে বহুবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে জিজ্ঞাসা করেছেন আমরা কি রকম রায়। আমি বলেছি, আমরা ভালো রকম রায়, আমার বাবা-কাকা-জ্যাঠা, আমার বাবার বাবা-কাকা-জ্যাঠা, আমার ছেলের বাবা-কাকা-জ্যাঠা সবাই রায়।

কিন্তু এতে আমার কোনো সুবিধে হয়নি। আমার নাম এবং পদবী দুই-ই নিয়ে আমি বহুবার নানা বিপদে পড়েছি। প্রথম প্রথম যখন পদ্য লেখার চেষ্টা শুরু করি, এক সম্পাদক সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন তারাপদ রায় কোনো কবিতা লেখকের নাম হতে পারে না, তিনি বলেছিলেন, 'এটা নিশ্চয় তোমার ছদ্মনাম।'

আমার যে জীবনে কখনো উপন্যাস লেখা হলো না সেও আমার এই

নিজের নামের জন্যে। প্রথম যে উপন্যাসটিতে হাত দিয়েছিলাম, তার প্রথম অধ্যায়ে ছিল মাত্র তিনটি চরিত্র। নায়ক, নায়িকা ও নায়কের গৃহভৃত্য। দশপাতা লেখার পর খেয়াল হলো কখন নিজের অজ্ঞাতসারেই চাকরের নাম দিয়েছি তারাপদ। নায়িকা চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ডাকছেন, 'এই তারাপদ, এক গেলাস জল নিয়ে আয়।' আমার অবশ্য কোনো দোষ নেই, চারদিকে তারাপদ নামে চাকরের সংখ্যা এত বেশি যে ঐ নামটাই আমার কলম ফসকে কাল্পনিক চাকরের ঘাড়ে গিয়ে পড়েছে। ফলে আমার আর উপন্যাস লেখা হয়ে ওঠেনি। এ বিষয়ে আগেও বলেছি, এখনো বলি, স্ত্রী-ভূমিকা বর্জিত নাটক যেমন হয়, তেমনিই ভৃত্য-ভূমিকা বর্জিত উপন্যাসের কথা কখনো যদি ভাবতে পারি, দেখা যাবে। না হলে, নিজেকে চাকর বানিয়ে তো আর উপন্যাস লিখতে পারি না। তাতে অবশ্য আমার এই হাস্যকর এবং গ্লানিময় জীবনের কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি হবে তা নয়, কিন্তু স্ত্রী-পুত্র জীবন অতিষ্ঠ করে তুলবেন।

একবার এক সাহিত্যসভায় পদবী সংক্রান্ত একটা ছোট ব্যাপারে এক গোলমেলে লোকের পাল্লায় পড়ে বেশ বেকায়দা হয়েছিলাম। কি কারণে ভদ্রলোকের ধারণা হয়েছিল যে আমি আগে তারাপদ রায়চৌধুরী নামে লিখতাম, বিশেষ কোনো কারণে এখন আর চৌধুরীটুকু লিখি না। যত তাঁকে বোঝাই, 'না মশাই, আমি রায়চৌধুরী নই, রায়চৌধুরী নামে লিখিনি, আমার সাতপুরুষে কেউ রায়চৌধুরী নয়', তিনি তত বলেন, 'রায় আর রায়-চৌধুরী একই হলো মশায়, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ও সুকুমার রায় কে না জানে? আমরা ভুলিনি তারাপদবাবু, আপনার সেই কৃষিবিজ্ঞানের প্রবন্ধ-গুলি, 'নিজের ছাদে নিজের পাট চাষ করুন', 'ড্রইংরুমে কাঁচালঙ্কার ফুল', আর সেই যে লিখেছিলেন, 'কাটোয়ার ডাঁটা, কোথায় লাগে পাঁঠা?'

আমি শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে স্বীকার করলাম যে সত্যিই আমি আগে রায়চৌধুরী ছিলাম, রায়চৌধুরী নামে লিখতাম কিন্তু এখন শুধু রায় লিখি। ভদ্রলোক নাছোড়বান্দা, তবুও জোর করতে লাগলেন, কেন আমি রায়-চৌধুরী টাইটেল ব্যবহার করছি না সেটা জানার জন্যে। তখন তাঁকে খুব

নরম গলায় বললাম, 'কি করবো বলুন? বিয়ের পরে টাইটেল পালটে গেলো যে।' তিনি আমার জবাব শুনে রীতিমতো বিচলিত হলেন কিন্তু আর বিশেষ কথা না বাড়িয়ে পশ্চাদপসরণ করলেন।

এবার পদবী সংক্রান্ত একটি আধুনিক সমস্যার কথা ভয়ে ভয়ে আমি উত্থাপন করব। ভয়ে ভয়ে এই কারণে যে আমার নিজের লোকেরা অনেকে এর মধ্যে রয়েছেন এবং এঁদের মধ্যে অনেকেই কৃতবিদ্য ও যশস্বী। সমস্যাটা অবশ্য মধ্যে যতটা প্রকট হয়ে দেখা দিতে যাচ্ছিল, এখন আর ততটা নেই।

সমস্যা হলো পদবী যুক্তকরণ নিয়ে। এর সঙ্গে নারীর সমানাধিকারের প্রশ্নটি রয়েছে। বিয়ের পরে মেয়েদের পদবী কেন পালটে যাবে! বিবাহ-পূর্ব খ্যাতনাম্নী মহিলা বিয়ের পরেও তাঁর নিজ পদবী রেখে দিয়েছেন এমন নজির বাংলা সাহিত্যে আছে। আবার পিত্রালয় বা শ্বশুরালয়ের কোনো পদবীই ব্যবহার না করে দেবী ব্যবহার করছেন, অন্য দিকে দুই দিকের পদবী একসঙ্গে রয়েছে—এই দু'রকম বিখ্যাত দৃষ্টান্তও চোখের সামনেই রয়েছে।

সমস্যাটা এই পদবীর যুগ্মকরণ নিয়ে। ধরা যাক, জয়ন্ত ঘোষের সঙ্গে জয়ন্তী রায়ের বিয়ে হলো, তাঁরা দুজনেই ঘোষরায় হলেন, তাঁদের ছেলের নাম হলো বৈজয়ন্ত ঘোষরায়।

মনে করুন, আরেকটি দম্পতি তাঁরাও নারীর সমমর্যাদায় বিশ্বাসী। তাঁদের নাম মাধব চক্রবর্তী এবং মাধবী চ্যাটার্জি। বিয়ের পরে তাঁরা হলেন শ্রী এবং শ্রীমতী চক্রবর্তীচ্যাটার্জি, তাঁদের নয়নের মণি একমাত্র মেয়ের নাম হলো সুমাধবী চক্রবর্তীচ্যাটার্জি।

এইবার আসল সমস্যা। কালক্রমে বৈজয়ন্ত এবং সুমাধবী বড় হলো এবং তাদের বিয়ে হলো। বিয়ের পরে সুমাধবীর সম্পূর্ণ নাম হলো শ্রীমতী সুমাধবী ঘোষরায় চক্রবর্তীচ্যাটার্জি।

এখানেই কিন্তু সমস্যার শেষ নয়। আরো এবং আরো সমস্যা গোকুলে বাড়ছে। সেখানে দুটি ছেলে-মেয়ে প্রেমে পড়েছে, তাদের একজনের নাম স্বপন মিত্রটেলার, আরেকজনের নাম আয়েষা রহমানসান্যাল। দুজনেই চমৎকার ছেলেমেয়ে, তাদেরও বিয়ে হলো।

এর পর আবার পঁচিশ বছর। কলকাতার মেট্রোরেলের কামরায় প্রতিদিনের যাতায়াতে দুটি যুবক-যুবতীর মধ্যে প্রেম হয়েছে, তাদের একজন হলো শ্রীযুক্ত অনির্বাণ ঘোষরায় চক্রবর্তীচ্যাটার্জি, অপরজন হলো শ্রীমতী ঝিমকি মিত্রটেলার রহমানসান্যাল।

এর পর কি হবে? বিয়ের পর এদের কি পদবী হবে! এদের ছেলেমেয়ের কি পদবী হবে!

এর পরে আরো বাড়বে। এ হলো জিওমেট্রিক প্রগ্রেসন, প্রত্যেক পুরুষ ডবল হয়ে যাবে। কারো নাম হবে বত্রিশ পদবীযুক্ত, কারো চৌষট্টি, কারো একশো আটাশ। সে এক ভয়াবহ দুর্দিন। একেকজনের নিজের নাম লিখতেই ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলে যাবে। আর মনে রাখাও তো অসম্ভব।

তখন কি হবে, কে জানে।

ছারপোকার এপিটাফ

আমি যখন চাকরিতে ঢুকেছি, একটা জিনিস দেখে আমার খুবই অবাক লেগেছিলো প্রথম প্রথম; সেটা হলো আমার সহকর্মীরা দিনের কাজ শুরু করার আগে অফিসে ঢুকে নিজ নিজ চেয়ার শূন্যে তুলে মেজেতে ছুঁড়ে ফেলে দিতেন। কাজের প্রতি ঘোরতর বিতৃষ্ণা অথবা অফিসের উপর নিদারুণ রাগ, ঠিক কি কারণে এতগুলি শান্ত ভদ্র কর্মচারী প্রতিদিন কাজের প্রারম্ভে এই বিচিত্র আচরণ করতেন এটা আমি গোড়ায় দু-একদিন বুঝতে পারিনি। কিন্তু তার পরেই আমি মজ্জায় মজ্জায় টের পেলাম। প্রত্যেকটি চেয়ারে অসংখ্য ছারপোকা, তাদের দংশন যেমন তীক্ষ্ণ তেমনই বিষাক্ত। প্রথম দিন বিকেলের দিকে গায়ে চাকা চাকা দাগ বেরোলো, ভাবলাম, এলারজি, অফিসের পরিবেশ সহ্য হচ্ছে না।

কিন্তু গরিবের ছেলে, চাকরি ছাড়ার উপায় নেই, অফিসের সঙ্গে মানিয়ে নিতেই হবে, এ রকম মনের জোর করে দ্বিতীয় দিনেও অফিসে গেলাম। দুপুরবেলায় যখন চেয়ারে বসে পাগলের মতো ছটফট করছি, দরদী সহকর্মী

ফাইল থেকে মুখ তুলে প্রশ্ন করলো, 'কি হলো আপনার, সকালবেলা চেয়ার ছোঁড়েন নি?' আমি যখন জবাব দিলাম, 'না', তিনি শশব্যস্ত হয়ে উঠলেন, 'করেছেন কি মশায়? ছারপোকার কামড়ে মারা পড়বেন যে, যান, যান ঐ প্যাসেজে গিয়ে চেয়ারটাকে ভালো করে আছড়িয়ে নিয়ে আস্থন।'

একটু আছড়াতেই ছোট বড় অসংখ্য ছারপোকা বেতের চেয়ারের অন্ধিসন্ধি থেকে বৃষ্টির মতো ঝরতে লাগলো। এর পর থেকে আমিও অফিসে গিয়েই প্রথমেই চেয়ার আছড়াতাম।

আমাদের অফিসে কেন, প্রায় প্রত্যেক অফিসেই সেই সময় চেয়ার আছড়ানোর ঐ রীতি চালু ছিলো। চেয়ার সারানো ছিলো প্রায় নিয়মিত ঘটনা, অনেক অফিসেই বাঁধা কাঠ-মিস্ত্রি ছিলো। নতুন চেয়ারও কিনতে হতো হামেশা।

এই চেয়ার আছড়ানো ব্যাপারটা কিন্তু ছারপোকারা শেষের দিকে চমৎকার বুঝে গিয়েছিলো। তখন আর চেয়ার আছড়িয়ে ছারপোকা বিশেষ বেরোত না। ছারপোকার সংখ্যা যে কমে গিয়েছিলো তা নয়। সকালের দিকে ছারপোকার সন্তান-সন্ততি, আত্মীয়-পরিজন দল বেঁধে যে যার চেয়ারের ডেরা ছেড়ে নিকটবর্তী টেবিলের আনাচে-কানাচে আশ্রয় নিতো। তারপর চেয়ারের অধিবাসী অফিসে এসে বসলে তারাও একে একে ধীরে সুস্থে রক্ত পান করতে চেয়ারে ফিরে আসতো।

এই ফিরে আসার ব্যাপারটা আমি নিজেই আবিষ্কার করি। একদিন অফিসে গিয়ে টেবিলের নিচে তাকিয়ে কি একটা জটিল বিষয় নিয়ে এক-মনে ভাবছি, দেখলাম বহু ছারপোকা টেবিল ছেড়ে চেয়ারের দিকে এগিয়ে আসছে। এরই মধ্যে দু-একটি উৎসাহী ও তরুণ ছারপোকার চেয়ারের পায়া পর্যন্ত এগিয়ে আসার তর সইছে না, মেজে থেকে ইঞ্চিখানেক উপরে আমার চটি খোলা ডান পা ঝুলছিলো, রক্তপিপাসু কয়েকটি ছারপোকা সেখানে এসে লাফাতে লাগলো পায়ের উপর উঠবে বলে। একটি ছারপোকার উচ্চতা দশমিক শূন্য এক (·০১) ইঞ্চির বেশি নয়, (এনসাইক্লোপিডিয়া অফ ইনসেক্টস্ ১৯৪৮ সংস্করণ, চতুর্থ খণ্ড, ৪৪৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য); তার পক্ষে এক ইঞ্চি লাফানো মানে নিজের দৈর্ঘ্যের একশো গুণ উঁচুতে হাইজাম্প দেওয়া, চোখে না দেখলে আমি বিশ্বাস করতাম না, পর পর কয়েকটা ছারপোকা অবলীলাক্রমে দু-একবার চেষ্টা করেই আমার পায়ের উপর উঠে পড়লো।

তখন আমার বয়েস কম, কোনো বিষয়ে উৎসাহের ঘাটতি ছিলো না। ছারপোকার এই উচ্চলম্ফ-পরায়ণতা নিয়ে আমি অনেকের সঙ্গে, বিশেষ করে দু-একজন জীববিজ্ঞানীর সঙ্গে আলোচনার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু তাঁরা আমাকে বিশেষ পাত্তা দেন নি। শেষে আমি ছারপোকার উচ্চলম্ফের বিষয়ে চিঠি লিখে বিখ্যাত গুইনেস বুক অফ রেকর্ডসের কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। তাঁরা অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেন এবং আমাকে অনুরোধ করেন মেজে থেকে পায়ের মধ্যে শূন্যে লাফরত অবস্থায় একটি ছারপোকার

ছবি তুলে পাঠাতে। অফিসের মধ্যে অন্ধকারে টেবিলের নিচে একটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কীটের লাফের ছবি নেওয়া, আমাদের দেশে এ রকম সম্ভব হবে না বলে বুক অফ রেকর্ডসকে জানালাম।

কিন্তু তাঁরা নাকি যাচাই না করে কোনো তথ্য তাঁদের রেকর্ড বুকে ছাপেন না। তবে তাঁদের একজন প্রতিনিধি কিছুদিনের মধ্যে উত্তর প্রদেশের এক গুম্ফবিলাসীর গোঁফের দৈর্ঘ্য এবং কলকাতার শহরতলীর এক যুবকের হাতের নখের পরিমাপ করতে থাকবে, রেকর্ডস কর্তৃপক্ষ সে কথা জানিয়ে আমাকে তাঁদের সেই প্রতিনিধির সঙ্গে যথাস্থানে যথা সময়ে যোগাযোগ করতে বলেছিলেন। আমার অবশ্য সেটা করা আর হয়ে ওঠে নি।

ফলে আমারই গাফিলতিতে কলকাতার ছারপোকারা বুক অফ রেকর্ডসে যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও স্থান পেলো না। অবশ্য এখন আর সে সুযোগ নেই। কারণ সে সব ছারপোকা বহুদিন হলো বিদায় নিয়েছে।

পঞ্চাশ দশকের শেষ, ষাটের দশকের আরম্ভ। সে ছিলো কলকাতার ছারপোকাদের স্বর্ণযুগ। সেই উত্তপ্ত তাম্রবর্ণ, দ্রুত বিচরণশীল, ক্ষিপ্র ছন্দোময় জিঘাংসু ছারপোকাদের আজকাল আর দেখতেই পাওয়া যায় না। তখন অধিকাংশ লোক হাতে একটা পুরনো খবরের কাগজ নিয়ে ঘুরতেন, যেখানে গিয়ে বসতেন হাতের পুরনো কাগজটি ভালো করে পেতে তার উপরে বসতেন, এতে ছারপোকাদের দ্রুত ও আকস্মিক আক্রমণ কিছুটা প্রতিরোধ হতো।

টেবিল-চেয়ার, তোষক-বালিশ শুধু নয়, তখন সর্বত্র ছারপোকা। জামা-কাপড়ে, জুতোর মোজার মধ্যে, ট্রামে-বাসে, সিনেমা হলে, সম্ভব-অসম্ভব এমন কোনো জায়গা ছিলো না—যেখানে ছারপোকা ছিলো না। আমার মনে আছে আমি দাড়ি কামানোর ভেজা বুরুশের মধ্যে, ঘুরন্ত টেবিল ফ্যানের ব্লেডে ছারপোকা দেখেছি। এমন কি ড্রেসিং সার্কেলের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে বসে থিয়েটার দেখতে দেখতে পরমাসুন্দরী নায়িকার কানের লতির নিচে, হাজার ওয়াটের জোরালো আলোয় স্পষ্ট দেখেছি, দুটি টুকটুকে ছারপোকা ঘুরছে। শেষ বয়েসে একবার ধনরাজ অসামান্য

একটি গোল দিয়েছিলেন। খেলার শেষে ইস্টবেঙ্গলের তাঁবুতে ধনরাজের পদপ্রান্তে মন্ত্রমুগ্ধের মতো বসেছিলাম, ধনরাজ হাঁটুর উপর থেকে নিকাপ খুললেন, সেই প্রবল খেলার শেষে তখনো নিকাপের নিচে একটি চমৎকার ছারপোকা।

এই সুযোগে একজন অমর রসিকের কথাও বলি। মুক্তারামবাবু স্ট্রিটে শিবরাম চক্রবর্তীর মেসে দেখেছি, ওঁর সেই বিখ্যাত তক্তপোশের ফাঁকে, উনি বলতেন মুক্তারামের তক্তারাম, দেখেছি নতুন চাদরের উপর নতুন চাদর, তার উপরে নতুন চাদর। কোনো চাদর তুলতেন না ছারপোকা বেরিয়ে আসবে বলে, শুধু কখনো ছারপোকার অত্যাচার বেশি হলে আবার আর একটি চাদর ফেলে দিতেন সবচেয়ে উপরে, অবশ্য প্রত্যেকটি নতুন চাদর পাতবার আগে চারদিকে ফিনাইল দিয়ে চাদরের চার প্রান্ত ভালো করে চুবিয়ে নিতেন যাতে ছারপোকারা ফিনাইলের দেয়াল লঙ্ঘন করে চাদরের উপরে না উঠে আসতে পারে। এই প্রতিষেধক ব্যবস্থা কতটা কার্যকরী ছিলো, ঈশ্বর জানেন, তিনি সত্যিই এটা করতেন কিনা সেটাও বলা কঠিন কিন্তু তিনি আমাকে এই রকমই বুঝিয়েছিলেন।

দুঃখের বিষয়, এই সব ছারপোকা, যাদের অত্যাচারে গন্তব্যস্থলে পৌঁছানোর আগেই লোকেরা ট্রাম থেকে নেমে যেতো, সিনেমার ইন্টারভ্যালের সময় হল থেকে পালিয়ে যেতো, অর্ধেক মোগলাই পরোটা খেয়ে রেস্টুরেন্ট থেকে দৌড়ে উঠে যেতো, আজকাল প্রায় অন্তর্হিত হয়েছে।

কিন্তু কেন ?

এইবার আমি একটি ঐতিহাসিক তথ্য নিবেদন করবো। স্থিতধী পাঠক, একবার পিছনের দিকে ফিরে তাকান, মনে করে দেখুন একদা শ্যামবাজার থেকে কালীঘাট পর্যন্ত বিস্তৃত আসল কলকাতায় কোনো মশা ছিলো না। তার পর একদিন দলে দলে, লাখে লাখে মশার অনুপ্রবেশ ঘটলো। তারা প্রথমে মানুষকে, তারপর কুকুর বিড়াল, গরু-বাছুরকে কামড়াতে লাগলো। তারপর ফলমূল, তরিতরকারি, টিকটিকি-ইঁদুর, অবশেষে ছারপোকাকে আক্রমণ করলো। ছারপোকাকে আক্রমণ

করার কারণটা সহজ, তার গায়ে মানুষের তৈরি রক্ত পাচ্ছে। আমি স্বচক্ষে দেখেছি মশারির আনাচে-কানাচে, বালিশ-তোষকের নিচে মশা ছারপোকা ধরে শুষে খাচ্ছে। এবং শেষে এই মশার অত্যাচারেই কলকাতার ছারপোকা এখন প্রায় নির্বংশ হতে চলেছে। এর পর হয়তো একটি ছারপোকাও আর কোথাও দেখতে পাওয়া যাবে না।

চশমা
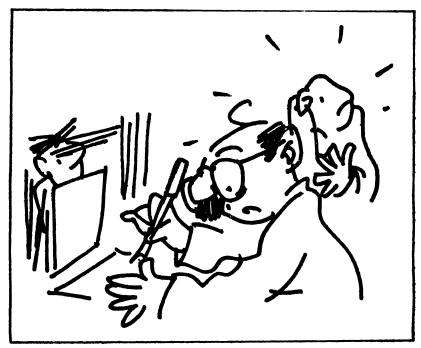
আমি কিছু বুঝবার আগেই ব্যাপারটা ঘটে গেলো। ভদ্রলোক ঠিক আমার সামনেই ছিলেন, কাউন্টারের ভেতর থেকে ব্যাঙ্কের ক্যাশিয়ারবাবু চেকটা বার করে ভদ্রলোকের হাতে দিয়ে বললেন, 'পিছনে একটা সই করুন।' ভদ্রলোক চেকটা হাতে নিয়ে ইতি-উতি তাকাতে লাগলেন, প্রথমে কাউন্টারের মধ্যে হাত গলিয়ে ক্যাশিয়ারবাবুর মুখের দিকে

এগিয়ে দিলেন। আমি চমকে গেলাম, এ কি টাকা ছোঁ দিয়ে নেবে নাকি! ভদ্রলোক কিন্তু তা কিছুই করলেন না, ক্যাশিয়ারবাবুকে হাতের নাগালের মধ্যে না পেয়ে হতভম্ব ক্যাশিয়ারবাবুকে ছেড়ে দিয়ে বাঁ পাশে এক বুড়ো ভদ্রলোকের চোখ থেকে টান মেরে চশমাটা খুলে নিলেন এবং একই রকম দ্রুততার সঙ্গে নিজের চোখে লাগিয়ে নিলেন। তারপর চোখ থেকে চশমাটা সঙ্গে সঙ্গে খুলে ফেলে, 'না, একদম ঝাপসা দেখাচ্ছে' বলে বিস্মিত বৃদ্ধটিকে চশমাটা ফেরত দিয়ে দিলেন।

এবং পরমুহূর্তেই ব্যাপারটা ঘটলো। চশমা-সন্ধানী ভদ্রলোক অমীমাংসিত ফুটবল ফাইন্যালের টাই-ব্রেকারে চ্যাম্পিয়ন টিমের গোল-কিপারের চেয়ে ক্ষিপ্রতায় আমার নাকের উপর থেকে চশমাটি ছিনিয়ে নিলেন। নিয়ে নিজের চোখে দিয়ে ঘুরে ঘুরে তাকাতে লাগলেন। তাঁর মুখ দেখে মনে হলো আমার চশমাটি তাঁর অপছন্দ হয়নি।

এদিকে কাউন্টারের ওপারে ক্যাশিয়ারবাবু অধৈর্য হয়ে উঠেছেন, 'কই দাদা, চেকটা সই করে তাড়াতাড়ি দিন।' ভদ্রলোক মাথা নিচু করে টাকা গুনতে গুনতে তাগাদা দিয়ে যাচ্ছেন। যে ভদ্রলোক আমার চশমাটা নিয়েছিলেন তাঁর কিন্তু অত তাড়া নেই, তিনি ধীরে-সুস্থে আমার চশমাটা চোখে দিয়ে বেশ ঠাণ্ডা মাথায় চেকের পিছনে সই করলেন, সেই সঙ্গে চেকের সামনের দিকটাও আরেকবার ভালো করে পড়ে দেখে নিলেন এবং আগে করা সই আর এখনকার সই তিনবার মেলালেন। তারপর চেকটি ফেরত দিয়ে টাকা নিয়ে তিনবার গুনলেন, দুটো ময়লা নোট পালটালেন। অবশেষে চলে গেলেন।

এবার বাঁ দিকের বৃদ্ধ ভদ্রলোক, তারপর আমার পালা। আমার পালা আসতে কাউন্টার থেকে চেকটা নিয়ে সই করতে গিয়ে কেমন যেন মনে হলো একটা শূন্যতা, কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা লাগছে। তখনই মনে পড়লো আমার চোখের চশমাটা নেই, সামনের ভদ্রলোক সেটা নিয়ে গেছেন।

তাড়াতাড়ি ছুটে বাইরে বেরোলে ভদ্রলোককে এখনো বোধহয় ধরা যায় কিন্তু ভদ্রলোকের চেহারাটা খেয়াল করিনি। এদিকে হাতে সদ্য পাশ

করা চেকটা ধরা রয়েছে, সেটা সই করে টাকা নিয়ে বেরোতে গেলে খুবই দেরি হয়ে যাবে।

চশমার শোকে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে কিছুক্ষণ স্তম্ভিত থাকার পর ঠিক করলাম হাতের লক্ষ্মী ছাড়া উচিত হবে না। সুতরাং চশমা ছাড়াই চেকের পিছন দিকে আন্দাজে একটা সই করে টাকাটা তুলে নিলাম। তারপর যথাসাধ্য তাড়াতাড়ি রাস্তায় নেমে চশমা অপহরণকারীর অনুসন্ধানে রত হলাম।

বলা বাহুল্য, সেই চশমা আর ফেরত পাইনি। এর আগে একই প্রক্রিয়ায় আমার একাধিক কলম হারিয়েছে। আজকাল এরকম অবস্থায় কলমের মুখটা হাতে রেখে বাকি নিচের দিকের আধেকটা ধার দিই। এতে অবশ্য কেউ কেউ ভারি অপমান বোধ করেন। কিন্তু আমার কলমটা তবু বাঁচে। এরপর থেকে যদি এই ভাবে চশমা ধার নেওয়ার রীতি বহুল প্রচলিত হয়, তাহলে কি করা যাবে? চশমার ডাঁটিটা খুলে যদি দেওয়া যেতো, ভালো হতো, কিন্তু সেটা নিশ্চয় সম্ভব নয়।

সম্পাদক এবং কম্পোজিটর মহোদয় ছাড়া আর যাঁরা এই লেখাটি এখন পড়ছেন, তাঁরা কেউ কি ধরতে পারছেন যে এই লেখাটি আমি চশমা ছাড়া লিখেছি। চশমা ছাড়া লেখা খুব কঠিন। আমার প্লাস পাওয়ার, হয় একেবারে নাকের কাছে লেখার কাগজ ধরে অথবা একহাত দূরে রেখে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে নিয়ে লিখতে হয়। প্রতিটি বাক্য রচনার পর অন্তত এক মিনিট বিশ্রাম নেওয়া প্রয়োজন।

এভাবে বেশিদিন চালানো যাবে না। আমার দু-একজন বন্ধুর দেখেছি একাধিক চশমা আছে। কোনো একটা (অর্থাৎ একজোড়া, জুতোর মতো চশমাকেও জোড়া হিসেবে ধরাই নাকি নিয়ম) এদিক ওদিক হলে অন্যটায় কাজ চলে যায়। আমার তা নেই, আমাকে আজ না হোক কালকেই নতুন চশমা নিতে হবে। শুধু নতুন চশমা নেওয়া নয়, নতুন করে চোখও দেখাতে হবে, আগেরটা অনেকদিন হয়ে গিয়েছিলো, শেষের দিকে বিশেষ ভালো দেখতাম না।

নতুন চশমা নেওয়ার ব্যাপারে দুটো বড় ধাপ রয়েছে। এক হলো চোখ দেখানো আর দুই হলো চশমা নেওয়া।

চোখ দেখানো ব্যাপারটা সোজা নয়। আমাদের অল্প বয়েসে ছিলো চোখ দেখাতে গেলেই চোখের ডাক্তার কিছু বুঝবার আগেই ড্রপার দিয়ে দুই চোখে কি একটা বিষাক্ত তরল দ্রব্য এক ফোঁটা করে ফেলে দিতেন। ব্যাস, এক সপ্তাহের মতো সাময়িক অন্ধত্ব। এই ওষুধ কি প্রয়োজনে লাগতো আমার সঠিক ধারণা নেই। আমার বিশ্বাস অন্ধ হলে কি রকম লাগবে তারই একটু শিক্ষা চক্ষুচিকিৎসকেরা এই ভাবে প্রাথমিক পর্যায়ে রোগীদের দিয়ে দিতেন।

অবশ্য অন্য কারণও থাকতে পারে। সকল চোখের ডাক্তার এই রকম শিক্ষা দিতেন তা নাও হতে পারে। প্রথম বারে ডাক্তারবাবু আমার ওপর খুবই রেগে গিয়েছিলেন, একটা সামান্য সত্যভাষণের জন্যে। একটা গল্প পড়েছিলাম কয়েকদিন আগে, সেই গল্প মাফিক ডাক্তারবাবুর প্রশ্নের সরাসরি উত্তর দিয়েছিলাম। যেমন আর দশ জনকে করেন, সেই রকম তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আমি খালি চোখে কতটা দেখতে পারি। আমি বলে ফেললাম, 'সে লাখ লাখ মাইল হবে।' ডাক্তারবাবু চমকিত হলেন কিন্তু দমলেন না, বললেন, 'মানে?' আমি নিরীহভাবে বললাম, 'মানে আর কি? দিনের বেলায় আকাশে সূর্য, রাতের বেলায় চাঁদ, তারা, লাখ লাখ মাইল দূরে এসব, জানেন তো, তাও স্পষ্ট দেখতে পাই।' ডাক্তারবাবু এবার ঢোঁক গিললেন, তারপর দু-একটা অবান্তর প্রশ্ন করে আমার চোখে সেই বিষাক্ত তরল দ্রব্য ঢেলে দৃষ্টিশক্তি আচ্ছন্ন করে দিলেন। দু' চোখ সঙ্গে সঙ্গে লাল হয়ে গেলো, যা কিছু দেখি সবই অস্পষ্ট, ঝাপসা, প্রায় পাঁচ-সাত দিন।

আজকালের মধ্যেই আবার চোখের ডাক্তারের সম্মুখীন হতে হবে, সুতরাং এ সম্পর্কে বেশি কিছু না লেখাই ভালো। তার চেয়ে চশমার কথায় আসি।

চশমা অতি আশ্চর্য জিনিস। বহুলোকই চশমা পরেন অলঙ্কার হিসেবে।

হাজার হাজার জিরো পাওয়ারের চশমা পরিহিত পুরুষ ও রমণী রাস্তা-ঘাটে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাদের ধারণা এতে তাদের খুব সুন্দর দেখাচ্ছে; বিদ্বান বা বুদ্ধিমান হওয়ার এটাই সোজা পথ অনেকের কাছে।

অবশ্য নানা রকম চশমা লোকভেদে নানা রকম চেহারা সৃষ্টি করে। যে চশমা পরলে আমাকে জোচ্চোরের মতো দেখায় সেই চশমাতেই আপনাকে পণ্ডিত-প্রধানের মতো দেখাতে পারে। চশমা, মানানসই চশমা কেনা অতিশয় কঠিন ব্যাপার।

তাছাড়া চশমার দাম, তার কোনো মাথামুণ্ডু নেই। খদ্দেরের মুখ দেখে চশমার দোকানদার নাকি দাম ধার্য করেন। চশমাটি আপনার পছন্দ হলো, দোকানদার বললেন, 'পঞ্চাশ টাকা,' বলে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আপনাকে দেখলেন, বুঝতে পারলেন আপনি চমকে যাননি, তখন তিনি যোগ করলেন, 'একেকটা কাচের জন্যে'; তার মানে এবার দাম দাঁড়াল একশো টাকা। এখানো আপনি অবিচল, এবার দোকানদার একটু হেসে বললেন, 'আর ঐ ফ্রেম, আপনার জন্যে কনসেসন প্রাইস সত্তর টাকা।'

এর পরে? এর পরেও আছে, 'হেঁ হেঁ, এছাড়া আমাদের মজুরি, সে আপনি যা ভালো বোঝেন দেবেন।'

কেশচর্চা

মহাত্মা গান্ধীর যদি রবীন্দ্রনাথের মতো দাড়ি থাকতো আর রবীন্দ্রনাথের যদি থাকতো মহাত্মার মতো টাক, তা হলে কি তাঁদের প্রতি আমাদের ভক্তিশ্রদ্ধা কিছু কম বেশি হতো। এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কিন্তু খুব সোজা নয়। কেশ-গুম্ফ-শ্মশ্রু মিলিয়ে একটা পুরোপুরি মানুষের ছবি আমাদের মনের মধ্যে গড়ে ওঠে। তাই কেউ যদি চুল ছাঁটে তাহলেও তাকে একটু নতুন-নতুন আলাদা-আলাদা মনে হয়। যার দাড়ি ছিলো সে হয়তো কামিয়ে ফেলেছে, যার গোঁফ নেই সে হয়তো গোঁফ রাখা শুরু করেছে, প্রথম-প্রথম দেখলে বেশ খটকা লাগে—কি যেন ছিলো না, কি যেন নেই,
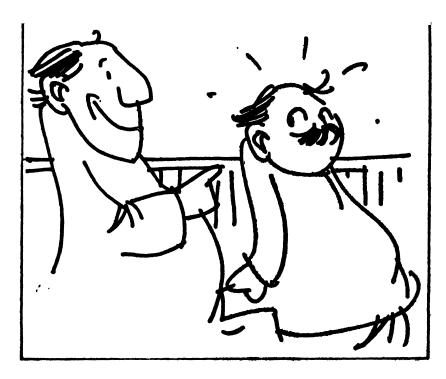
কি যেন আছে—এই রকম একটা ধাঁধা তৈরি হয়।

প্রথম গোঁফের কথা বলি। একটা পুরনো হেঁয়ালি ছিলো, মাসীর যদি গোঁফ বেরোয় তাহলে কি হবে? শিবরাম চক্রবর্তী এর একটা খুব সহজ সমাধান দিয়েছিলেন—মাসীর গোঁফ বেরোলে মাসী মামা হয়ে যাবে। এ বিষয়ে একটি চমৎকার বিলিতি গল্প আছে। এক ভদ্রলোক ট্রেনে যাচ্ছেন, হঠাৎ দেখলেন সামনের বেঞ্চের ভদ্রলোক অত্যন্ত মনোযোগ ও অভিনিবেশ সহকারে তাঁকে পর্যবেক্ষণ করছেন। বার বার ঘুরে ঘুরে তাঁর মুখের দিকে গভীর কৌতূহলে তাকাচ্ছেন। প্রথম ভদ্রলোক অবশেষে বিরক্ত হয়ে দ্বিতীয় ভদ্রলোককে বললেন, 'ব্যাপারখানা কি, বলুন তো মশায়?' দ্বিতীয় ভদ্রলোক একটু লজ্জিত হয়ে মুচকি হেসে বললেন, 'আপনাকে দেখে আমার স্ত্রীর কথা মনে পড়ছে!' প্রথম ভদ্রলোক রীতিমতো বিপর্যস্ত, 'আমাকে দেখে আপনার স্ত্রীর কথা মনে পড়ছে?' দ্বিতীয় ভদ্রলোক এবার

আমতা আমতা করে জবাব দিলেন, 'আপনি ধরে একেবারে আমার স্ত্রীর মতো দেখতে, শুধু ঐ গোঁফটুকু ছাড়া।' প্রথম ভদ্রলোক এবার খুবই অবাক হলেন, নিজের মসৃণ ঠোঁটের উপর একটু হাত বুলিয়ে বললেন,'কিন্তু আমার তো গোঁফ নেই।' দ্বিতীয় ভদ্রলোক এতক্ষণে পরিষ্কার করে বোঝালেন, 'না, না, আপনার গোঁফের কথা নয়, আমার স্ত্রীর গোঁফের কথা বলছি। আপনার ঐ নাকের নিচে একটা গোঁফ লাগালেই একদম আমার পরিবারের মুখটি হয়ে যাবে।'

এক সময় ভীষণদর্শন অথচ স্নেহপ্রবণ চরিত্রের ছবি আঁকতে গিয়ে গল্প লেখকেরা এই রকম একটা বর্ণনা দিতেন—বিরাট কাইজারি গোঁফওয়ালা একজন লোক বড় জামবাটিতে চুমুক দিয়ে ঘন দুধ খাচ্ছে, লোকটির গোঁফে দুধের সর লেগে রয়েছে। তার কিছুকাল পরে রহস্য উপন্যাসে ফ্যাসনদুরস্ত নায়কের বর্ণনা করা হতো বাটারফ্লাই গোঁফ আর ব্যাকব্রাস চুলে। আর বখে যাওয়া ছেলের মাথায় ছিলো দশ আনা-ছয় আনা ছাঁট। এই দশ-আনা ছয়-আনা চুল ছাঁটের ব্যাপারটা আমি ভালোভাবে বোঝাতে পারবো না, একে যে ঠিক কি রকম চুলকাটা বোঝায় তা আমার স্পষ্ট ধারণা নেই, তবে আমাদের ছোটবেলায় বহু পরিবারের কর্তাকেই খুব গর্ব করে বলতে শুনেছি, 'আমাদের বাড়ির ছেলেরা অত অসভ্য নয়, আমাদের বাড়ির কোনো ছেলের সাহস হবে না দশ আনা-ছয় আনা ছাঁট দিয়ে আসতে।'

এর কিছুকাল পরে এসেছিলেন পুরোপুরি ষোলো আনা ছাঁট। ইয়ুল ব্রায়নার, হলিউড সিনেমার বিখ্যাত ও জনপ্রিয় নায়ক, একটা সিনেমা, সম্ভবত 'দি কিং অ্যাণ্ড আই' বইতে মাথা ন্যাড়া করে অভিনয় করলেন। কলকাতার ট্রামে-বাসেও বেশ কিছু মুণ্ডিত মস্তক লোক দেখা গেলো, এদের সকলেরই যে গুরুদশা হয়েছে তা নয়। তবে যাই হোক, ন্যাড়া হওয়া শেষ পর্যন্ত খুব জনপ্রিয় হয়নি এবং টেকেও নি।

অবশেষে মুণ্ডিত মস্তকের বিপরীত মেরু থেকে এলো হিপি সভ্যতা। ক্ষৌরকার মহলে হাহাকার পড়ে গেলো। হাজার হাজার লোক চুল কাটা একদম ছেড়ে দিলো। ক্ষৌরকারেরা প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে লম্বা চুল কাটার

রেট বাড়িয়ে দিলেন। সেলুনে সেলুনে নোটিশ লাগানো হলো—হেয়ার কাটিং টু রুপিস, হিপি হেয়ার কাটিং ফাইভ রুপিস। ব্যবস্থাটি সম্পূর্ণই প্রতিশোধমূলক, কারণ লম্বা চুল কাটার আর ছোটো চুল কাটার পরিশ্রম প্রায় সমানই।

পুরুষ মানুষের এলোমেলো অবিন্যস্ত দীর্ঘ চুল শুধু ক্ষৌরকারদের নয়, অনেকেরই দৃষ্টিশূল। যখন হিপি চুলের ব্যাপারটা খুব ছড়াছড়ি হয়েছিলো, মাঝে মধ্যেই খবর বেরোতো কোথায় কোন্ রাগী দারোগা তাঁর এলাকার সমস্ত হিপি কেশওয়ালাদের জোর করে ধরে নাপিত ডেকে শায়েস্তা করে দিয়েছেন।

হিপি কেশ নিয়ে গল্পের শেষ নেই। অধিকাংশ গল্পেরই ব্যঞ্জনা একটাই, পিছন দিক থেকে বোঝা যাচ্ছে না ছেলে না মেয়ে। তবে আমি কিছুদিন আগে এক সেলুনে বসে একটা চমৎকার গল্প শুনেছি। সেই সেলুনে এসেছিলেন চুল কাটাতে হিপি জীবনে বীতশ্রদ্ধ এক যুবক। তিনি এখন তাঁর কাঁধ পর্যন্ত আলুলায়িত দীর্ঘ বাবরি ফেলে দিয়ে সংসারীদের মতো ছোট করে চুল ছাঁটতে এসেছেন। ক্ষৌরকার কিছুক্ষণ চুল কাটার পর জিজ্ঞাসা করলেন, 'স্যার কি আগে হোম গার্ড ছিলেন?' বিস্মিত যুবকটি বললেন, 'হ্যাঁ, ঠিক তাই, কি করে বুঝলেন?' ক্ষৌরকার মহোদয় অত্যন্ত বুদ্ধিদীপ্ত একটি হাসির সঙ্গে জবাব দিলেন, 'এ আর কঠিন কি স্যার, আপনার চুলের নিচে এইমাত্র একটা হোমগার্ডের টুপি পেলাম', এই বলে যুবকটিকে তাঁর চুলের নিচে সদ্য পাওয়া পেতলের ব্যাজ লাগানো খাকি গোল টুপিটা প্রত্যর্পণ করলেন।

চুল কাটার সেলুন নিয়ে অনেক মজার ছবি এঁকেছিলেন প্রমথ সমাদ্দার। প্রমথবাবুকে কেউ কি মনে রেখেছেন? আজ থেকে পঁচিশ-তিরিশ বছর এবং তারো আগে কার্টুন আঁকতেন প্রমথ সমাদ্দার, তাঁর হাতের আঁকা এবং রসবোধ দুই-ই ছিলো চমৎকার।

প্রমথ সমাদ্দারের সেলুনের একটা কার্টুন আজ তিরিশ বছর পরেও আমার মনে আছে। সেলুনে এক ভদ্রলোক চুল কাটছেন। ঠিক চেয়ারের

নিচেই একটি হিংস্র-দর্শন কুকুর খুব মনোযোগ দিয়ে চুলকাটা দেখছে। খদ্দের ক্ষৌরকারকে বললেন, 'আপনার কুকুরটি দেখছি খুব শিক্ষিত, কি রকম স্থির হয়ে বসে চুলকাটা দেখছে।' ক্ষৌরকার চুল কাটতে কাটতেই জিব কেটে বললেন, 'না স্যার, শিক্ষিতটিক্ষিত কিছু নয়, ও বড়ো লোভী স্যার।' 'লোভী?' খদ্দের প্রশ্ন করতে বাধ্য হলেন। ক্ষৌরকার বললেন, 'স্যার, এই আমি অনেক সময়ে চুল কাটতে কাটতে খদ্দেরদের জুলফির মাংস, কানের লতি এই সব হাত ফসকে কেটে ফেলি, আমার কুকুরটা সেই মাংসের লোভে বসে আছে স্যার।' (কার্টুনে নিশ্চয় এত কথা ছিলো না, বলা বাহুল্য অতিরঞ্জনটুকু আমার নিজের।)

চুল কাটার ব্যাপার নিয়ে এই সব গল্পে যদি এখনো কারো ধৈর্যচ্যুতি না হয়ে থাকে তবে সেলুন নিয়ে আমি আরো একটা গল্প বলবো।

কাজে-কর্মে আমাকে বারেবারেই মফঃস্বল যেতে হয়। সেই সময় চুল যদি একটু বড় থাকে আমি মফঃস্বলেরই কোনো সেলুনে ঢুকে চুল কেটে নিই। ব্যাপারটা আমার বেশ পছন্দসই, মফঃস্বলে সব কাজ সারার পরও একা একা হাতে অনেক সময় থেকে যায়। তা ছাড়া আলাদা পরিবেশ, নতুন ক্ষৌরকার, অন্যরকম লোকজন। সে যা হোক, প্রায় সর্বত্রই সাধারণ সাদামাটা সেলুনে চুল কাটার হার দু' টাকার থেকে তিন টাকার মধ্যে। কলকাতায় আমার পাড়ায় যে সেলুন রয়েছে সেখানেও অবশ্য কখনো কখনো চুল কাটি প্রয়োজন বোধে, তবে সেখানে রেট একটু বেশি—চার টাকা।

আগের মাসে বর্ধমানে আড়াই টাকা দিয়ে চুল কেটেছি। এ মাসে নানা ঝামেলায় একবারও মফঃস্বল যাওয়া হয়ে উঠলো না, শেষে মাসের প্রান্তে এসে পাড়ার দোকানেই চুল কাটতে গেলাম। চুল কেটে চার টাকা দিয়ে চলে আসছি, ক্ষৌরকার মালিক দরজার কাছে টেবিলে বসে ছিলেন, হাত বাড়িয়ে বললেন, 'আরেকটা টাকা দেবেন।' বলে সাইন বোর্ডের নতুন আঁকা রঙীন লিপির প্রতি অঙুলি নির্দেশ করে দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। সেখানে দেখলাম হলুদের উপরে কালো কালি দিয়ে স্পষ্ট করে লেখা

রয়েছে, '১লা ডিসেম্বর হইতে চুল কাটার বর্ধিত মূল্য পাঁচ টাকা।'

স্নুতরাং পাঁচ টাকাই দিতে হলো। তবু আমি বললাম, 'আপনাদের রেট একটু বেশি।' ক্ষৌরকার মালিক বললেন, 'সারা শহরেই ভালো সেলুনে এখন এই রেট।' আমি বললাম, 'কেন, গত মাসেই বর্ধমানে চমৎকার চুল কাটালাম, মাত্র আড়াই টাকা নিলো।' অম্লানবদনে মালিক বললেন, 'বড়দা, বর্ধমানের যাতায়াত খরচটাও সেই সঙ্গে ধরবেন।'

দাম্পত্যজীবন
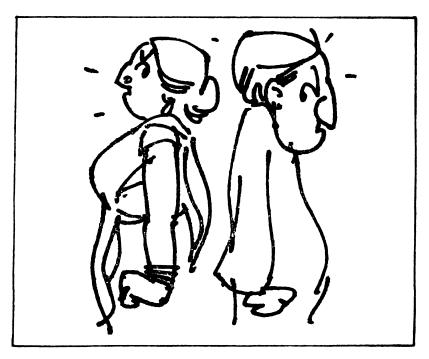
কোথায় যেন গল্পটা শুনেছিলাম।

একটি ছোট মেয়ে তার মাকে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে বসেছিলো, 'আচ্ছা মা, তোমার কার সঙ্গে বিয়ে হয়েছিলো?' মেয়েটির অবশ্য বিশেষ কোনো

দোষ ছিলো না, তার মা তখন তাঁর বান্ধবীদের সঙ্গে বসে সভ্য সংঘটিত কিঞ্চিৎ উত্তেজনাপ্রদ একটি বিবাহ সম্পর্কে সরস আলোচনা করছিলেন। কন্যার এই আকস্মিক প্রশ্নে কিঞ্চিৎ বিরক্ত হয়ে বললেন, 'আমার আবার কার সঙ্গে বিয়ে হয়েছিলো ? তোর বাবার সঙ্গে হয়েছিলো আমার বিয়ে।' শুনে ছোট মেয়েটি অবাক হয়ে গালে হাত দিয়ে তার চোখ দুটো গোলগোল করে বলেছিলো, 'ছিঃ ছিঃ, এতো জানাজানির মধ্যে !'

এবারের কাণ্ডজ্ঞানের বিষয়বস্তু যেমন জটিল, তেমনি ভয়াবহ। আমার মতো স্ত্রৈণ এবং দুর্বল চরিত্রের লোকের পক্ষে কি করে দাম্পত্য জীবনের মতো বিপজ্জনক বিষয়ে কোনো কিছু লেখার সাহস সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে সে বিষয়ে কোনো প্রকাশ্য বা নিভৃত আলোচনায় যেতে আমি রাজী নই।

স্বামী ও স্ত্রী এই দুজনের মধ্যে সংসারে, মানে বাড়ির মধ্যে, কার গুরুত্ব বেশি ? এই প্রসঙ্গ নিয়ে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা লিখে ফেলা যায়, দিনের পর দিন আলোচনা করা যায়। তাতেও সমস্যার কোনো সমাধান হবে না। সবই শেষ পর্যন্ত নির্ভর করছে স্বামী এবং / কিংবা স্ত্রীর মনোভাবের উপরে। একজন দাম্ভিক ও আত্মগর্বী স্বামী আমাকে বেশ মেজাজ দেখিয়ে বলেছিলেন যে, 'আমাদের বাড়িতে সমস্ত বড় বড় ব্যাপারগুলিতে সমস্ত সিদ্ধান্তই আমি নিয়ে থাকি। যেমন ধরুন ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ বর্জন চুক্তি করা উচিত কি না, বাংলাদেশকে ফারাক্কা থেকে কত কিউসেক জল দেওয়া যায়, এমন কি চৌরঙ্গীতে উড়ালপুল করা কত যুক্তিসঙ্গত—এই রকম সমস্ত জটিল এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সমস্ত ভার ও দায় আমার বাড়িতে আমারই উপরে। কিন্তু মনে করুন ছেলের জন্যে প্রাইভেট টিউটর রাখা হবে কি না, প্রতিবেশীর মেয়ের বিয়েতে শাড়ি দেবো না কবিতার বই দেবো, শনিবার দিন দক্ষিণেশ্বরে যাবো কি না, এই সমস্ত ছোটখাট ব্যাপারে আমার স্ত্রীই যা কিছু ঠিক করেন। এ সব ব্যাপারে আমি কখনোই মাথা গলাতে চাই না।'

চমৎকার বন্দোবস্ত।

ভদ্রলোকের কথা শুনে তাঁর উপরে একটু মায়াই হয়েছিলো আমার। কিন্তু মায়া-মমতার কথা এখন থাক, দাম্পত্য-জীবনে মায়া-মমতার অবকাশই বা কোথায়? তার চেয়ে দু-একটা নিষ্ঠুর গল্প বলি। গল্পগুলি সবই শোনা, এগুলির সম্পর্কে কোনো রকম মৌলিকতার দাবী আমি করছি না।

প্রথম গল্পটি বিদেশী। জন সাহেব মারা গিয়েছেন। তাঁর মৃত্যুর কিছুদিন পরে তাঁর শোকাচ্ছন্না মেমসাহেব একটি প্লানচেটে বসেছেন এবং কিঞ্চিৎ সাধ্যসাধনার পরে জনের আত্মা সেই প্ল্যানচেটে এসেছে। এর পরের কথোপকথন :—

মেমসাহেব : কে জন, জন এসেছো?

জনের আত্মা : হুঁ, হুঁ।

মেমসাহেব : জন, তুমি সুখে আছো?

জনের আত্মা : আমি যথেষ্ট সুখে ও আনন্দে আছি।

মেমসাহেব : জন, পৃথিবীতে তুমি যখন আমার কাছে ছিলে তার চেয়েও ভালো আছো?

জনের আত্মা : ঢের ঢের ভালো! অনেক, অনেক বেশি আনন্দে আছি।

মেমসাহেব : তাহলে স্বর্গ সত্যি এতো ভালো, এতো আনন্দের?

জনের আত্মা : স্বর্গ? হা! হা! কে বললো আমি স্বর্গে আছি? আমি তো এসেছি নরকে।

দাম্পত্য জীবনের সঙ্গে তুলনায় নরকবাসও অনেক ভালো, এই কাহিনীর বোধহয় এটাই সারমর্ম। তবু অসুখী বিবাহিত জীবন সম্পর্কে যত তিক্ত কথাই বলা যাক, একথা স্বীকার করতে হবে যে জীবনে বহু লোকই উন্নতি করেছে স্ত্রীর ভয়ে ও অত্যাচারে। যে কোনো বড় অফিসে গেলেই দেখা যাবে ছুটির পরেও আলো জ্বেলে অনেক রাত পর্যন্ত বসে বসে কিছু লোক আপন মনে কাজ করে যাচ্ছে। এরা সবাই যে কোনো ওভার টাইম পায় তা নয়, এরা কাজ করে প্রাণের দায়ে। এদের বাড়ি ফেরার উপায় নেই। এরা বাড়ি ফেরে গভীর নিশুতি রাতে একেবারে পা টিপে-টিপে। আলো জ্বললে বা সামান্য শব্দ হলে স্ত্রীর নিদ্রায় ব্যাঘাত হবে তাই

অন্ধকারে নিঃসাড়ে এরা খাওয়া-দাওয়া সেরে শুয়ে পড়ে। আর শেষ রাত্রিতে কাক পাখিটি উঠবার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে। অনেকের আবার অল সেকশন ট্রামের মান্থলি আছে, ছুটির দিনে যদি কোনো ফিকিরেও অফিসে ঢুকতে না পারে তা হলে যত্র তত্র টো-টো করে ঘুরে বেড়ায়।

কিন্তু সব সময় যে স্ত্রী রত্নটিকে এভাবে এড়িয়ে চলতে পারে তা নয়। কখনো-সখনো বাড়ি ঢোকা এবং বাড়ি ছাড়ার সময় হঠাৎ স্ত্রীর মুখোমুখি পড়ে এরা থরথর করে কাঁপতে থাকে। তাতে অবশ্য রেহাই হয় না, গভীর রাতের অথবা শান্ত উষার আকাশ-বাতাস রণরঙ্গিনীর কর্কশ কোলাহলে সহসা মুখর হয়ে ওঠে, পাড়া-প্রতিবেশী তটস্থ হয়ে যায়।

এই রকম একটি পরিবার অনেকদিন আগে আমাদের পাশে থাকতেন। দুজনেই ব্যক্তিগতভাবে আলাদা আলাদা বেশ ভালো, চমৎকার মেজাজের মানুষ কিন্তু দুজনা মুখোমুখি সাংঘাতিক। ভদ্রলোকের কিন্তু খুব দোষ ছিলো না। একেকদিন সন্ধ্যায় বা রাতে বেশ চেঁচামেচি এবং তারপর ছুটোপাটি বা মারামারি হতো। তারপর ভদ্রমহিলা নাকি সুরে ইনিয়ে-বিনিয়ে কাঁদতেন। পাড়ার সকলে ধরে নিয়েছিলেন, ভদ্রলোক ভদ্র-মহিলাকে মারেন। কিন্তু আমরা ছিলাম নিকটতম প্রতিবেশী, প্রকৃত তথ্য শুধু আমরাই জানতাম। ভদ্রলোক কোনোদিন স্ত্রীর গায়ে হাত তোলেননি, মারতেন ভদ্রমহিলাই। তবে যেমন হয়, ভদ্রলোকের শরীরে খুব মাংস-মজ্জা ছিলো না, ছিলো শক্ত খটখটে হাড় আর ভদ্রমহিলার হাত ছিলো খুব নরম, ঐ শক্ত হাড়ে কিল চড় যাই মারুন, ভদ্রমহিলার হাতে খুব লাগতো, কালশিরা পড়ে যেতো, তখন ইনিয়ে-বিনিয়ে কাঁদতেন। একবার যন্ত্রণা এতো বেশি হয়েছিলো যে অনেক রাতে আমাদের বাড়িতে আয়োডেক্স ধার করতে এসেছিলেন। তখনই আমরা ব্যাপারটা সম্যক উপলব্ধি করি। অবশ্য এর পরে ভদ্রমহিলা রণকৌশল পালটিয়ে দিলেন, তিনি হাতপাখা ব্যবহার করতে শুরু করলেন। হাতপাখা বড় ভঙ্গুর দ্রব্য, প্রত্যেক মাসেই নতুন হাতপাখা লাগতো, আর সবচেয়ে দুঃখের কথা—এই হাতপাখা ভদ্রলোকই নিজে কিনে আনতেন বাজার থেকে।

তবু বলি, সব সময় ভদ্রমহিলাদের দোষ দেওয়া যায় না। আমি নিজে একটি ঘটনা জানি যেখানে আপাতদৃষ্টিতে যা মনে হয়েছিল আসলে তা নয়।

গজেনবাবু যতদিন চাকরি করতেন, আমার পূর্ব বর্ণনা মতো বাসায় থাকতেনই না, যতক্ষণ পারতেন অফিসে কাটাতেন। এখন রিটায়ার করে সারাদিন, মায় রাত দশটা-সাড়ে দশটা পর্যন্ত পার্কে গিয়ে বসে থাকেন। কেউ জিজ্ঞাসা করলে বলেন, 'তোমাদের বৌদির জ্বালায় বাসায় টিকতে পারি না। কি করবো, পার্কে এসে বসে থাকি।'

সেদিন সন্ধ্যাবেলা প্রচণ্ড জলঝড়, আর রাস্তায় আটকে গিয়েছিলাম, দেখি বাস ছাউনিতে গজেনবাবু দাঁড়িয়ে রয়েছেন। আমি বললাম, 'বাড়ি যান, আরো বৃষ্টি আসবে মনে হচ্ছে।' গজেনবাবু বললেন, 'বাড়ি গেলেই জ্বালা, তোমার বৌদি বড় অত্যাচার করেন।' আমি বললাম, 'কি অত্যাচার করেন?' তিনি বললেন, 'খালি টাকা চায়?' আমি বললাম, 'কত টাকা?' গজেনবাবু বললেন, 'তার কি ঠিক আছে, কখনো দশ, কখনো বিশ, কখনো পঞ্চাশ।' আমি বললাম, 'বৌদি এত টাকা দিয়ে কি করেন?' গজেনবাবু অতি নির্লিপ্তভাবে জবাব দিলেন, 'তা আমি কি করে বলবো? আমি তাকে জীবনে এক পয়সাও দিইনি।'

বিলিতি ভোজনালয়

অনেকদিন আগে ধর্মতলায় একটা রেস্টুরেণ্টে খেতে গিয়েছিলাম। যে বেয়ারাটি জলের গেলাস দিয়ে মেনু হাতে অর্ডার নিতে এলো, দেখি তার হাতে চাকা-চাকা লালচে মতন ঘায়ের চিহ্ন। কেমন যেন সংশয় হলো, লোকটিকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'তোমার কি একজিমা আছে?' প্রশ্নটি শুনে সে কেমন যেন চিন্তিত হলো, 'কি বললেন স্যার?' আমি বললাম, 'একজিমা।' বেয়ারাটি এবার ঘাড় নেড়ে জবাব দিলো, 'না স্যার, একজিমা হবে না, কষা মাংস হবে, কবিরাজি কাটলেট হবে, ডেভিল, চপ হবে,'—বলে মেনুটি আমার হাতে বাড়িয়ে দিলো।

প্রথমেই স্বীকার করে নিই, এই যে আমি-আমি করে লিখলাম কিন্তু এ গল্প আমার বানানো নয়, এটা একটা বিলিতি হোটেলি গল্প, হয়তো অনেকেই জানেন; আমি শুধু যাঁরা জানেন না তাঁদের জন্যে আমার কায়দায় লিখলাম। হোটেল বা ভোজনালয় সম্পর্কে বিলেতে হাজার রকম গল্প, কারণ সেখানে নিয়মিত বাইরে খাওয়া প্রায় প্রত্যেকেরই পক্ষে অপরিহার্য এবং সেই সূত্রেই এত গল্প। আমার নিজের কথায় আসার আগে আর দুটো বিলিতি গল্প বলে ফেলি।

প্রথম গল্পটি অবশ্য কলকাতার যে কোনো রেস্টুরেণ্ট সম্পর্কে চলতে পারে। কোথাও কোথাও গল্পটা অন্য আকারে এক-আধবার শোনাও গেছে।

এক ভদ্রলোক এক দোকানে গিয়ে চা না কফি কিসের অর্ডার দিয়েছেন। সেও অনেকক্ষণ আগে। ভদ্রলোক তিতিবিরক্ত হয়ে অপেক্ষা

করছেন, অবশেষে বেয়ারা এক পেয়ালা আধ-ঠাণ্ডা বিস্বাদ পানীয় এনে উপস্থিত করলো। ভদ্রলোক এক চুমুক মুখে দিয়েই তেতো মুখে বেয়ারাকে ডাকলেন, 'এটা কি দিয়েছ? চা না কফি, কিছুই তো বোঝা যাচ্ছে না। খেতে তো দেখছি কেরোসিনের মতো লাগছে।' বেয়ারাটি প্রসন্নমুখে জবাব দিলো, 'কেরোসিনের মতো লাগছে, তা হলে এটা নিশ্চয়ই চা। আমাদের কফি খেলে কেরোসিনের গন্ধ পেতেন না, তার গন্ধ ফিনাইলের মতো।'

দ্বিতীয় গল্পটি পুরোপুরি সাহেবি গল্প। সাহেব চর্ব্যচোষ্য লাঞ্চ সেরে উঠে পরিচারিকাকে বললেন বিল নিয়ে আসতে। বিল আসার পর সমস্ত পকেট হাতড়িয়ে সাহেব কাঁচুমাচু মুখে বললেন, 'মিস্, বড়ই লজ্জার কথা, আমার পার্সটা বাড়িতে ফেলে এসেছি।' ওয়েট্রেস ঠাকরুণ বললেন, 'তাতে কি হয়েছে, পরে একদিন দিয়ে যাবেন, আপনার নামটা আমাদের ক্লোকরুমের দেয়ালে লিখে রাখবো।' সাহেব ভাবলেন, যাক বাঁচা গেলো, কিন্তু ন্যাকামি করে বললেন, 'কিন্তু লোকে যে আমার নামটা দেখতে পাবে।' পরিচারিকাটি নির্লিপ্ত স্বরে বললেন, 'কেউ আপনার নাম দেখতে পাবে না। আপনার নামটা আপনার ওভারকোট দিয়ে ঢেকে রাখবো।'

বিদেশের গল্প আরো অনেক আছে। তার চেয়ে আমার একান্ত নিজস্ব বিলিতি অভিজ্ঞতার কথা বলি।

বিদেশের ভোজনালয়ে সবচেয়ে বড় অসুবিধে হলো মেনু পড়ে কিছু বুঝতে না পারা। খাবারের নাম পড়ে সেটা আসলে কি খাবার, যদি আগে থেকে জানা না থাকে, তা বোঝা অসম্ভব।

আমাদের ছোটবেলায় আমাদের ঠাকুমা বলতেন সাহেবদের মতো রুটি আর আলু দিয়ে মাংসের ঝোল খেতে, তা হলে সাহেবদের মতো গায়ের জোর হবে, রঙ ফরসা হবে। পরে কলকাতায় এসে জেনেছিলাম সাহেবদের জলখাবার হলো চপ, কাটলেট ইত্যাদি।

কিন্তু পৃথিবীতে কোথাও কোনো সাহেব হাতেগড়া রুটি খাওয়ার সুযোগ পায় না, আটা মেখে, বেলে তারপরে সেঁকে রুটি গড়ার মতো সময় এখন আর সভ্যতার হাতে নেই, আর তাছাড়া এতে যে আনুপাতিক সময়

ব্যয় হবে তার শ্রমমূল্যে একটি হাতেগড়া রুটির দাম পড়বে অত্যধিক। মাংসের ঝোল, আলু দেওয়া মাংসের ঝোল, চপ কিংবা কাটলেট সাহেবরা কখনোই খেতে পায় না। অন্তত বিশেষ কোনো চালু দোকানের মেনুতে এসব দেখা যাবে না।

কিন্তু এসব আমার বক্তব্য নয় আর আমার জ্ঞানও এ বিষয়ে অতি সামান্য, অভিজ্ঞতাও অল্পদিনের। আমি যা খেতে পারতাম কিন্তু খেতে পাইনি তার কথা বলি।

স্পষ্ট দেখছি, পাশের টেবিলে দুই মেমসাহেব ভাত, আলু ভাজা, ডাল এবং বেগুন সেদ্ধ খাচ্ছেন। জায়গাটাও কোনো ভারতীয় হোটেল নয়, রীতিমতো সাহেবি। কিন্তু আমি খাচ্ছি আধসেদ্ধ শামুক, গুড়মাখা পেঁয়াজ-কলি (ফ্রেশ অনিয়ন লীভস ইন মেপোল সিরাপ) এবং ইত্যাদি, ইত্যাদি। বেশি বর্ণনা দিতে গেলে এই এতদিন পরে, এখনো গা ঘুলিয়ে উঠছে।

কিন্তু আমার যদি খেতে ইচ্ছে হয় বেগুন সেদ্ধ, ডাল, আলু ভাজা এবং দোকানে যদি স্পষ্টতই সেটা পাওয়া যায়, আমি সেটা খাচ্ছি না কেন? এর সরাসরি উত্তর—এইসব খাদ্যদ্রব্যের মার্কিনি নাম আমি জানি না। কেউ কেউ হয়তো হাসছেন আমার ইংরিজি জ্ঞানের স্বল্পতা দেখে। একথা ঠিক যে আমি ইংরেজি একদম জানি না, কিন্তু ডাল ইংরিজি পালস্, বেগুন ইংরিজি ব্রিঞ্জল, আর আলু ইংরিজি পটাটো এটুকু জানি। এবং সেই জ্ঞান দিয়েই চেষ্টা করেছিলাম, 'প্লীজ গিভ মি বয়েলড ব্রিঞ্জল, পালস্ অ্যাণ্ড পটাটো চিপস্।' মেমসাহেব ওয়েট্রেস অনেকক্ষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে থেকে অবশেষে ঝিঙের মতো একটা তরকারি ছেটানো কি একটা আমিষ দ্রব্য নিয়ে এলেন, সেটা শুয়োরের মেটে হতে পারে, আবার হাঙরের লেজও হতে পারে।

বহুদিন কষ্ট করার পরে অবশেষে জানতে পেরেছিলাম যে আমার ছোটবেলায় যা শিখেছিলাম সব ভুল, ডাল ইংরিজি পালস্ নয়, পালস্ বললে কেউ বুঝবে না, বলতে হবে লেন্টিল স্যুপ। সেই রকম বেগুন ব্রিঞ্জল নয়, বেগুন হলো এগ প্ল্যাণ্ট। বেগুন সেদ্ধ ইংরিজিতে বয়েলড এগ প্ল্যাণ্ট

কিনা তা অবশ্য জানতে পারিনি। আর পটাটো চিপস্ সারা পৃথিবীতেই পটাটো চিপস, আলু ভাজার থেকে সেটা আলাদা, ফিনফিনে, মুচমুচে। পটাটো চিপস বললে দোকানে থাকলে সেটাই পাওয়া যাবে, তবে মধ্য মার্কিনে তার উচ্চারণ হলো প-য়ে ছটো কিংবা তিনটে ও কার, মধ্যের ট-য়ে টঙ্কার এবং শেষের ট প্রায় নীরব। তবে চিপস উচ্চারণ খুবই সোজা, কায়দাটা জানা থাকা চাই, জিব দিয়ে নাক ছোঁয়ার চেষ্টা করলে যে শব্দটা গলা থেকে বেরিয়ে আসে সেটাই আমেরিকান চিপসের উচ্চারণ। সে যা হোক, আলুভাজা ইংরিজি কি! গোল-গোল, ডুমো-ডুমো, লম্বা ফালি করা তেলে ছেঁকে আলু-ভাজা যা সর্বত্র সবাই খাচ্ছে, আমি কিছুতেই তার নাম জানতে পারিনি। শেষে চলে আসার দিন এক বিখ্যাত বিমানবন্দরের খাবার ঘরে সহভোক্তার প্লেটে অঙ্গুলি নির্দেশ করে ওয়েটারকে বলেছিলাম, 'ঐ খাবার আমি চাই।' ওয়েটার বললেন, 'ও তুমি ফ্রেঞ্চ ফ্রাই চাইছো?' কত জায়গায় লোকে আমাকে ফ্রেঞ্চ ফ্রাই দেওয়ার চেষ্টা করেছে, কোনো বীভৎস খাবার ভেবে আমি সেটা বর্জন করেছি, তখন কি ঘুণাক্ষরেও জানতে পেরেছি ফ্রেঞ্চ ফ্রাই হলো আলুভাজা, একেবারে সাদামাটা দিশি আলুভাজা।

আমার এই ছঃখের কাহিনী পাঠ করে যাঁরা হাসছেন, তাঁদের জন্যে আরো ছটি অলীক হোটেলি গল্প বলছি। এগুলোও বিলিতি, তবে এর মধ্যে আমি নেই।

প্রথমটি বহুশ্রুত, সেটি কলকাতার ছায়ায় নিয়ে আসছি। কলেজ স্ট্রিটের রেস্টুরেন্টে খদ্দের—ওহে বেয়ারা, পরশুদিন তোমাদের চপ খেলাম, কি ভালো ছিলো, আজ কেমন পচা-পচা লাগছে। কর্মব্যস্ত বেয়ারা—কেন স্যার, আপনাকে তো সেই পরশু দিনের চপই দিয়েছি।

দ্বিতীয় গল্পটি মজার। এক সাহেব ছুটতে ছুটতে এক হোটেলে ঢুকে বললেন, 'ওহে এক বাটি গরম স্যুপ দাও তো, গোলমাল লাগার আগে খেয়ে নিই।' পরিচারিকা মেমসাহেব স্যুপ নিয়ে আসতে এক চুমুকে খেয়ে নিয়ে বাটিটা ফেরত দিয়ে বললেন, 'এখনো গোলমাল লাগলো না, ঠিক

আছে; তাড়াতাড়ি আরেক বাটি দাও।' পরের বাটিটা নিয়ে আসতেই ভদ্রলোক এক চুমুকে সেটাও নিঃশেষ করলেন। তারপর বললেন, 'এখনো গোলমাল লাগলো না।' পরিচারিকা এবার অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলো, 'গোলমাল, গোলমাল করছেন, তা গোলমালটা কিসের?' সাহেব মধুর হেসে বললেন, 'গোলমালটা হলো এই যে আমার কাছে একটা সেন্টও নেই।'

ভাগ্যফল

এ গল্প অনেকদিন আগেকার। রবিবারের সকালবেলা উকিলবাবু তাঁর বাইরের ঘরে বসে মক্কেলদের কাজ সারছিলেন। এমন সময়ে এক জ্যোতিষীঠাকুর এলেন। সে আমলের জ্যোতিষীরা আজকের জ্যোতিষীদের

মত প্যাণ্ট-শার্ট বা ধুতি-পাঞ্জাবি পরতেন না। মাথায় টিকি, কপালে কৌটা, পরিধানে গেরুয়া বা রক্তাম্বর, হয়তো বা পায়ে কাঠের খড়ম, হাতে সিঁদুরমাখা তুলোট কাগজ। তাঁদের দেখলেই চেনা যেতো। তাঁরা কালে-ভদ্রে সংসারী মানুষদের দর্শন দিতেন। তাঁদের দেখা পেতে হলে নির্জন বটতলায় অথবা পোড়োমন্দিরে অমাবস্যার সন্ধ্যাবেলায় অথবা গলির গলি তস্য গলিতে বেনারস শহরের গোলক-ধাঁধায় খোঁজ করতে হতো। আজ-কালকার মতো যে কোনো গয়নার দোকানের দেড়তলার চেম্বারে ঢুকে গেলেই তাঁদের দর্শন পাওয়া যেতো না।

সে কথা পরে বলছি, আগে এই গল্পটা বলি। উকিলবাবু জ্যোতিষী-ঠাকুরকে দেখে যথাসাধ্য সম্ভ্রম প্রদর্শন করতে ইতস্তত করলেন না। এবং কিছুক্ষণ কথাবার্তা, কুশল বিনিময়ের পরে নিজের ডানহাতটি জ্যোতিষীর হাতে সমর্পণ করলেন। জ্যোতিষী তাঁর নামাবলীর ঝোলা থেকে একটি আতস কাচ বার করে খুব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন।

অনেকক্ষণ দেখার পর জ্যোতিষীটি খুব নিম্ন কণ্ঠে যেন খুব গোপন কথা শোনাচ্ছেন এইভাবে বেশ আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে বললেন, 'আপনার মাতা-ঠাকুরাণী গত শীতে মারা গেছেন।' উকিলবাবু কিছু বললেন না, চুপ করে রইলেন। কিন্তু ততক্ষণে গণকঠাকুর উকিলবাবুর হাত দেখে তাঁর আদি-অন্ত, ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান জেনে গেছেন, প্রায় স্বগতোক্তির মতো গড়গড় করে বলে যাচ্ছেন। 'বড় মেয়েটির বিয়ে দিয়েছেন পশ্চিমে, শিগগিরই বাচ্চা হবে অথচ সপ্তাহ দুয়েক চিঠি পাননি, খুব চিন্তিত আছেন। আপনার গৃহিণীর শরীরটা আজ কিছুদিন হলো ভালো যাচ্ছে না। আপনি নিজেও কয়েকদিন আগে আদালতের সিঁড়ির ওপরে হোঁচট খেয়ে বেশ কাহিল হয়েছিলেন, এখনো গোড়ালিতে ব্যথা আছে।'

উকিলবাবু এ কথার পর নিজের দু' পায়ের গোড়ালির দিকে তাকাতে লাগলেন, অপেক্ষা করতে লাগলেন গণকঠাকুরের অনিবার্য মন্তব্যের জন্যে। অবশেষে যখন গণকঠাকুর আসল কথায় এসে বললেন, 'আপনার এখন সময় খারাপ যাচ্ছে। আপনার শনি আর রাহু…', তখন উকিলবাবু

একবার খুব জোরে কেশে উঠলেন। উকিলবাবুর কাশি শুনে জ্যোতিষী-ঠাকুর বাধ্য হয়ে প্রশ্ন করলেন, 'কিছু ভুল বললাম ?' উকিলবাবুর কাশি থামিয়ে রীতিমতো বিস্মিত দৃষ্টিতে জ্যোতিষীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'না ঠিক ভুল নয়, তবে··· ।' জ্যোতিষী বললেন, 'তবে ?' অবশেষে উকিলবাবু পরিষ্কার করে বললেন, 'দেখুন, কি আশ্চর্য ! সবই ঠিকঠাক, খুবই মিলে গেছে। কিন্তু এগুলো একটাও আমার নয়।' সন্ত্রস্ত জ্যোতিষীবাবু বললেন, 'আপনার নয়, মানে ?' উকিলবাবু বললেন, 'আপনার সমস্ত কথা অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেছে কিন্তু সেটা হলো এই গলিরই ঐ মাথায় সাতান্ন নম্বর বাড়ির মহেশ উকিলের সম্পর্কে, আর আমার বাড়ির নম্বর সাতাশ এবং আমি হলাম মহিম উকিল।'

সব জ্যোতিষীই যে এরকম আগেভাগে খোঁজখবর করে জেনে নিয়ে ভবিষ্যদ্‌বাণী করেন তা কিন্তু নয়। এঁরা অনেকেই তীক্ষ্ণ অনুমানের ওপরে নির্ভর করেন। একবার ট্রাম থেকে নামতে গিয়ে চোট খেয়েছিলাম, এক শৌখীন জ্যোতিষী আমাকে বলেছিলেন, 'বাঁ দিকের দরজা দিয়ে নামতে গিয়ে ?' আমি বললাম, 'হ্যাঁ, তাই।' ভদ্রলোক অনেকক্ষণ আমার দু' হাত উলটে-পালটে দেখে চলন্ত যানের বাঁদিকের দরজা সম্পর্কে সাবধান করে দিয়ে গেলেন। ভদ্রলোক চলে যাওয়ার পর মুহূর্তে আমার খেয়াল হলো, ট্রাম গাড়ির ডানদিকে কোনো দরজা নেই, কোনো কালে ছিলো না। সব দরজাই বাঁদিকে এবং এর জন্যে কোনো জ্যোতিষ বিচার দরকার পড়ে না।

অসংখ্য বাঙালীর নাম ইংরেজি 'এস্‌' অক্ষর দিয়ে আরম্ভ। সুতরাং কোনো জ্যোতিষী যদি আপনার ললাট কিংবা কররেখা নিদেনপক্ষে রাশি-নক্ষত্র গভীরভাবে বিবেচনা করে বলেন, আপনার জনৈক ঘনিষ্ঠ বন্ধুর নাম 'এস্‌' দিয়ে আরম্ভ কিংবা 'এস' আদ্যক্ষর দিয়ে নাম-বিশিষ্ট আপনার একজন শত্রু আছে, তা হলে চমকিত বা বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই।

তেমনিই আপনার বয়েস যদি চল্লিশ পঞ্চাশ, জন্ম হয়ে থাকে বাংলা-দেশের মফস্বলে, তা হলে আপনার সম্পর্কে অনায়াসে দুটি অতীতবাণী করা সম্ভব। এক, আপনি অল্প বয়েসে ভীষণ জ্বরে ভুগেছেন, ম্যালেরিয়া,

টাইফয়েড কিংবা সান্নিপাতিক। দুই হলো, একবার আপনি জলে ডুবে প্রায় মরতে মরতে বেঁচে গিয়েছেন।

আর মধ্যবয়সিনী পাঠিকা, আপনি যে বিয়ের আগে একবার প্রথম যৌবনে প্রেমে পড়েছিলেন, সেই প্রেমিক যে আপনার পাশের বাড়িতেই থাকতেন, চিকন, বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা ছিলো তার; আপনার উষ্ণ করতল হাতে ধরার আগেই একথা রয়ে-সয়ে বলে দেওয়া যায়, দশজনের মধ্যে নয়জনের ক্ষেত্রে মিলবেই।

জ্যোতিষীর সংখ্যা খুব বেড়ে গেছে ইদানীং। প্রত্যেক আড্ডায়, প্রত্যেক অফিসে এক বা একাধিক ভবিষ্যদ্‌দ্রষ্টা। এ ছাড়া প্রতিটি পাড়ায়, প্রতিটি গলিতে আছেন একজন করে লোক্যাল জ্যোতিষী। অনেক সময়েই দেখা যায় দুজন জ্যোতিষী মুখোমুখি বসে পরস্পর পরস্পরের ঠিকুজি বিচার করছেন। এই বিচারের ফলাফল উভয় ক্ষেত্রেই প্রায় একই রকম অর্থাৎ এখন সময়টা খুব ভালো যাচ্ছে না, তবে সামনে বছরখানেক বছর দেড়েকের মাথায় ভালো সময় আসছে আর সব যদি ঠিকঠাক যায় তিন বছরের মধ্যে ভাগ্য তুঙ্গে।

অধিকাংশ লোকেরই, বিশেষ করে যখন একজন ভাগ্য নিয়ে মাথা ঘামায়, ধারণা যে তার বর্তমান সময়টা ভালো যাচ্ছে না এবং সে অদূর ভবিষ্যতের গোলাপী সুদিনের স্বপ্ন দেখে। তিরিশ বছরের কোনো কেরানীকে যদি বলেন যে সে ষাট বছরে রাজা হবে, সে যতটা খুশি হবে তার চেয়ে যদি বলা হয় যে সে চৌত্রিশ বছর বয়েসে বড়বাবু হবে তা হলে সে অনেক বেশি খুশি হবে। হাত দেখেই হোক বা ঠিকুজি দেখেই হোক সমস্ত গণৎকারই শেষ পর্যন্ত যা বলেন তার সারমর্ম হলো বাল্যকালে মৃত্যুযোগের থেকে রক্ষা, প্রথম যৌবনে ব্যর্থ প্রেম, এখন সময়টা তেমন ভালো নয়, সামনে কয়েকটা ফাঁড়া, দুটো বাধা, তিনজন শত্রু, তবে ভালো দিন এলো বলে।

অনেক সময় শোনা যায় হাত দেখে বা মুখ দেখে কোনো জ্যোতিষী নাকি জন্মসময় ও তারিখ বলে দিতে পারেন, এ ব্যাপারটি আমি কখনো যাচাই করে দেখি নি। তবে এই সূত্রে এক দক্ষিণ ভারতীয় অধ্যাপকের

কথা মনে পড়ছে। এই চিরকুমার, তীক্ষ্ণধী বিজ্ঞানের অধ্যাপক তাঁর সারা জীবনের সঞ্চিত অর্থ দান করবেন সেই জ্যোতিষীকে যিনি দশটি অজ্ঞাত-পরিচয় ব্যক্তির ঠিকুজি দেখে বলে দিতে পারবেন কোন্‌টি স্ত্রীলোকের ঠিকুজি আর কোন্‌টি পুরুষের ঠিকুজি এবং এর মধ্যে কে কে মৃত। যতদূর জানি, এখনো কোনো দাবিদার মেলে নি।

জ্যোতিষের প্রতি দুর্বলতা লোকের মধ্যে কিন্তু ক্রমশ বেড়েই চলেছে। পুলিসের গোয়েন্দা, আধুনিক লেখক, ইঞ্জিনিয়র, ডাক্তার, এমন কি রাজনৈতিক নেতা, বিপ্লবী উগ্রপন্থীর হাতের আঙুলে পাথর বসানো আংটি দেখা যাচ্ছে। বিলেতে মনস্তত্ত্ববিদরা যে ভূমিকা পালন করেন এদেশে জ্যোতিষীরাও সম্ভবত তাই করছেন। দুর্বল মানুষ তাঁর ভয়, দুশ্চিন্তা ও অনিশ্চয়তার জীবনে একজন বিশেষজ্ঞ পরামর্শদাতার প্রয়োজন বোধ করেন, আমাদের দেশে জ্যোতিষীরা সেই প্রয়োজন মেটাচ্ছেন।

তা মেটান, আমি একটি প্রাচীন ও নিষ্ঠুর গল্প দিয়ে ভাগ্যফল শেষ করি। জ্যোতিষী রাজার হাত দেখে বললেন, 'আয়ু আর বেশি নেই।' রাজা আতঙ্কিত। পাশেই সেনাপতি ছিলেন, বললেন, 'তাই নাকি? তা গণকঠাকুর, আপনার আয়ু কত?' গণকঠাকুর বললেন, 'তা আরো তিরিশ বছর।' সেনাপতি সঙ্গে সঙ্গে জ্যোতিষীর গলা তলোয়ার দিয়ে কেটে ফেললেন, তারপর রাজাকে বললেন, 'ইয়োর একসেলেন্সি, দেখলেন তো তিরিশ বছর আয়ুর ব্যাপারটা, খামোকা এসব কথা বিশ্বাস করবেন না।'

বিশেষজ্ঞ

স্থান, দীঘার বিখ্যাত সমুদ্রতটের কাছাকাছি কাঁথি মহকুমার একটি গণ্ডগ্রাম। এই এলাকায় প্রচুর কাজু বাদামের চাষ হয়। কাজু মূল্যবান ফসল, বিদেশের বাজারে এর খুবই চাহিদা। কাজু বাদাম এখন দেশের মধ্যেও খুব জনপ্রিয়, যদিও দাম আকাশ-ছোঁয়া। কাঁথি অঞ্চলে কাজুর সন্দেশ তৈরি হয়, সেও বিশেষ উপাদেয়।

এই সব নানা কারণে এখন কাজুর প্রতি সকলের দৃষ্টি পড়েছে। দিল্লী থেকে বিশেষজ্ঞ এসেচেন সুদূর দীঘাতে কাজু চাষ পর্যবেক্ষণ করতে। সুখের বিষয়, বিশেষজ্ঞ মহোদয় বাঙালী, ইনি সম্প্রতি মার্কিন দেশ থেকে ছয় মাসের কাজু চাষের ট্রেনিং নিয়ে এসেছেন। আমেরিকায় কাজুর চাষ হয় কি না, সেখানে এর ট্রেনিং কি হবে—এ সব প্রশ্ন আশা করি কাণ্ডজ্ঞান সম্পন্ন পাঠকেরা দয়া করে তুলে আমার অসুবিধে সৃষ্টি করবেন না।

সে যা হোক, বিশেষজ্ঞ মহোদয় সপারিষদ এক শীতের দুপুরে সমুদ্রের কাছের সেই গ্রামটিতে পৌঁছেছেন। এই ঠাণ্ডার দিনেও খালি গায়ে রোদ্দুরে বসে গ্রামের একজন কৃষক তামাকু সেবন করছিলেন। হঠাৎ তাঁর বাড়ির সামনে সম্ভ্রান্ত লোকজন দেখে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। তাঁকে দেখে বিশেষজ্ঞ মহোদয় বেশ উৎসাহের সঙ্গে এগিয়ে এলেন, এসে যে গাছটায় এতক্ষণ কৃষক হেলান দিয়ে বসে ছিলেম সেটার গায়ে নিজের মুখের পাইপটা

ঠুকতে ঠুকতে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এ গাছটার গোড়া অক্টোবর মাসের শেষ সপ্তাহে নিড়িয়ে, খুঁড়ে দিয়েছিলেন ?'

এই প্রশ্ন শুনে কৃষক কেমন থমকে গেলেন। কিছু বলার আগেই বিশেষজ্ঞ মহোদয়ের একজন পারিষদ বাংলা করে বুঝিয়ে দিলেন, 'অক্টোবর, মানে ঐ আশ্বিন মাসে গাছটার গোড়াটোড়াগুলো বেশ সাফ করে দিয়েছিলেন ?'

কৃষক এবার বললেন, 'না।'

শূন্য পাইপটা দাঁত দিয়ে চিবোতে চিবোতে বিশেষজ্ঞ মহোদয় বললেন, 'তাই বলি', তারপর একটু থেমে আবার কৃষককে জিজ্ঞাসা করলেন, 'গাছটার ওপরের ডালগুলো এর মধ্যে কোনো দিন ভালো করে পোকা মারার ওষুধ দিয়ে স্প্রে করে দিয়েছেন ?'

কৃষকের মুখ দেখে বোঝা গেলো তিনি সাত জন্মে এ রকম কিছু শোনেন নি, জেরার জবাবে থতমত খেয়ে বললেন, 'আজ্ঞে, না তো।'

'তখনই বলেছিলাম,' বিশেষজ্ঞ মহোদয় কাতর আর্তনাদ করে উঠলেন, 'সাধে এই অবস্থা,' তারপর অসম্ভব উত্তেজিত হয়ে কৃষকের সামনে দু' পা এগিয়ে গিয়ে প্রায় চেঁচিয়ে বললেন, 'আর কিছু না করুন, এই শীতের মধ্যে, বৃষ্টির আগে গাছের উপরের পাতাগুলো একবার ছেঁটে দেবেন তো ?'

একজন অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির এ রকম মারমুখো ভাব দেখে ইতিমধ্যে কৃষক রীতিমতো ঘাবড়িয়ে গেছেন এবং চার পা পিছিয়ে গেছেন। নিরাপদ দূরত্বে থেকে তিনি কোনো রকমে জবাব দিতে পারলেন, 'আজ্ঞে না তো।'

মাথায় হাত দিয়ে বিশেষজ্ঞ মহোদয় মাটিতে বসে পড়লেন, 'এই ভাবে নিজের সর্বনাশ করে! আমি অবাক হয়ে যাবো যদি আপনি এই গাছে এক কেজির বেশি কাজু বাদাম পান।'

একটু দম নিয়ে কৃষক তাঁর হাতের হুঁকোতে দু-তিনবার জোরে জোরে টান দিলেন কিন্তু আগুন নিবে গেছে, ধোঁয়া বেরোলো না, নিরাশ কণ্ঠে তিনি বললেন, 'আমিও খুব অবাক হবো।'

এই নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতিতে বিশেষজ্ঞ মহোদয়ের মুখে আর বাক্য

জোগালো না, একজন পারিষদ তাঁকে সাহায্য করলেন, কৃষককে পালটা জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনিও অবাক হবেন?'

এইবার কৃষক বেশ ধাতস্থ হয়েছেন, কোমর থেকে দেশলাই বের করে হুঁকোটা ধরিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, 'অবাক হবো না? এটা হলো শ্যাওড়া গাছ, এই শ্যাওড়ায় এক কেজি কেন, যদি একটা কাজুবাদামও হয় নিশ্চয়ই অবাক হবো, খুবই অবাক হবো।'

উপরের গল্পটি সম্পূর্ণ বানানো। এর সঙ্গে কোনো জীবিত ব্যক্তি বা প্রকৃত ঘটনার কোনো সংযোগ নেই। যদি কোনো কারণে কোথাও কোনো মিল ঘটে যায় সে নিতান্তই আকস্মিক।

বরং বিশেষজ্ঞ সম্পর্কে সেই সাঁতারের শিক্ষকের গল্পটি একবার স্মরণ করি। গল্পটি বাংলা ভাষায় অনবদ্য ভঙ্গিতে লিখেছিলেন শিবরাম চক্রবর্তী, মূল ইংরিজিটা বোধহয় পি. জি. ওডহাউসের, নাকি স্টেফান লীককের।

গল্পটা রীতিমতো চওড়া, অন্ততঃ শিবরাম চক্রবর্তীর কলমে। বিস্তারিত বর্ণনা থাক, আসল ঘটনা এই রকম। সাঁতারের বিখ্যাত ইস্কুলের সাঁতার শিক্ষকেরও খুব খ্যাতি। তিনি শিক্ষার্থীদের নানা রকম নির্দেশ দেন, তাঁরই নির্দেশে কতজন যে দক্ষ সাঁতারুতে পরিণত হয়েছে, অতি আনাড়ি অবস্থা থেকে, তার হিসাব নেই। একদিন হঠাৎ জলে পড়ে গেলেন শিক্ষক মশায়। তিনি তীর থেকে নির্দেশ দিতেন কিন্তু সেদিন কি করে পাড় থেকে জলে পড়ে গেলেন। তারপর নাকানি-চুবানি খেয়ে ডুবে মরেন আর কি! সেদিনই প্রকাশ পেলো তিনি সাঁতার একদম জানেন না, জীবনে কখনো জলে নেমেছেন কিনা তাই সন্দেহ।

অবশ্য এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। সাঁতার শেখাতে গেলে সাঁতার জানতেই হবে এমন কোনো কথা নেই।

আমার নিজের উদাহরণ দিয়ে বলতে পারি। আমি গানের গ জানি না। গান সম্পর্কে আমার সুরজ্ঞান এবং কণ্ঠস্বর দুইই ভয়াবহ। বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণের কাছে গো-মাংস যেরকম, আমার কাছে সারেগামাও তাই। একটা উদাহরণ দিয়ে বোঝাতে পারি। একবার এক অনুষ্ঠানে বাদ্যযন্ত্র

বাজছিল, বাজনা শুনে আমি বুঝতে পারলাম 'ধনধান্যে পুষ্পেভরা'—দ্বিজেন্দ্রলালের জাতীয় সঙ্গীতটি বাজানো হচ্ছে, আমি জাতীয় সঙ্গীতের প্রতি যথারীতি সম্মান প্রদর্শনের জন্যে উঠে দাঁড়ালাম।

আমি ছিলাম সেই সভায় প্রধান অতিথি বা বিশেষ অতিথি বা ঐ রকম কিছু। পাশেই সভাপতি মহোদয় বসে ছিলেন। তিনি আমাকে উঠে দাঁড়াতে দেখে বললেন, 'উঠছেন কেন?' আমি বললাম, 'আপনিও দয়া করে উঠুন। দেখছেন না জাতীয় সঙ্গীত বাজছে।' সভাপতি মহোদয়ের দুই চোখ কপালে উঠলো। বেশ চমকিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কাম সেপ্টেম্বর আবার কবে থেকে জাতীয় সঙ্গীত হলো?' আমি আর কিছু বললাম না, ঝুপ করে চেয়ারে বসে পড়লাম।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, এই সভাটি ছিলো একটি সঙ্গীত বিদ্যায়তনের বার্ষিক উৎসব এবং আমাকে বড়ো সমঝদার ভেবে কর্তৃপক্ষ অতিথি করে নিয়ে গিয়েছিলেন।

কর্তৃপক্ষের তেমন দোষ দেওয়া চলে না। এ রকম ভুল সর্বত্রই হয়। যাঁকে আমরা কোনো বিষয়ে অথরিটি বলে ধরে নিয়েছি তিনি হয়তো সেই বিষয়ে একজন প্রকৃত হস্তিমূর্খ। দশচক্রে যে রকম ভগবান ভূত হয় তেমনি মূর্খও পণ্ডিত বলে খ্যাত হয়। তবে ঐ দশচক্রের মূল চক্রটি উচ্চাভিলাষী মূর্খ নিজেই আবর্তন করান।

অজ্ঞদের গালাগাল করা রুচিসম্মত নয়, বিশেষজ্ঞের কথা হচ্ছিলো সেই কথাই বলি। ইংরেজিতে বলা হয় কোনো ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয়ের আরো-আরো-আরো জানতে জানতে অবশেষে এভরিথিং অফ নাথিং জানাই হলো বিশেষজ্ঞের বা পণ্ডিত শ্রেষ্ঠের স্বপ্ন। এই নাথিং কিন্তু ঠিক নাথিং নয়, দু-একটা উদাহরণ দিচ্ছি। মনে করুন একজনের বিষয় হলো মৌর্য যুগের স্বর্ণমুদ্রার সিংহের ডান পায়ের (সামনের) মধ্যমার দৈর্ঘ্য। ইনি কিন্তু এ বিষয়ে এখন পর্যন্ত দশ হাজার পৃষ্ঠা লিখে ফেলেছেন। ইনি ইতিহাসের লোক। এঁরই বন্ধু সাহিত্যের, তাঁর বিষয় হলো শিলাইদহের কুঠিবাড়ির মধ্যের ঘরের বড় শাল কাঠের জলচৌকিটির পায়ার কাছে যে কালির দাগ

লেগে ছিলো সেই মসিচিহ্ন কি শিলাইদহ বোটে জলচৌকিটি নিয়ে সোনার তরী কবিতাটি লেখার সময়, (যদি নেওয়া হয়ে থাকে), দোয়াত উলটে লেগে গিয়েছিলো ? এই বক্তব্যের পক্ষে এবং বিপক্ষে তিনি একশো রকম তথ্য ও সাক্ষ্য সংগ্রহ করেছেন।

আজ কিছুদিন হলো শরীরটা ভালো যাচ্ছে না, ডাক্তার সাহেবদের হাতে আছি। বিশেষজ্ঞ নিয়ে লেখা শেষ করার আগে তাঁদের সম্পর্কে কিছু না লেখা অনুচিত হবে।

আমাদের ছোটবেলায় পারিবারিক ডাক্তার পায়ের গোড়ালি থেকে মস্তকের ব্রহ্মতালু পর্যন্ত সর্বাঙ্গের চিকিৎসা করতেন। তিনিই বহু পরে একবার কানে ব্যথা হওয়ায় বললেন ই-এন-টি স্পেশালিস্টের কাছে অর্থাৎ নাসিকা-কর্ণ-কণ্ঠ বিশেষজ্ঞের কাছে যেতে। এর অনেকদিন পরে একবার মিনিবাসে একটা লোক আমার নাকটা গুঁতিয়ে দিলো, রীতিমতো ফুলে গেলো। সেই ই-এন-টির কাছে গেলে তিনি বললেন, 'আমি এখন শুধু কান করছি। আপনি ডঃ নাগের কাছে যান। তিনি এখন নাক করেন।' ডঃ নাগকে গিয়ে দেখালাম। তারপর এই গত সপ্তাহে ঠাণ্ডা লেগে ভীষণ মাথা ভার, একটা নাক, ডান নাকটা সম্পূর্ণ বন্ধ। আবার গেলাম ডঃ নাগের কাছে। তিনি সব দেখে বললেন, 'ডান নাক আমার দ্বারা হবে না, আমি এখন শুধু বাঁ নাক দেখছি।'

উশ্চারণ

'তোমার উশ্চারণ ঠিক হচ্ছে না।' কথাটা নিশ্চয়ই শিবরাম চক্রবর্তী বলেছিলেন। হয়তো একটু-আধটু অন্য রকম ভাবে। হাতের কাছের শিবরাম চক্রবর্তীর বইগুলি আঁতিপাঁতি করেও এই মুহূর্তে সেই গল্পটি খুঁজে পেলাম না, যেখানে এই কথাটা আছে। শব্দের উচ্চারণ নিয়ে শিবরাম চক্রবর্তী অনেক রকম মজা করেছেন। মজা করেছেন পরশুরাম। তাঁর অবিস্মরণীয় 'হয় Zানতি পারো না!' কিংবা সেই বেলেঘাটা কেরাসিন ব্যাণ্ডের 'লটবর
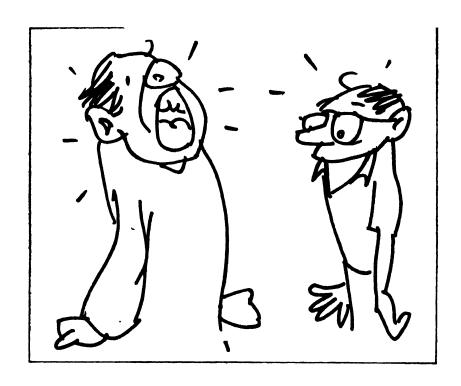
লন্দী ব্যাণ্ড মাস্টার, দস্তুরমত কলসার্ট, লবীন লিয়োগী ক্লারিয়নেট, লরহরি লাগ ফুলোট, লবকুমার লন্দন ব্যায়লা—সব লিয়ে উলিশ জন' প্রথম যুগের থেকে শেষ অবধি উচ্চারণের অফুরন্ত মজা তাঁর প্রায় সমস্ত গল্পে।

হাসির গল্পের কথা আলাদা। কয়েকদিন আগে একটা খবর দেখে চমকিত হলাম। ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ এডুকেশন বিরাট বাংলা অভিধান প্রস্তুত করছেন, তাতে প্রত্যেক শব্দের অর্থ ইত্যাদির সঙ্গে উচ্চারণও নাকি যোগ করা হবে। ইংরেজি অভিধানে উচ্চারণের ইঙ্গিত দেওয়া থাকে। কিংবা তেমন বড় অভিধানে প্রায় স্পষ্ট করেই উচ্চারণ প্রণালী বুঝিয়ে বলা থাকে। যতদূর জানি, বাংলায় এতদিন সেটা হয়নি। কোনো অভিধানেই তেমন দেখেছি বলে মনে হয় না। খুব প্রয়োজন আছে বলেও মনে হয় না। ইংরেজির মতো বাংলা শব্দের উচ্চারণ বর্ণে-বর্ণে, অক্ষরে-অক্ষরে ব্যতিক্রম বা তারতম্য হয় না। শতকরা নিরানব্বুইটি কিংবা হাজার করা নয়শো

নিরানব্বুইটি শব্দ চোখে যা দেখেছি ঠিক তাই। আর আজকাল শব্দের বানানই তো উচ্চারণমুখী। যদি বলি নব্বই—লিখবো নব্বই, যদি বলি নব্বুই লিখবো নব্বুই আর যদি বলি নব্বোই তাহলে নব্বোই। একা না এ্যাকা, স্মরণ উচ্চারণ কি হবে কিংবা জ্যোৎস্নার খণ্ড ৎ নিয়ে ইচ্ছে করলেই পণ্ডিত প্রবরেরা পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা লিখে যেতে পারেন, তা জানি। তবু মোটামুটি ভাবে বাংলা শব্দের উচ্চারণ চোখের দেখা যা প্রাণের কথাও তাই।

এইখানে নিজেকে একটু সংশোধন করি। চোখের দেখার মধ্যে একটু গোলমাল আছে। অনেকদিন আগে এক উদ্বাস্তু পল্লীতে বেশ কিছুদিন বসবাস করেছি। সেখানে সকাল বেলায় দেখতাম গৃহশিক্ষক শীতের রোদে বারান্দায় শতরঞ্জির উপরে বসে একটি শিশুকে প্রথম পাঠ চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে শেখাচ্ছেন। একদিন চমকে উঠলাম, ভদ্রলোক শিশুটিকে পড়াচ্ছেন, 'ব হ্রস্ব ই বি, ড-য় বিন্দু ড় আকার ড়া আর ল মেকুর'। প্রবল উৎসাহে ভদ্রলোক পড়িয়ে যাচ্ছেন, শিশুও তারস্বরে মুখস্থ করছে। আসলে হয়েছে কি, বইটিতে একটি বিড়ালের ছবি ছাপা আছে। ভদ্রলোক দেশের যে অঞ্চল থেকে এসেছেন সেখানে বিড়াল নামে কোনো জন্তু নেই, জন্তুটির পরিচয় মেকুর হিসেবে। তিনি বানান ঠিকই করছেন, চোখের সামনে রয়েছে মেকুরের ছবি। বলে ফেলছেন, 'ব হ্রস্ব ই বি, ড-য় বিন্দু ড় আকার ডা আর ল মেকুর।'

অবশ্য তাঁর এই ভুল শিক্ষাদান' বেশিদূর এগোতে পারে নি। শিশুটির পিতা, গৃহকর্তা যিনি, খুব দেরি করে ঘুম থেকে উঠেন, একদিন কি কারণে সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠে পড়েছেন, উঠে দেখেন এই রকম পড়ানো হচ্ছে। তিনি ভীষণ উত্তেজিত হয়ে পড়লেন, মাস্টারমশায়কে ধমকাতে লাগলেন, 'এই সব কি পড়াইতেছেন? স্পষ্টই দেইখতেছেন, লিখা আছে বিলাই আর শিখাইতেছেন মেকুর!'

তবে এখানে মাথা নিচু করে, হাত জোড় করে একথা আমার বলে নেওয়া উচিত যে উচ্চারণ নিয়ে ইয়ার্কি করার কোনো অধিকার আমার নেই।

আমার দেশজ উচ্চারণ আজও আমার বন্ধুবান্ধবদের বিশেষ করে বান্ধবীদের হাসাহাসির কারণ। হাঁস না হাস, হাসপাতাল না হাঁসপাতাল, অসীমবাবু না ওসীমবাবু আমি আজও ধরে উঠতে পারিনি। আর পূর্ববঙ্গের এক মফস্বলী উচ্চ ইংরিজি বিদ্যালয়ে ইংরিজি উচ্চারণ যা শিখেছিলাম তার তুলনা নেই। আমার আজও সংশয় আছে ফিনান্স না ফাইনান্স, ডেপুটি না ডেপটি। এই তো সেদিনও ফীচার শব্দ উচ্চারণ করতাম, ফ্যাচার। জিজ্ঞাসা করতো, 'তারাপদ তোমার ফ্যাচার কবে শেষ হবে?'

আমার চেয়েও অসুবিধে স্বশিক্ষিত লোকেদের। আমি তাঁকে চাক্ষুষ দেখিনি কিন্তু এই রকম এক ভদ্রলোকের কথা ছোটবেলায় শুনেছি। তিনি গহন পাড়াগাঁয়ে নিজে বাংলা-ইংরিজি অভিধান দেখে ইংরিজি শিখেছিলেন, তাঁর কাছে ভবিষ্যৎ ইংরিজি ছিলো ফুতুরী—এফ ইউ ফু, টি ইউ তু, আর ই রী। সেই রকম এফ আই ফি, এন ই নী, ফিনী অর্থাৎ ফাইন, মানে সুন্দর। ভদ্রলোকের ভবিষ্যৎ চর্চার অভ্যেস ছিলো, বহু লোকের হাত দেখেই বলেছেন, তোমার ফুতুরী ফিনী অর্থাৎ ভবিষ্যৎ সুন্দর।'

এই সূত্রে একটা অতি রদ্দি গল্প বলার লোভ সংবরণ করতে পারছি না। এই ফুতুরী ফিনীর পৌত্র পরবর্তীকালে কলকাতার স্টেট বাসে একদিন কনডাকটরের কাছে এলজিন রোডের টিকেট চেয়েছিলেন। কনডাকটর ভদ্রলোক অনেক পরিশ্রম করে অবশেষে বুঝতে পারেন, জায়গাটা হলো এলগিন রোড (মানে এখন যার নাম লাজপত রায় সরণি)। ভদ্রলোককে কনডাকটর টিকেট দিয়ে বললেন, 'ও এলজিন রোডে যাবেন, জুড জড (good god), তাই বলুন।'

এর চেয়েও বাজে গল্প কোকাকোলা নিয়ে। এক মফস্বল শহরের রেল স্টেশনের সামনে কোকাকোলার সাইন বোর্ড টাঙানো হয়েছে, ইংরিজিতে লেখা। তখনো কোকাকোলা নামীয় স্বর্গীয় পানীয়টি এত বিখ্যাত হয়নি। সবে আমাদের দেশে এসে পৌঁছেছে। তিন মাস পরে বাংলা সাইন বোর্ড লাগানো হলো, সবাই জানলো পানীয়টির নাম কোকাকোলা। তার আগে শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ক্রেতা-বিক্রেতা সবাই যে যার ইচ্ছে মতো এই

মনোমোহিনী পানীয়টির নামকরণ করেছিলেন ইংরিজি সাইন বোর্ডের বানান দেখে। নামগুলি ছিল এই রকম—ছোকাছোলা, ছোছাকোলা, ছোছা-ছোলা, কোছাছোলা, কোকাছোলা, কোছাকোলা, ইত্যাদি ইত্যাদি।

শ্রীযুক্ত হিমানীশ গোস্বামী লণ্ডন শহরের এক বাঙালী যুবকের ব্যর্থ প্রেমের গল্পে লিখেছিলেন, ছেলেটি তার মেম প্রেমিকাকে বাড়িতে নিয়ে টি এবং স্নেক খাওয়াতে চায়। মেম তরুণী ভারতীয় যুবক স্নেক অর্থাৎ সাপ খাওয়াবে এই ভয়ে পলায়ন করে। আসলে যুবকটির বাঙাল উচ্চারণই এর জন্য দায়ী, সে চেয়েছিলো স্ন্যাক্ খাওয়াতে। কিন্তু স্ন্যাক বলতে পারে না, বলে স্নেক।

বলতে পারে না, এ কথা কিন্তু ঠিক নয়। আমার নিজের অভিজ্ঞতা একটু আলাদা। প্রথম যৌবনে মফস্বলের এক বিদ্যায়তনে কাজ করে-ছিলাম। সেখানে সতীশবাবু বলে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হয়ে-ছিলো, পরিশ্রমী সমাজসেবী। উচ্চশিক্ষিত কিন্তু সব ইংরিজি উচ্চারণই তাঁর জিবে কেমন যেন বেঁকিয়ে যায়। শুধু ইংরিজি নয়, বাংলা শব্দের উচ্চারণেও তাই। ইনি সেই জাতীয় লোক যিনি ব্যাঙকে বলেন বেঙ এবং ভেককে বলেন ভ্যাক। সে যা হোক, একবার দেখি সেই মফস্বল শহরের হাস-পাতালের সামনে এক চায়ের দোকানের বাইরের বেঞ্চে বসে চা আর পাউরুটি খাচ্ছেন সতীশবাবু। তখন বেলা তিনটে। আমি গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'কি সতীশবাবু কি খবর?' সতীশবাবুর চেহারা অবসন্ন, চুল এলোমেলো। সতীশবাবু বললেন, 'সকাল থেকে স্নান-খাওয়া নাই, হাস-পাতালে ছুটাছুটি করছি আর এই চায়ের দোকানে বসে টি আর স্নেক খাচ্ছি।' স্নেক বলে হাতে তুলে অর্ধভুক্ত পাউরুটিটা দেখালেন। আমি সৌজন্যের খাতিরে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কেন হাসপাতালে কি দরকার পড়লো?' সতীশবাবু ম্লান হেসে বললেন, 'আর দরকার। স্ন্যাক বাইটের কেস। বড় নাতিটাকে আজ সকালবেলা বাড়ির পিছনের ঝোপটার পাশে একেবারে জাত সাপে কামড়েছে। এখন জীবন-মরণ টানাটানি।'

পুনশ্চ: কাণ্ডজ্ঞানের লেখক অতি মূর্খ। বর্তমান সংখ্যার দ্বিতীয়

অনুচ্ছেদে উচ্চারণ ও অভিধান নিয়ে যদি কিছু গোলমাল লিখে থাকি, দয়া করে এই হাস্যকর মূর্খতা ক্ষমা করবেন। তবে পণ্ডিতজনেরা কাণ্ডজ্ঞান পড়েন না, সেটাই যা ভরসা।

বয়েস
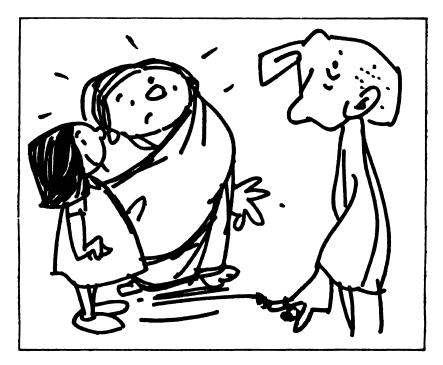
আমি নিজে এখন যে বয়েসের দিকে তাতে বয়েস নিয়ে ইয়ার্কি করার চেষ্টা করা বোধহয় অনুচিত।

তবে বয়েস নিয়ে কৌতূহল আমার ছোটবেলা থেকে। মনে আছে, ছোট দিদিমা সেই মহাভারত পড়ছিলেন। জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'আচ্ছা ছোট দিদিমা, দৌপদীর বয়েস কত ছিলো?' এর একটা চমৎকার উত্তর দিয়েছিলেন সেই বৃদ্ধা, 'দ্রৌপদীর একেক সময়ে একেক রকম বয়েস ছিলো।

যখন ছোট ছিলো, ছেলেবেলায়, তখন তিন-চার বছর বয়েস ছিলো, আর একটু বড় হলে তখন দশ-বারো বছর হলো, তারপরে বিয়ে হলো, বনবাসে গেলো, রানী হলো, এইভাবে কুড়ি, পঁচিশ, পঞ্চাশ বছর বয়েস হলো। তারপরে বুড়ি বয়েসে হলো ষাট-সত্তর-আশি, স্বামীদের সঙ্গে হিমালয়ে চলে গেলো।' আমার ছোট দিদিমার এই ফর্মুলাটি কিন্তু সব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা সম্ভব নয়। বিশেষ করে রূপসীদের ক্ষেত্রে বয়েসের এ রকম সরল অগ্রগতি সম্ভব নয়। মেঘে মেঘে তাদের বয়েস বেড়ে যায়, তাঁদের বয়েসের গাছ-পাথর থাকে না। কিন্তু বয়েস নিজেই এক পাথর, সেই যে বত্রিশে অনড় হয়ে আছে আর নড়ছে না।

এর ফল অবশ্য কোনো কোনো সময় অতি মারাত্মক হতে পারে। ঘোড়দৌড়ের মাঠে জুয়াড়ি তার সঙ্গিনীকে বলেছিলেন, 'আজ আর কোনো হিসেব কষবো না, আজ শুধু ভাগ্যের উপর নির্ভর করে বাজি ধরবো। তোমার বয়েস কত?' সুন্দরী সঙ্গিনী অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন, 'আমার বয়েস? আমার বয়েসের সঙ্গে তোমার বাজি ধরার কি সম্পর্ক, কিছু বুঝতে পারছি না।'

জুয়াড়ি বললেন, 'বিশেষ কিছু বুঝতে হবে না। তোমার বয়েস যত তত নম্বর ঘোড়ার উপর বাজি ধরবো। আজকের ভাগ্যপরীক্ষা এইভাবে করবো। লজ্জা কি, বয়েসটা বলে ফেলো।' সুন্দরী একটু ইতস্তত করে বললেন, 'বত্রিশ'। জুয়াড়ী ভদ্রলোক বত্রিশ নম্বর ঘোড়ার উপরেই বাজি রাখলেন। বাজির শেষে দেখা গেল চুয়াল্লিশ নম্বর ঘোড়াটি জিতেছে, আর এও দেখা গেল যে জুয়াড়ির সঙ্গিনী মহিলাটি বিজয়ী অশ্বের নম্বর চুয়াল্লিশ জানা মাত্র অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেছেন।

হলিউডের খ্যাতনাম্নী অভিনেত্রী কথাচ্ছলে এক কৌতুকাভিনেতাকে এক পার্টিতে বলেছিলেন, 'আমার বয়েস এই চল্লিশের দিকে এগোচ্ছে।' কৌতুকাভিনেতা টুপি তুলে কুর্নিশ করে বলেছিলেন, 'চমৎকার! ম্যাডাম, কিন্তু একটা কথা!' ম্যাডাম ভ্রূ কুঞ্চন করে বললেন, 'কি কথা?' ছদ্ম ভয় পাওয়া মুখে কৌতুকাভিনেতা বললেন, 'ভয়ে বলি না নির্ভয়ে বলি!'

হলিউডের প্রথম সারির নায়িকা অত সহজে পিছপা হবেন কেন, আদেশ করলেন, 'ভাঁড়ামি না করে নির্ভয়ে বলুন।' কৌতুকশিল্পী বললেন, 'ম্যাডাম যখন সাহস দিয়েছেন, প্রশ্ন একটাই, আপনার বয়েসটা যে চল্লিশের দিকে এগোচ্ছে সেটা সামনের দিক দিয়ে না পিছনের দিক দিয়ে ?' অভিনেত্রী মহোদয়ার মুখ লাল হয়ে গেলো, রেড গ্লো স্কিন ক্রীমের রক্তিম পর্দা ভেদ করে তাঁর ক্রোধ ফুটে বেরিয়ে এলো। ভদ্রমহিলার সুকুমার রায়ের হযবরল পড়া থাকলে ভালো হতো, বুদ্ধি করে পাশ কাটিয়ে উত্তর দিতে পারতেন, 'চল্লিশের পরে বয়েসটা ঘুরিয়ে দেওয়া যায় জানেন না ?'

শুধু সুন্দরী বা রূপসী নয়, স্ত্রী-পুরুষ, আবালবৃদ্ধবনিতার সমবেত দুর্বলতা বয়েস। আমি অনেক বুদ্ধিমান লোককে বলতে শুনেছি, 'ও বলাইয়ের কথা বলছো। ও তো আমার থেকে আড়াই বছরের বড়।' কিংবা 'না, না, নাইনটিন টোয়েন্টি নয়, আমি জন্মেছিলাম নাইনটিন টোয়েন্টি থ্রিতে'। একবার এক প্রসিদ্ধ ব্যক্তিকে ষাট বছর পূর্তি উপলক্ষে আমরা কয়েকজন বন্ধু মিলে একটা ঘরোয়া আসরে সংবর্ধনা দেবো ঠিক করেছিলাম। যে বন্ধুর সঙ্গে এ নিয়ে আলোচনা করেছিলাম, সে দেখি পরের দিনই হাঁফাতে হাঁফাতে এসে উপস্থিত। সে যা বললো সেটা খুব আশ্চর্যের কথা, যাঁকে সংবর্ধনা দেওয়ার কথা, তিনি বলেছেন, 'আমার জন্মতারিখ সম্পূর্ণ ভুল। এখন আমার চুয়ান্ন বছর বয়েস চলছে, ষাট বছরের সংবর্ধনা ছয় বছর পরে হবে।'

এর আবার একটা উল্টো দিক আছে। একবার সত্তর-পঁচাত্তর হয়ে গেলে, আত্মীয়স্বজন পাড়াপ্রতিবেশী বয়েস বাড়াতে থাকে। এক প্রৌঢ় ভদ্রলোকের ষাট বছর বয়েস, তাঁর মা বেঁচে আছেন। সবাই বলে মায়ের বয়েস নব্বুই কিন্তু আসলে পঁচাত্তরের বেশি নয়। বৃদ্ধাদের ক্ষেত্রেই এটা বেশি হয়। অনেকেই বলে তাদের দিদিমার বয়েস একশো বছর হতে চললো। একটু খোঁজ করলে বোঝা যাবে ব্যাপারটা কাল্পনিক, মায়ের বয়েস ষাট-পঁয়ষট্টি হয়েছে সুতরাং দিদিমার বয়েস নিশ্চয়ই একশো। কিন্তু তা তো নয়, প্রথম সন্তানের সঙ্গে মায়ের বয়েসের পার্থক্য পনেরো-ষোলো

বছরের বেশি হতো না, এই সেদিন পর্যন্ত।

সত্তর পর্যন্ত বয়েস ঠিক থাকে। তারপর বছরে দু' বছর করে বয়েস বাড়তে থাকে, বেঁচে থাকলে এই ভাবে বছর দশেক অর্থাৎ আশি পর্যন্ত চলে। তখন কিন্তু নাতিদের মুখে মুখে দিদিমার বয়েস নব্বুই দাঁড়িয়েছে। আশি না নব্বুই এ নিয়ে অধিকাংশ দিদিমাই কোনো রকম মাথা ঘামান না, ববং দন্তহীন দিদিমারা থ্যাতলানো পান চিবুতে চিবুতে বলেন, 'তা নব্বুই হবে। সেই যুদ্ধের বছরে আমার বিয়ে হলো, সে কি আজকের কথা।' এর পরেও যদি দিদিমা বেঁচে রইলেন, তখন আর বছরে দু' বছর নয়, বছরে পাঁচ বছর করে তাঁর বয়েস বাড়ানো হচ্ছে। মানে দাঁড়ালো, ভদ্রমহিলার যখন বয়েস বিরাশি তখন তার নাতি আড্ডায় গল্প করছে, 'দিদিমা তো সেঞ্চুরি করছে এই অঘ্রানে।'

আবার প্রকৃতই প্রায় শতায়ু এক রাজনৈতিক নেতার সঙ্গে আমার পরিচয় ছিলো। একবার খবরের কাগজে তাঁকে শতাব্দী প্রাচীন নেতা বলে বর্ণনা করা হয়েছিলো কি একটা উপলক্ষে। সেই সময়েই একদিন তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিলো, খুব আক্ষেপ করেছিলেন, 'খবরের কাগজ-ওয়ালাদের এসব কি বাড়াবাড়ি, আমার একশো বছর করে দিলে, আমার এই আরলি নাইনটি চলছে। দাঁড়াও, তোমাকে এনট্রান্স সার্টিফিকেটটা দেখাই।' আমি বহু কষ্টে তাঁকে শান্ত করি এই সব বলে, 'আমি ভেবে-ছিলাম আপনার বড়জোর নাইনটি হবে, দেখে তো এইট্টি সেভেনের বেশি মনে হয় না। আমি দু-একদিনের মধ্যেই খবরের কাগজে একটা প্রতিবাদ পাঠাচ্ছি।' ভদ্রলোক খুব খুশি হয়ে আমাকে খুব খাইয়েছিলেন সেদিন।

এ সব দিশি গল্প ভালই। তবু বয়েস নিয়ে নির্ভেজাল একটি বিলিতি গল্প বলি।

সাহিত্যের ক্লাশে আবেগ-গম্ভীর কণ্ঠে সেক্সপীয়র পড়াচ্ছেন অধ্যাপক। কত বড় কবি, কত মহৎ নাট্যকার, মানব চরিত্রের এমন প্রতিফলন সেক্সপীয়র ছাড়া আর কার রচনায় পাওয়া যাবে? উচ্ছ্বসিত অধ্যাপক

বলতে থাকলেন, 'আজ যদি মহাকবি সেক্সপীয়র বেঁচে থাকতেন সারা পৃথিবীর সমস্ত প্রান্ত থেকে দলে দলে লোক তাঁকে দেখতে যেতো।'

সবচেয়ে শেষের বেঞ্চিতে একটি ছেলে উঠে দাঁড়ালো। 'কিছু বলার আছে?' অধ্যাপক প্রশ্ন করলেন। ছেলেটি বললো, 'সেক্সপীয়র বেঁচে থাকলে ওঁর এখন প্রায় সোয়া চারশো বছর বয়েস হতো। লোকজন শুধু এই বয়েসের কারণেই তাঁকে দেখতে ছুটে যেতো। তার জন্যে তাঁর কবিতা-নাটক কিছুই রচনা করা দরকার ছিল না।'

হতভম্ব অধ্যাপক। হতভম্ব আমরাও। সত্যিই আজ যদি সেরাজদোল্লা বা আকবর বাদশাহ, এমনকি বিদ্যাসাগর বা রামমোহনও বেঁচে থাকতেন, কোনো ঐতিহাসিক বা সাংস্কৃতিক কারণে নয়, শুধু এতকাল বেঁচে আছেন বলেই আমরা তাঁদের দেখতে যেতাম।

ছাতা

প্রিয় মেঘনাদবাবু,

গত শনিবার রাতে খুব বৃষ্টির সময় আমাদের বাড়ি থেকে ফিরে যাওয়ার জন্যে আমাদের চাকর পাশের বাড়ি থেকে যে ছাতাটি আপনাকে চেয়ে এনে দিয়েছিলো সেই ছাতাটি পাশের বাড়ির ভদ্রলোক আজ চাইতে এসেছিলেন। ভদ্রলোক বললেন, ছাতাটি তিনি তাঁর অফিসের বড়বাবুর কাছ থেকে নিয়ে এসেছিলেন, বড়বাবুকে বড়বাবুর ভায়রাভাই খুব চাপ দিচ্ছেন ছাতাটির জন্যে, কারণ বড়বাবুর ভায়রাভাই যে বন্ধুর কাছ থেকে ছাতাটি আনেন সেই বন্ধুর মামা তাঁর ছাতাটি ফেরত চাইছেন।

দয়া করে মনে কিছু করবেন না। আমাদের নিজের ছাতা না থাকায় পাশের বাড়ি থেকে ছাতাটা ধার করে নিয়ে এসেছিলাম। তাই এই জটিলতার জন্যে আমরা নিজেরাও খুব সঙ্কোচ বোধ করছি। এই সামান্য ব্যাপারে আপনাকে নিশ্চয়ই তাগাদা দিতাম না।

ছাতাটি পত্রবাহকের হাতে ফেরত দিয়ে বাধিত করবেন। আবারো

বলছি, মনে কিছু করবেন না। এইমাত্র পাশের বাড়ির ভদ্রলোক আবার তাঁর চাকর পাঠিয়ে তাগাদা দিলেন।

ইতি

আপনাদের ঘনশ্যাম

বলা বাহুল্য, মেঘনাদবাবুর পক্ষে ছাতাটি ফেরত দেওয়া সম্ভব হয়নি। কারণ ঐ ছাতা নিয়ে পরের দিন সকালে মেঘনাদবাবুর ছেলে বাজারে যায় এবং ফেরার পথে যখন বৃষ্টি থেমে গেছে, বাজারের পাশের চায়ের স্টলে এক কাপ চা খেতে গিয়ে সেখানে ফেলে আসে। পরে অবশ্য চায়ের দোকানদার ছাতার কথা অস্বীকার করেননি কিন্তু সেদিনই দুপুরে আবার যখন বৃষ্টি আসে তখন দোকানদার মশায় সেটা মাথায় দিয়ে বাড়ি যান ভাত খেতে। বিকেলে সেই ছাতা নিয়ে দোকানদার মশায়ের ভাই খেলার মাঠে যান। খেলার মাঠ থেকে ফেরার পথে ভাইটি তাঁর বান্ধবীর বাড়ি

যান। সেখানে ছাতাটি রেখে আসেন কিন্তু এখন সেই বান্ধবীর বাড়িতে ছাতাটি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। কোথায় গেলো কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।

আমাদের এবারের গল্প ছাতার গল্প। যে তরুণী পাঠিকার সকৌতুক মুখচ্ছবির কথা ভেবে এইসব ছাইপাঁশ, উল্টো-পাল্টা লিখি সেই পাঠিকা-সুন্দরী নিশ্চয়ই এবার এই শুরুতেই খুব ক্লান্ত ও বিরক্ত হয়ে পড়েছেন।

তার চেয়ে বরং আমার নিজের ছাতার কথা বলি। প্রথমেই নিজেকে সংশোধন করে নিই, আমার নিজের কোনো ছাতা নেই, কখনোই ছিলো না। রোদ-বৃষ্টিতে চিরকাল খালি মাথায় ঘুরে বেড়িয়েছি, কোনোদিন ছাতা বা মাথার উপরে কোনো আচ্ছাদন দরকার পড়েনি। তা ছাড়া আমাদের পাগলের বংশ, ছোটবেলা থেকে ঠাকুমা-পিসিমারা বলে এসেছেন, 'সব সময়ে মাথা খোলা রাখবি, যত পারবি মাথায় হাওয়া লাগাবি, কখনো কোনো রকম ঢাকাঢুকি দিবি না।' আমরাও সেই আদেশ মেনে চলি, শুধু ছাতা কেন, টুপি, মাফলার এমনকি লম্বা চুল রাখা পর্যন্ত আমাদের বারণ।

তবু একটা কথা এখানে স্বীকার করে না নিলে গৃহে গঞ্জনা পেতে হবে। আমার বিয়েতে একটা ছাতা পেয়েছিলাম। আমার বিয়ের বরকর্তা ছিলেন আমার এক সরল প্রকৃতির স্বাধীনতা-সংগ্রামী বিপ্লবী মামা। আমার বাবা কেন যে তাঁকে বরকর্তার উচ্চপদে নিযুক্ত করেছিলেন তা বলা আমার পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু বিয়ের সামাজিক রীতিনীতি, কলা-কৌশল কিছুই তাঁর জানা ছিলো না, কারণ আমার সেই মামার আসল দিনগুলি কেটেছিলো কারাগৃহের অন্তরালে। আমাদের সঙ্গে বরপক্ষে যে নাপিত গিয়েছিলো সে তাঁকে বুঝিয়েছিলো যে বিয়েতে বরের ছাতা নাপিত পায় এবং বরকর্তা মহোদয় সরল বিশ্বাসে ছাতাটি তাকে দিয়ে দেন। ফলে আমার জীবনের সেই এক ও অদ্বিতীয় আপন ছাতাটি আমি চোখেই দেখতে পাইনি।

আমার নিজের কাছে অবশ্য এখন একটি ছাতা আছে কিন্তু সেই ছাতা আমি কিনিনি, কেউ আমাকে দানও করেনি, সেটি আমি অর্জন করেছিলাম।

মেঘলা দিন, রাস্তার মোড়ে বাসের জন্যে অপেক্ষা করছিলাম। আমার

পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলেন এক বিলিতি পোশাকে সজ্জিত ভদ্রলোক, সত্ত বিদেশাগত বহুদিন প্রবাসী সফল বাঙালী ভদ্রলোকের যেমন পরিতৃপ্ত চেহারা ও জামাকাপড় হয় ওঁরও তাই। ভদ্রলোকের হাতে ছিলো ছয় ইঞ্চি সাইজের গোল চামড়ায় জড়ানো কি একটা পদার্থ।

হঠাৎ ঝিরিঝিরি বৃষ্টি নামতে ভদ্রলোক ঐ চামড়ার মোড়ক খুলে একটা জিনিস বার করলেন, সেটা একটা কনডেন্সড ছাতা, নিচের দিকে একটা বোতামের মতো, সেটা টিপলেই ছাতাটি হুস করে খুলে যাবে। দুঃখের বিষয়, ভদ্রলোকও বুঝতে পারেন নি, আমার তো পারার কথাই নয়, এই কর্কটক্রান্তির দেশে ঐ বিলিতি শীতলতার বোতামটি কোনো কারণে অতিরিক্ত উত্তেজিত হয়ে ছিলো। ভদ্রলোক বোতামটি টেপা মাত্র ভেতরের লুকানো স্টিলের বাঁটটি ঘণ্টায় একশো কিলোমিটার বেগে বেরিয়ে এসে, আমি কিংবা সেই ভদ্রলোক কিছু টের পাবার আগে, সজোরে আমার কানের নিচের রগে আঘাত করলো। জীবনে এমন প্রচণ্ড চোট আর কখনো পেয়েছি বলে মনে পড়ে না, 'কোঁ কোঁ' করতে করতে মাটিতে পড়ে গেলাম। কয়েকজন পথচারী ছুটে এলেন, একজন কাছেব টিউবওয়েল থেকে আঁজলা কবে জল এনে চোখেমুখে ছিটিয়ে দিলেন।

আমি অবশ্য জ্ঞান হারাই নি, তবে কানের নিচে কেটে রক্ত পড়ছিলো। উঠে বসে ছাতার মালিক সেই ভদ্রলোককে কোথাও দেখতে পেলাম না। তবে ছাতাটি আমার সামনেই খোলা অবস্থায় গড়াগড়ি যাচ্ছিলো। এক ভদ্রলোক ছাতাটি তুলে আমার হাতে দিতে দিতে বললেন, 'এই সব সাংঘাতিক ছাতা ব্যবহার করে নাকি মশায়, এখনই তো মারা পড়তে বসেছিলেন।' পাশেই একজন বিজ্ঞদর্শন লোক ছিলেন, তিনি বললেন, 'এই সব ছাতাই তো বুকে ঠেকিয়ে বোতাম টিপে দিয়ে জাপানিরা আত্মহত্যা করে। আজকাল তো হারিকিরিতে ছোরা ব্যবহার উঠেই গেছে, সবাই ছাতা ব্যবহার করছে।'

যে ভদ্রলোক ছাতাটি আমার হাতে তুলে দিচ্ছিলেন হঠাৎ হাতলের সেই বোতামের জায়গায় তাঁর হাতের চাপ পড়াতেই বোধহয় ছাতাটি

হঠাৎ ফরফর করে উঠলো, আসলে ছাতাটি তখনো পূর্ণ বিকশিত হয় নি। সদ্য বিকচোন্মুখ অবস্থায় তাকে ফেলে মালিক পালিয়েছেন, এইবার দ্বিতীয় ভদ্রলোকের কল্যাণে ছাতাটি সহসা পরিপূর্ণ আকার ধারণ করলো।

ফরফর শব্দ করে ছাতাটি পুরো খুলে আসতেই যে ভদ্রলোকের হাতে ওটা ধরা ছিলো তিনি লাফিয়ে উঠে ছাতাটি ছেড়ে দিলেন, ছাতাটির বিকাশ এবং ছত্রধারীব উল্লম্ফন দেখে বাকি যারা আমার সাহায্যে এসেছিলেন তাঁরা কি এক অজ্ঞাত আশঙ্কায় আর্তনাদ করে সবাই দশ-বারো হাত পিছিয়ে গেলেন। মুক্ত বিহঙ্গের মতো খোলা ছাতাটি বাদলে হাওয়ায় প্রায় উড়তে যাচ্ছিলো, আমি খপ করে সেটার হ্যাণ্ডেল চেপে ধরলাম। এবার আর ছাতাটি কোনো বিরুদ্ধাচরণ করলো না। ফিসফিস ও মৃদু গু ঃ উঠলো অদূরবর্তী ভিড়ের মধ্যে, সেখান থেকেই কে একজন বললো, 'দাদার সাহস আছে বটে।'

যেখানে যাচ্ছিলাম, যাওয়া হলো না। বৃষ্টিও নেমেছে, জীবনে প্রথমবাব ছাতা মাথায় দিয়ে বাড়ি ফিবে এসে কানের নিচে ডেটল লাগালাম।

তবে ছাতাটি বন্ধ করার চেষ্টা করিনি। ঐ মুক্ত অবস্থাতেই বাইরের ঘরে আছে। আমাব ছেলে বলেছে তার এক সহপাঠিনীর জামাইবাবু নাকি টোকিয়োতে থাকেন। কয়েকদিনের মধ্যেই কলকাতা আসছেন। সেই জামাইবাবু ভদ্রলোককে একদিন নিমন্ত্রণ করে বাসায় এনে তাঁকে দিয়ে ছাতাটা বন্ধ করানোর চেষ্টা করতে হবে।

র‍্যাডিস উইথ মোলাসেস

কেউ হয়তো বিশ্বাস করবেন না কিন্তু সত্যের খাতিরে আমাকে স্বীকার করতে হবে যে আমার এই সামান্য সাহিত্য-জীবনে গদ্য লেখা আমি আরম্ভ করেছিলাম 'রন্ধন প্রণালী' দিয়ে।

সে বড় দুঃখের কাহিনী। আমি তখন (এমন কি এখনো) রান্নার র

পর্যন্ত জানি না। আমি নিতান্ত অর্থলোভে এই কাজ করতে বাধ্য হয়েছিলাম। তখন দৈনিক কাগজের রবিবাসরীয়তে নিয়মিত 'রন্ধন প্রণালী', যেমন মানকচুর কাটলেট কিংবা সজনের চাটনি এই জাতীয় বিচিত্র খাদ্য প্রস্তুতের প্রক্রিয়া, প্রকাশিত হতো। আমি কি করে কোথায় যেন শুনে-ছিলাম যে প্রতিটি রন্ধনপ্রণালীর জন্যে পাঁচ টাকা করে দেওয়া হয়।

তখন পাঁচ টাকার অনেক দাম। চার্মিনার সিগারেট প্রতি প্যাকেট পুরনো সাত পয়সা, বড় দোকানে পাঁচ প্যাকেট একসঙ্গে পাইকিরি দাম আট আনা। তার মানে পাঁচ টাকা ছিলো পঞ্চাশ প্যাকেট সিগারেটের সমান। সুতরাং পাঁচ টাকার জন্য লোভ করা নিশ্চয় খুব অন্যায় ছিলো না। তখন কি যে টাকার টানাটানি ছিলো, সে শুধু ঈশ্বর জানেন আর জানেন কয়েকজন সুহৃদ যাঁদের সেই সময়ের ঋণ এখনো পর্যন্ত শোধ করা হয় নি। আর এখন শোধ দেবোই বা কি করে, পঁচিশ বছর পরে তো দশ

আনা পয়সা কিংবা উনিশ শো ষাট সালের একটা ডাবল ডিমের ওমলেটের দাম শোধ দিতে গেলে তারা চমকে উঠবে, ভাববে নতুন কোনো উদ্দেশ্য আছে। আর তাঁদের সবাইকে খুঁজে বার করতে গেলে দিশেহারা হয়ে যাবো, শুধু মর পৃথিবীতে নয়, স্বর্গ-মর্ত্য-নরক তোলপাড় করতে হবে।

সে যা হোক, মোদ্দা কথা হলো কোনো অভিজ্ঞতা ছাড়াই শুধুমাত্র টাকার জন্যে রন্ধনপ্রণালী রচনার অসাধু কর্মটি আমি করেছিলাম। তবে কাজটা ছিলো খুব সোজা।

বটতলার প্রকাশিত 'সচিত্র রন্ধন প্রণালী' নামে একটি চমৎকার বই, মাত্র এক টাকা কি দেড় টাকা মূল্য, কালীঘাট মন্দিরের সামনে যেখানে শনির পাঁচালি, লক্ষ্মীর ব্রতকথা ইত্যাদি বিক্রি হয়, সেখান থেকে কিনেছিলাম। আশ্চর্যের বিষয় বইটি কোনো মহিলা লেখেন নি, কোনো পাচক ঠাকুরও নন। বইটি লিখেছিলেন দামোদর ধর কিংবা ঐ রকম নামের এক ভদ্রলোক। বইটির রঙীন মলাটে অবশ্য জনৈকা রন্ধনরতা মহিলার ছবি ছিলো যিনি একটি বিশাল কড়াইতে আস্ত একটি রুইমাছ (আঁশ সমেত) ভাজছেন কিংবা সাঁতলাচ্ছেন।

ডাল, ভাত, ভাজা ইত্যাদি বিষয় থেকে শুরু করে এঁচড়ের মুড়িঘণ্ট, পেঁপের হালুয়া পর্যন্ত একশো আটটি রান্নার পদের বর্ণনা ছিলো এই শ' দেড়েক পাতার গ্রন্থে।

আমার কাজ ছিলো একেবারে পরিষ্কার। বইটি থেকে যে কোনো একটি পদ বেছে নিয়ে শুধু ব্যবহৃত বস্তুগুলোর নাম বদলিয়ে দিতাম। সঙ্গে থাকতো সুললিত ভাষা, যেটা আমার নিজের সংযোজন। যেমন ধরা যাক, পটলের কোর্মা বানানোর পদ্ধতি ছিলো বইটিতে। আমি লিখলাম কুমড়োর কোর্মা। লেখা ছিলো আধসের পটল, আধ পোয়া তেল। আমি করে দিলাম তিন পোয়া কুমড়ো, আর খাদ্যটি সুস্বাদু করার জন্যে তেলের বদলে তিন ছটাক ঘি।

দু-চারটি লেখার পরে শেষের দিকে সাহস বেড়ে গেলো, তখন ঐ দামোদরবাবুর বইটির সাহায্য ছাড়াই নিজের বুদ্ধিমত নিত্য নতুন খাদ্য

কল্পনা করতাম। সব সময় সব লেখা ছাপা হতো না। তবে এখনো আমার কাছে দু-একটা পেপার কাটিং রয়েছে, তাতে দেখছি ঢ্যাড়সের মালাইকারি ও বেগুনের বোঁটার চাটনি রয়েছে।

বেগুনের বোঁটার চাটনি বলতে গিয়ে মনে পড়লো তখন আমি এতটা প্রতিক্রিয়াশীল ছিলাম না, গরীবদের কথা ভাবতাম। ফেলে দেওয়া বেগুনের বোঁটা, দুটো কাঁচলঙ্কা, একটু নুন আর একটা তেঁতুল দিয়ে আমি যে চাটনির নির্দেশ দিয়েছিলাম সেটা খেয়ে কতজন গরীব গৃহস্থ তৃপ্ত বা আহ্লাদিত হয়েছিলেন তা বলতে পারবো না কিন্তু শেষাশেষি আমি খুব বিপদে পড়েছিলাম।

আমি রন্ধন প্রণালীর লেখাগুলো পাঠাতাম আমার নামের মধ্যপদ লোপ করে তারা রায় নামে। ছোটবেলায় মেয়েদের ইস্কুলে হাতেখড়ি, আমার হাতের লেখাও একটু মেয়েলি ধরনের হেলানো, ফলে সম্পাদক মহোদয় খুব সম্ভব আমাকে কোনো প্রবীণা, রন্ধন পটিয়সী সুগৃহিণী ভেবে নিয়েছিলেন। ভালোই ছাপা হচ্ছিলো দু-চারটে লেখা কিন্তু কাঁচা টোপাকুলের পায়েস পাঠানোর পর একটি ছোট পোস্টকার্ড পাঠিয়ে রবিবাসরীয় সম্পাদক মহোদয় ডেকে পাঠান। আমাকে দেখে, আমার কথা শুনে সেই প্রবীণ ভদ্রলোকের কি প্রতিক্রিয়া হয়েছিলো সেটা লেখা আমার পক্ষে মোটেই সম্মানজনক নয়। সোজা কথা, রন্ধন প্রণালী রচনার সেখানেই ইতি।

রন্ধন প্রণালী রচনার সময়ে দু-একবার সততার স্বার্থে যে জিনিস লোককে খেতে বলেছি তা নিজে বানিয়ে খাবার চেষ্টা করেছি। কিন্তু সে এক অসম্ভব চেষ্টা। উনুন ছাড়া তো রান্না করা যাবে না। আমি তখন একা থাকি, বাইরে খাই। তবু একটা মাটির উনুন কিনে নিয়ে এলাম এবং বহু দুঃখের মধ্যে আবিষ্কার করলাম কয়লার উনুন ধরানো পৃথিবীর কঠিনতম কাজ। আমার দুঃখের কথা শুনে একজন জনতা স্টোভ কেনার কথা বললেন। তখন সদ্য জনতা স্টোভ বেরিয়েছে, কিনে দেখলাম জনতা স্টোভ জ্বালানো তেমন কঠিন নয়, কিন্তু নেবানো অসম্ভব। কয়লার উনুন

ধরানোর চেয়ে জনতা স্টোভ নেবানো শতগুণ কঠিন। অবশ্য ইলেকট্রিক হিটার বা গ্যাস চেষ্টা করে দেখতে পারতাম কিন্তু সে সঙ্গতি ছিলো না। তা ছাড়া পাঁচ টাকার জন্যে কেউ এত খরচা করে না।

আমি আর কখনোই রান্না করার চেষ্টা করে দেখিনি। পারতপক্ষে রান্নাঘরের ভিতরে প্রবেশ করি না। সে খুবই বিপজ্জনক জায়গা। যত দূর মনে পড়ে বছর কুড়ি আগে শেষবার ঐ নিষিদ্ধ পৃথিবীতে প্রবেশ করেছিলাম।

কারণটা খুব সামান্য ছিলো না।

তখন শনিবার দেড়টার সময় আমাদের অফিস ছুটি হতো। এই রকম এক শনিবারে ছুটির আধঘণ্টা খানেক আগে আমার এক বন্ধু তিনটি সাহেব যুবক এবং এক মেম যুবতীকে আমার অফিসে নিয়ে এলেন। এঁদের সঙ্গে আমার বন্ধুটির সদ্য আলাপ হয়েছে। ছেলেমেয়ে চারজনই নিউইয়র্কের, অল্প কিছুদিন আগে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়েছে। নানা জায়গা ঘুরতে ঘুরতে কলকাতা এসে পৌঁছেছে। কালীঘাট দেখবে। আমার কালীঘাটে বাড়ি, বন্ধু ভদ্রলোক সেই জন্যে আমার কাছে ওদের নিয়ে এসেছে, যদি আজ বিকেলে ওদের কালীঘাট ঘুরিয়ে দেখাই খুবই ভালো হয়। এই সব বলে বন্ধুটি এই চারজনকে আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে চলে গেলেন।

দেড়টার সময় রাস্তায় নামলাম। দেখি ওরা নিজেদের মধ্যে কি সব চাপা ফিসফা আলোচনা করছে। একে ইংরেজি, তার উপরে মার্কিনী উচ্চারণ, তার উপরে ফিসফাস কিছুই বুঝতে পারলাম না। বাধ্য হয়ে আমার বাঙাল ইংরিজিতে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কি ব্যাপার?' কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলার পর বুঝতে পারলাম, ওরা হাংরি, ক্ষুধার্ত। কোথাও খেয়ে নিয়ে তারপর কালীঘাট যেতে চায়। আমি বোঝালাম, কালীঘাটেই আমার বাড়ি, আমাদের বাড়িতেই কিছু না কিছু খাবার আছে, চলো গিয়ে দেখা যাক।

এইখানেই আমার ভুল হয়েছিলো। সেই দিন সকালেই আমার

কিঞ্চিৎ নবোঢ়া পত্নীর সঙ্গে তাঁর বন্ধুদের এবং আমার বান্ধবীদেব একটি দীর্ঘ তুলনামূলক আলোচনা করেছিলাম। তখন বুঝতে পারিনি, বাড়ি ফিরে টের পেলাম; আমাদের কালীঘাট বাড়ির আট বাই নয় ছোট ঘবেও চাবটি সাহেব-মেম দেখে তিনি একবারও লেপের নিচ থেকে বেরিয়ে এলেন না।

প্রসঙ্গত, উল্লেখ কবা উচিত, সেটা ছিলো শীতকাল। কলকাতার সেই অসামান্য সময়। দু-তিনবার বৃথা চেঁচামেচির পর আমি বুঝলাম আজ যদি এই সাদা অতিথিদের খাওয়াতে হয় তার বন্দোবস্ত আমাকেই করতে হবে। অনেক রকম ভাবনা-চিন্তার পরে সাহেব-মেমদেব বারান্দায় বসিয়ে, আমি রান্নাঘবেব রহস্যময় পৃথিবীতে প্রবেশ করলাম।

রান্নাঘরে ঢুকে প্রথমেই দরজার পাশে দেখলাম একটা বিরাট গোল হাঁড়ি। মনে পড়লো, আমার দিদিমা মাস দুয়েক আগে এই গুড়ের হাঁড়িটা পাঠিয়েছিলেন। হাঁড়িটার অভ্যন্তরে উঁকি দিয়ে দেখলাম এখনো হাঁড়িটার গায়ে কিছু গুড় লেগে আছে। এর পরে তরকারির ঝুড়িতে উঁকি দিলাম, সেটা ঐ গুড়ের হাঁড়ির পাশেই।. দেখলাম প্রায় কিছুই নেই। কিন্তু গত এক সপ্তাহ ধরে এক আনা জোড়া যত মুলো কিনে এনেছি সব সেই ঝুড়িতে। বুঝতে পারলাম আমার স্ত্রী মুলো পছন্দ করেন না, তাই এই অবস্থা।

এরপরে আমার একটু পরিশ্রম। মুলোগুলো কুচি কুচি করে কাটলাম। সাত দুগুণে চোদ্দটা মুলো, অনেক হলো। এর পরে সেই কুচি মুলো গুড়ের হাঁড়িতে ঢেলে খুব মাখামাখি করলাম। তারপর বিয়েতে উপহার পাওয়া ডিনার সেট থেকে চারটে প্লেট বার করে সমান ভাগ করে সেই মুলোগুড় সাহেব-মেমদের গিয়ে দিলাম, বললাম, 'র‍্যাডিস উইথ মোলাসেস, এ বেঙ্গলি ডেলিকেসি।' সেই নিউ ইয়র্কীয় যুবক-যুবতীরা এত আনন্দ করে এই আশ্চর্য খাবার খেলো তা বলার নয়। তারা আজও আমাকে ভোলেনি। প্রত্যেক বছর বড়দিনে এখনো আমাকে শুভেচ্ছা পাঠায়। সেই চারজনের মধ্যে একজন, ঐ মেম-ললনাটি নিউইয়র্কের এক গলিতে

একটি রেস্তোরাঁ করেছে। সেই রেস্তোরাঁর খাদ্য তালিকায় ইণ্ডিয়ান একসোটিক ফুডের মধ্যে সবচেয়ে বেশি চলছে মুলো-গুড়, 'র‍্যাডিস উইথ মোলাসেস।'

স্বপ্ন নিয়ে

কার বউ যেন হঠাৎ শেষ রাতে ঘুম থেকে উঠে পাশে শায়িত এবং নিদ্রিত স্বামীকে হঠাৎ দুমদাম মেরেছিলেন। স্বামীরা নানা রকম দোষ করে থাকেন, স্ত্রীরা তাঁদের যথাসাধ্য পেটান, মারধোর করেন, এ সব নতুন কিছু নয়। কিন্তু এই ক্ষেত্রে পতিদেবতা বেচারার কোনো দোষ ছিল না। তিনি তো ঘুমিয়েই ছিলেন কিন্তু তাঁর স্ত্রী ঘুমের মধ্যে একটা স্বপ্ন দেখে

ফেলেছেন যে স্বামী ভদ্রলোক অন্য কোন একটি মেয়েকে খুব ভালো-বাসছে, আদর-টাদর করছে ইত্যাদি। রাগে, হিংসায় ভদ্রমহিলার ঘুম ভেঙে যায়, তারপর উত্তেজিত ভাবে স্বামীকে প্রহার করতে থাকেন। নিদ্রাচ্যুত, হতভম্ব প্রহৃত স্বামী যত জানতে চান 'কি হয়েছে, কি হয়েছে, কি করলাম আমি?' স্ত্রী তত কিলোতে থাকেন আর চেঁচাতে থাকেন, 'ঐ রোগা, কালো, শাকচুন্নির মত পেত্নীটা কে?'

এ প্রশ্নের স্বামী বেচারী কোনো উত্তর দিতে পারেন নি। পারা সম্ভবও নয়। একজনের স্বপ্ন একজনেই দেখে, আরেক জনের পক্ষে সেটা দেখা সম্ভব নয়। স্বামী কি ক'রে জানবেন স্ত্রী মহোদয়া কি স্বপ্ন দেখেছেন, খুব কাছাকাছি এক বালিশে মাথা দিয়ে ঘুমোলেও সম্ভব নয়। আরেকজনের স্বপ্ন তিনি দেখতে পারবেন না।

এই দিক থেকে স্বপ্ন হলো প্রকৃত অর্থে ওয়ান ম্যান শো, একক প্রদর্শনী। এই একক প্রদর্শনীর দর্শক ও শিল্পী শুধুই একজন, একই জন।

স্বপ্ন আসে আবছা, তরল ঘুমের মধ্যে। ভালো, গভীর ঘুমে স্বপ্নের কোনো স্থান নেই। সাহেবরা যে শুভ রাত্রি বা গুড নাইট জানিয়ে অনেক সময় বলেন, 'আপনার সুনিদ্রা হোক, মধুর স্বপ্ন দেখুন', এই শুভ কামনাটি অর্থহীন, কারণ ভালো ঘুম হলে আর মিষ্টি স্বপ্ন হবে না।

ভালো ঘুম সবাই চায়। ঘুমের চেয়ে শান্তি আর কিছুতেই নেই। কিন্তু শেষ রাতে যখন আকাশে আলো-আঁধারির ছোঁয়া, যখন ঘুম হালকা, আবছায়া হয়ে এসেছে, তখন দু-একটা মধুর স্বপ্ন দেখতে ভালোই লাগে। মধুর স্বপ্নের একটা নেশা আছে, বার বার ঘুরে ফিরে আসবে।

বিরাট ফাঁকা মাঠের মধ্যে একটা অচেনা গাছ, হু হু করে হাওয়া বইছে, ঝরা পাতা উড়ছে মাঠের ওপরে, গাছটির নিচে এলোচুলে বাঙালী ঢঙে শাড়ি পরা একটি পাহাড়ী মেয়ে কাঁচি দিয়ে একটা কালো ভেড়ার লোম কাটছে, আমি কি জন্যে যেন সেখানে গিয়েছি, ভেড়াটা আমাকে চিনতে পেরেছে, আমাকে দেখে একটু মৃদু ব্যা করল, মেয়েটিও কেন যেন চিনতে পেরেছে, সে চোখের ঝিলিকে মৃদু হাসল, দূরে পাহাড়ের সারি দেখা যাচ্ছে।

উপরের এই বর্ণনাটি যতই হাস্যকর হোক, এটি আমার একটি পুরনো স্বপ্ন। একটু-আধটু পরিবর্তিত হয়ে, কখনো কিছুটা সংক্ষিপ্ত আকারে, আবার কখনো কিছুটা বর্ধিত হয়ে নানা এডিশনে কখনো পেপার ব্যাক, কখনো বোর্ড বাউণ্ড অবস্থায় এই স্বপ্নটি আমার কাছে আসে। অনেকদিনের পুরনো, পোষা স্বপ্ন, এই স্বপ্নটার উপর আমার একটু মায়া পড়ে গেছে।

একবার কথায় কথায় এই স্বপ্নটি আমার এক বিখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদ বন্ধুকে বলেছিলাম। আরে সর্বনাশ, তিনি যা ব্যাখ্যা দিলেন তাতে বুঝলাম আমার মতো দুশ্চরিত্র, বদমাস, পাপচিন্তার ব্যক্তি ভূ-ভারতে নেই। শুধু আমি নই, আমার উর্ধ্বতন পিতৃকুল ও মাতৃকুলের চৌদ্দ পুরুষ ও চৌদ্দ রমণীর মনে যত রকম নিরুদ্ধ কামনা-বাসনা ছিল, যত রকম বদমায়েসি তাঁরা করেছেন, করতে চেয়েছেন, করতে পারেন নি, যত রকম দুষ্কর্ম আমি করেছি, করতে চেয়েছি, করতে পারিনি—তার সম্পূর্ণ ক্যাপস্যুল, মাদার টিংচার এই মধুর স্বপ্নটি।

সে যা হোক, আধুনিক ব্যাখ্যা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই, স্বপ্ন কিন্তু খুব পুরনো ব্যাপার। সেই উপনিষদ, রামায়ণ-মহাভারত থেকে স্বপ্নের কথা চলে আসছে। রূপকথার গল্প, ঠাকুরমার ঝুলি, লোক-কাহিনী, এমন কি গোপাল ভাঁড়ের মোটা দাগের মজার গল্পে স্বপ্নের ছড়াছড়ি। সব ভাষাতেই স্বপ্ন নিয়ে অনেক বই। স্বপ্ন জিনিসটা যে ভালো বিক্রি হয়, তার উজ্জ্বল প্রমাণ বোম্বের হিন্দি সিনেমা। ড্রিম সিন বা স্বপ্নের দৃশ্য, আলুলায়িত বসনে স্খলিতচরণা নৃত্যপরা নায়িকা, পনেরো মিনিটের এই সিন না থাকলে কোনো প্রডিউসার বই করতে নামবেই না।

একজন অতি বিখ্যাত আধুনিক লেখক কিছুদিন আগে একটা লিটল ম্যাগাজিনে বলেছেন যে তাঁর অনেক গল্পের সূত্র তিনি স্বপ্নের মধ্যে পেয়েছেন। এটা কিন্তু খুব অস্বাভাবিক নয়। কারণ একজন সৃজনশীল লেখক যখন ঘুমোতে যাচ্ছেন, তিনি তাঁর চিন্তাগুলোকে তাঁর সঙ্গে বিছানায় নিয়ে যাচ্ছেন, ঘুম যখন তরল হয়ে আসবে তখন তন্দ্রার আবছায়ায় সেই ভাবনাগুলো ফিরে আসবেই।

কলেরিজ সাহেবের সেই বিখ্যাত কবিতা কুবলা খান সম্পর্কে গল্প অনেকেরই জানা। কবি স্বপ্নে এই কবিতাটি পেয়েছিলেন। একদিন বিকেলে তিনি কুবলা খানের উপরে লেখা একটি বই পড়ছিলেন। পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েন। ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন, স্বপ্নের মধ্যে কবিতা। পঙক্তির পর পঙক্তি একেবারে সাজিয়ে আসতে লাগল। কলেরিজ স্বপ্নের মধ্যে উঠে কলম ধরলেন, বিনা পরিশ্রমে তর তর করে কবিতা বেরোতে লাগল। শব্দের পর শব্দ, উজ্জ্বল শব্দময় বর্ণাঢ্য কবিতা। দুঃখের বিষয়—এ অবস্থায় তিনি কবিতাটি শেষ করতে পারেন নি। বেশ কিছুটা লেখার পরে হঠাৎ দরজায় টোকা পড়ে, একজন কলেরিজের কাছে দেখা করতে আসে। কলেরিজ এর পরে আবার লিখতে বসে দেখেন, আবেগ কেটে গেছে, স্বপ্নদত্ত কবিতা আব কলমে আসছে না। অথচ তাঁর মনে আছে, যে পর্যন্ত লিখেছেন তার চেয়ে আরো অনেক বড় ছিল স্বপ্নের কবিতাটি। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, এইটিই কলেরিজের বহু পরিচিত, সেই কুবলা খান কবিতা।

আরেকটি বিখ্যাত স্বপ্ন, সেটি অবশ্য হাসির নয়। স্বপ্নটি আব্রাহাম লিঙ্কনের। আব্রাহাম লিঙ্কন এক রাতে একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙে জেগে ওঠেন। স্বপ্নে লিঙ্কন দেখেছিলেন যে তাঁর ঘরে সাদা চাদর দিয়ে ঢাকা একটা শবদেহ রয়েছে এবং তার চার পাশে তাঁরই সব চেনাশোনা লোক। লিঙ্কন ভিড় ঠেলে এগিয়ে গিয়ে শবদেহের উপর থেকে সাদা চাদরটি তুলে নিলেন, তুলে চমকে উঠলেন, চাদরে আচ্ছাদিত শবটি তাঁর নিজেরই মৃতদেহ। স্বপ্নের ঘটনাটি লিঙ্কন অনেককে বলেছিলেন। এক সপ্তাহের মধ্যে স্বপ্নটি পুরোপুরি বাস্তব হলো। লিঙ্কন আততায়ীর হাতে নিহত হলেন। সেই স্বপ্নে দেখা ঘরে সাদা চাদর দিয়ে তাঁর শবদেহটি স্বপ্নের মতই ঢেকে রাখা হলো, চার পাশে চেনাশোনা লোকের ভিড়।

স্বপ্ন সত্যি হয় কি না? কি করে হয়? সে ভারি জটিল বিষয়। কিন্তু স্বপ্নকে অনেকে ব্যবহার করে। আমি স্বপ্নদত্ত মাদুলি বা হাঁপানির মহৌষধের কথা বলছি না। ফসিলি নামে একজন শিল্পী ছিলেন, তার খ্যাতি ছিল যত রকম ভয়ঙ্কর, বীভৎস ছবি আঁকার। আর এই সমস্ত ছবির উৎস

ছিল তাঁর দুঃস্বপ্ন। তিনি দুঃস্বপ্নের সাধনা করতেন, রাতে শোবার সময় আধাসেদ্ধ মাংস, কাঁচা তরকারি এই সব হাবিজাবি, যা খেলে পেট গরম হয়, তাই ভরপেট খেয়ে শুতেন। চমৎকার সব দুঃস্বপ্ন তারপর তাঁর ঘুমের মধ্যে এসে হানা দিতো। তখন সেই দুঃস্বপ্নের ছবি আঁকতেন তিনি।

অন্যের স্বপ্ন অনেক হলো। এবার আমার নিজের স্বপ্ন দিয়ে শেষ করি।

আমার বন্ধু তাঁর বাড়িতে একটি সুন্দর ছোট কুকুর পুষেছেন। ধবধবে সাদা লোমওয়ালা কুকুর দেখলেই আদর করতে ইচ্ছে করে, আর আমি নিজেও কুকুর খুব ভালোবাসি। এই ছোট কুকুরটি কিন্তু মারাত্মক। বেশ কোলে উঠে লেজ নাড়ছে, হঠাৎ কুট করে কামড়ে ধরল, আর সেই ক্ষুদ্র সূচীমুখ দন্তের সে কি নিদারুণ তীক্ষ্ণ দংশন। আমাকে কোনো কুকুর কখনো কামড়াবে আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। এই সুইটি নামের ছোট কুকুরটি বাঁ হাতের কবজি কামড়ে ধরে আর ছাড়তে চায় না, কোনো রকমে গলা টিপে ছাড়ালাম, তখন হাত দিয়ে দর দর করে রক্ত ঝরছে।

সেই দিন রাত্রে আমি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে স্বপ্নে দেখলাম। দীর্ঘ শ্মশ্রু, ঋষি-দর্শন মহাপুরুষ আমার সামনে দাঁড়িয়ে হাত তুলে আমাকে বলছেন, 'মুর্খ, জানো না, কুকুর যতই ক্ষুদ্র হউক তাহার দংশন করিবার ক্ষমতা থাকে।'

ঘড়ি

ঘড়ি হারায় নি বা ঘড়ি চুরি যায়নি, জীবনে ঘড়ি খোয়ানোর একটি ঘটনাও ঘটেনি এমন খুঁজে পাওয়া খুব সোজা নয়। ঘড়ি যেমন ভেতরে ভেতরে চলে এবং সময় দেয়, সেই রকম বাইরে বাইরেও চলে এবং একজনের কাছ থেকে অবলীলাক্রমে আরেকজনের কাছে চলে যায়।

আমি জীবনে এখন পর্যন্ত অন্তত পাঁচ-সাতটি ঘড়ি হারিয়েছি এবং প্রায় প্রত্যেকটিই চুরির ঘটনা। শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে ঘড়ির ডায়ালে যেখানে সুইস মেড, শক প্রুফ ইত্যাদি লেখা থাকে, সেখানে পয়সা খরচ করে

'স্টোলেন ফ্রম তারাপদ রায়' (Stolen from Tarapada Roy) লিখে নিয়েছি। এতে চুরি যাওয়ার সম্ভাবনা কিছু কমেছে এমন নিশ্চয় নয়, কিন্তু যে চুরি করবে সে বেচতে গিয়ে বেকায়দায় পড়বে এই আনন্দে আছি।

ঘড়ির কথা আরম্ভ করে প্রথমেই ঘড়ি চুরির ব্যাপার বলে ফেললাম বোধ হয় মনের মধ্যে এ বিষয়ে বেদনা বহমান বলে। তবে আমার সব ঘড়িই যে চুরি হয়েছিলো তা নয়। আমার একটা ঘড়ি হনুমানে নিয়ে গিয়েছিলো।

তখন আমি থাকতাম এসপ্ল্যানেড অঞ্চলের একটা গলিতে, ভীষণ হনুমানের উৎপাত ছিলো এই অঞ্চলে সেই সময়, সেই পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন সালে। এখন আর ওসব এলাকায় হনুমান দেখা যায় না। সব বিদেশে চালান হয়ে গেছে।

হনুমানের উৎপাতে আমরা অধিকাংশ জিনিসপত্র টেবিলের ড্রয়ারের

ভিতরে কিংবা আলমারির মধ্যে রাখতাম। সেদিন কি একটা তাড়াতাড়িতে টেবিলের উপরে আমার প্রায় আনকোরা ঘড়িটা রেখে ঘরের বাইরে গেছি, হঠাৎ হনুমানটা জানলা দিয়ে লাফিয়ে ঢুকে আমার সেই ঘড়িটা আর একটা ডায়েরি মতন খাতা নিয়ে ছুটে পালিয়ে যায়। ঐ ডায়েরি মতন বস্তুটি ছিলো আমার প্রথম কবিতার খাতা। হনুমানটি বাংলা সাহিত্যের অশেষ উপকার করার চেষ্টা করেছিলো এ বিষয়ে সন্দেহ নেই, তবে আমি দমে যাইনি। এক সপ্তাহের মধ্যে শুধু হনুমানের উপরেই 'ওগো শাখামৃগ' নামে এক খাতা কবিতা লিখেছিলাম।

ঘড়িটা উদ্ধার করার যথেষ্ট চেষ্টা করা হয়েছিলো। আমার ছোট মেসোমশাই ছঁদে পুলিশকর্তা। তখনো লালবাজারে স্নাচিং স্কোয়াড হয়নি। তিনি অ্যান্টি-রাউডি এবং অ্যান্টি-রবার শাখার দুই-দুই চারজন সেপাইকে ভার দিয়েছিলেন ঘড়িটি উদ্ধার করার জন্যে। হনুমানটি কিন্তু ঘড়ি হাতছাড়া করেনি। মাঝে মাঝেই দেখা যেতো এ-বাড়ির ছাদে, ও-বাড়ির দেয়ালে গভীর অভিনিবেশ সহকারে ঘড়িটি কানের কাছে ধরে টিকটিক শব্দ শুনছে। চব্বিশ ঘণ্টার পরে চাবি না দেওয়ায় ঘড়িটির দম নিশ্চয় বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো। তখনো দেখতে পেতাম হনুমানটি শক্ত মুঠিতে ঘড়িটি ধরে কানের কাছে নিয়ে খুব ঝাঁকি দিচ্ছে।

ঐ বন্ধ ঘড়িটা কিন্তু হনুমানের খুব উপকারে লেগেছিলো। আমি নিজে দেখেছি লোকে ওকে কলাটা-মুলোটা খাওয়াতো ঐ ঘড়িটা হাতাবার জন্যে। কিন্তু সে সুবিধে কারো হয়নি। হনুমান একটি শতাব্দী-প্রাচীন সহকার তরুর উচ্চতম কাণ্ডশীর্ষে ঘড়িটি রেখে তবে নিচে কলা খেতে আসতো।

একবার সেপাইরা ঐ রকম এক সময়ে ঐ গাছের উপরে উঠে ঘড়িটি খুঁজে আনতে গিয়েছিলো। ব্যাপারটা টের পাওয়া মাত্র দুই লাফে হনুমানটি গাছে ফিরে যায় এবং সবচেয়ে আগে যে সেপাইটি উঠছিলো তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং আশ্চর্য যে, সে সেই সেপাইটির হাতে যে হাতঘড়িটা ছিলো সেটা ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে। তখন সেপাইরা আমার

ঘড়ি আর উদ্ধার করবে কি, নিজেদের ঘড়ি রক্ষা করতেই ব্যস্ত।

এরই পরে হনুমানটির নামকরণ হয়। ঘড়িয়াল হনুমান নামে ঐ জন্তুটি আমাদের এলাকায় রীতিমত বিখ্যাত হয়ে উঠেছিলো। অনেকের ধারণা হয়েছিলো, হনুমানটির দৈবশক্তি আছে, সে সময় বলতে পারে। লোকে তাকে একটা কলা খাইয়ে হিন্দিতে জিজ্ঞাসা করতো, 'কেয়া হনুমানজী, সাড়ে পাঁচ বাজ গিয়া ?' কেন যে বাঙালীরা পর্যন্ত হনুমানের সঙ্গে হিন্দিতে কথা বলতো তা আমি বলতে পারবো না। কিন্তু কলা দিয়ে এ রকম প্রশ্ন করলেই হনুমানটি যে কোনো একদিকে ঘাড় নাড়াতো, লোকে বলতো, 'দেখো, হনুমানজী বোল্‌তা হায় সাড়ে পাঁচ বাজ গিয়া।'

ঘড়ির কথা বলতে গিয়ে হনুমানের গল্প করে বসলাম। আসল গল্পটাই বলা হয়নি। গল্পটা পুরনো, পড়বার পরে যাঁদের মনে হবে গল্পটা তিনিও জানতেন, দয়া করে মনে মনে হাত তুলবেন, আমিও তাঁদের মনে মনেই রসিক চূড়ামণি উপাধি দেবো।

আমার এক বন্ধুর একটা পুরনো দেয়াল ঘড়ি খারাপ হয়ে গিয়েছিলো। কালো মেহগনি কাঠের ফ্রেমে বিরাট গ্র্যাণ্ডফাদার ক্লক। সেটা সে সারাতে নিয়ে যাচ্ছিলো ঘড়ির দোকানে। আমরা দুজনে গল্প করতে করতে যাচ্ছিলাম, একটু অন্যমনস্ক ছিলাম। তা ছাড়া সন্ধ্যার সময়, হাজরার মোড়, লোকজন গিজগিজ করছে। এক মধ্যবয়স্কা ভদ্রমহিলা উল্টোদিক থেকে আসছিলেন। তিনিও নিশ্চয় খেয়াল করেন নি, হঠাৎ তাঁর মাথাটা ঠুকে গেলো আমার বন্ধুর হাতে উঁচু করে ধরা দেয়াল ঘড়িটার কাঠের ফ্রেমে।

আচমকা আহত হয়ে মাথা তুলে তাকিয়েই মহিলা দেখেন ঐ অত বড় একটা ঘড়ি। তিনি হয়তো কোথাও শিক্ষয়িত্রী-টিক্ষয়িত্রী হবেন, সে কি রাগারাগি শুরু করলেন আমাদের উপরে, 'হাতঘড়ি ব্যবহার করতে পারেন না ? এত বড় একটা ঘড়ি হাতে করে রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন !' যত বোঝাতে যাই, ঘড়ি সারাতে নিয়ে যাচ্ছি, কে শোনে কার কথা।

ঘড়ির সম্পর্কে সবচেয়ে গোলমেলে ব্যাপারটি ছিলো গোপাল ভাঁড়ের

বইয়ের মলাটে। গোপাল ভাঁড়ের আমলে অবশ্যই ঘড়ি ছিলো না, ঘড়ি নিয়ে তাঁর কোনো রসিকতাও মনে পড়ছে না। কিন্তু 'সচিত্র গোপাল ভাঁড়' বইয়ের পুরানো চিৎপুর সংস্করণের কভারে ছবি ছিলো ঘড়ি নিয়ে। একদল লোক ঘড়ি হাতে যাচ্ছে, তাকে আরেকজন জিজ্ঞাসা করছে, 'দাদা, ক'টা বাজে?' ঘড়িধারী দাঁত বার করে পালটা জিজ্ঞাসা করছেন, 'দাদা, ক'টা চাই?' অনেক মহৎ সমস্যার মতোই এই দ্বিতীয় প্রশ্নের আদি-অন্ত আমি আজও খুঁজে পাইনি।

আজকাল ডিজিট্যাল ঘড়ি চলছে। আলো জ্বলে-নেবে, মুহূর্তে মুহূর্তে সময় এগিয়ে যাচ্ছে। আমার এক তরুণ ব্যক্তিগত উপদেষ্টা আছেন। তিনি বলেছেন, ডিজিট্যাল ঘড়ি চলবে না, আবার ডায়াল ঘড়িতেই পশ্চিমীরা ফিরে যাচ্ছে। কারণ হলো, ডিজিট্যাল ঘড়িতে মাত্র একটাই সময় দেখায়, যেমন বারোটা সাতান্ন কিংবা সাতটা তেত্রিশ। ব্যাপারটা খুবই ক্ষণিক। সিনেমার শো সাড়ে পাঁচটায়, সিনেমা হল বাড়ি থেকে দেড় মাইল দূরে, ডিজিট্যাল ঘড়িতে পাঁচটা তেরো, তাড়াতাড়ি করা দরকার কিন্তু সময়টা আমার মনে রেখাপাত করলো না, কারণ শুধু একটা সময়ই দেখতে পেলাম। কিন্তু ডায়াল ঘড়িতে শুধু পাঁচটা তেরোই দেখতাম না, দেখতে পেতাম নির্দিষ্ট সময় থেকে মাত্র সতেরো ঘর দূরে আছি, মনের মধ্যে একটা তাড়া আসতো। সময় তো শুধু সময় নয়, সে বহমান ও আপেক্ষিক, তাকে মুহূর্তের বিন্দুতে আবদ্ধ করলে চলবে না। সময় সম্পর্কে সচেতন হওয়ার ভাবটাই উবে যাবে।

অনেক সময় অনেকজনের কথা বলেছি। সময় সচেতনতা সম্পর্কে আমার ছোট ভাই বিজনের কথা বলি। আমার জানাশোনার মধ্যে সময়-জ্ঞানহীনতায় সেই ফার্স্ট যাচ্ছে। সে সম্পর্কে বিস্তারিত লিখতে গেলে মহাভারত হবে। কিন্তু তার এই সময়জ্ঞানের অভাবের একটা প্রকৃত কারণ আছে। ও ওর দশ-বারো বছর বয়সে মামার বাড়িতে একটা দেয়াল ঘড়ি দেয়াল থেকে খুলে ওর মাথায় পড়ে, ও জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। আমার নিজের ধারণা, সেই থেকেই সময়বোধ ওর হারিয়ে গেছে। কিন্তু বিজন

সেদিন বললো, 'না দাদা, কারণ তা নয়।' বলে ওর ডিজিট্যাল ঘড়িটা দেখিয়ে বললো, 'এটাই কারণ।' কারণটা দেখলাম ওর ডিজিট্যাল ঘড়িতে তেরোটা নিরানব্বুই বেজেছে। বিজন একটু মৃদু হেসে বললো, 'তেমন মারাত্মক কিছু নয়, অত ভয় পেয়ো না। ব্যাটারি ডাউন, পালটালেই আবার একটা থেকে বারোটার মধ্যে থাকবে।'

কলকাতার যানবাহন

অনেকদিন আগের একটা গল্প, এখন প্রায় প্রবাদে পরিণত হয়েছে; কিন্তু ব্যাপারটা ঠিক গল্প নয়, ঘটনাটা আমরা কে কে যেন স্বচক্ষে দেখেছিলাম। যারা দেখেনি তাদেরও অবিশ্বাস করার কোনো ন্যায্য কারণ নেই, ঘটনাটা শুনলেই সেটা বোঝা যাবে।

সন্ধ্যার সময় ধর্মতলার মোড়ে আমরা কয়েকজন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিজেদের মধ্যে গল্প করছিলাম। অফিস ছুটির সময় বাস-ট্রাম কানায় কনায় ভরা। কোথাও তিলধারণের জায়গা নেই।

আমাদের ঠিক সামনাসামনি একটা একতলা বাস এসে দাঁড়ালো। সেটাতে যেন আরো মারাত্মক গাদাগাদি, একটা ছুঁচ পর্যন্ত গলতে পারবে না। দু-চারজন লোক তবুও দৌড়ে গিয়ে ওঠার চেষ্টা করলো কিন্তু পাদানিতে বা হাতলে এক সেন্টিমিটার জায়গাও দখল করতে পারলো না। এরই মধ্যে হঠাৎ রাস্তার ভিড় থেকে একজন বলশালী লোক ট্রাফিক আলোয় আটক বাসটার প্রথম দরজাটার ওপর গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে পিছনের দরজায় নীচের পাদানিতে ঝুলন্ত এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক কাতর আর্তনাদ করে উঠলেন, 'দাদা উঠবেন না, উঠবেন না। একেবারে মরে যাবো।' সেই প্রথম দরজায় আক্রমণকারী বলশালী লোকটি ভিড়ের উপর আরো চাপ সৃষ্টি করতে করতে বললেন, 'আরে মশায়, আমি উঠছি এইদিকে সামনের গেটে, আর আপনি রয়েছেন পিছনের গেটে, আমি উঠলে আপনার কি ক্ষতি হবে ? আপনি মারা পড়বেন কেন ?'

বলশালী ব্যক্তিটির যুক্তি ছিদ্রহীন, কিন্তু তিনি যেই মাত্র প্রবল বিক্রমে সামনের গেটে অনুপ্রবেশ করলেন, পিছনের গেটের সেই আর্তনাদকারী প্রৌঢ় ভদ্রলোক, হিতোপদেশের চরিত্রের মতো, 'হায়! আমি হতভাগ্য মরলাম!' বলে পিছনের গেট থেকে রাজপথে পতিত হলেন।

আমরা প্রথমে খুব অবাক হয়ে গেলাম। ভদ্রলোকটি আগের থেকেই পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা করছিলেন, ফলে পতনের ধাক্কাটা সামলিয়ে নিয়েছিলেন, চোট বিশেষ লাগেনি। গায়ের ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে তিনি সম্মুখে আমাদের দেখে বললেন, 'বাসটা একদম টায়ে-টোয়ে ভরা, কোথাও কোনো ফাঁক নেই। সামনের গেটে একজন লোক উঠলে পিছনের গেটে একজন লোক পড়ে যাবেই। কত চেঁচামেচি করলাম, ও ব্যাটা কিছুতেই শুনলো না, দেখলেন তো আমাকে ফেলে দিলো।' ধুলো ঝাড়া শেষ করে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ভদ্রলোক বললেন, 'তবু খুব বাঁচা গেছে, চলন্ত অবস্থায়

কেউ উঠলে তো ছিটকে পড়ে মারা পড়তাম।'

এ ঘটনা বেশ কয়েক বছর আগেকার। তখনো দরজা দিয়ে বাসে-ট্রামে ওঠা-নামার প্রথা প্রচলিত ছিলো। অবশ্য আজকাল আর ওসবের বালাই নেই। এখন গাড়ির জানালায়, পেছনে, ছাদে যেখানে সম্ভব যাত্রীরা উঠে পড়ে।

বাসের ভিতরে ঢুকতে পারা, মাঝামাঝি কোথাও হ্যাণ্ডেল ধরে দাঁড়ানোর সুযোগ পাওয়া আজকাল রীতিমত সৌভাগ্য বলে বিবেচিত হয়। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে টু শব্দটি করতে নেই। বাসের চাপে, ধাক্কা-ধাক্কিতে কেউ যদি কোনো কাতরোক্তি করে, সঙ্গে সঙ্গে তাকে কেউ না কেউ নির্দেশ দিয়ে দেয়, 'অসুবিধে হলে নেমে ট্যাক্সিতে চলে যান।' কিন্তু অসুবিধে যতই হোক ভিড়ে ভর্তি বাস থেকে নামা অত সোজা নয়, আর নামলেই ট্যাক্সি ধরা যাবে সে কথাই বা কে বলেছে!

বাসের ভিড়ের মধ্যে দাঁড়ানোর অসুবিধে নিয়ে একটি গল্প আছে। একটা মিনিবাসের মধ্যে এক ভদ্রলোক বহু কষ্টে মাথা নিচু করে, ঘাড় গুঁজে দাঁড়িয়ে যাচ্ছিলেন। মিনিবাসের যেমন চরিত্র, একটু পরে পরেই উদ্দাম গতি আচমকা ব্রেক কষে থামিয়ে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে, আর ভদ্রলোক বারবার ছিটকিয়ে ছিটকিয়ে সামনের সিটের উপর গিয়ে পড়ছেন।

সমস্যা হয়েছে ঐ আসনে এক ভদ্রমহিলা উপবিষ্টা এবং তাঁর পাশেই জানলা ঘেঁষে বসে রয়েছেন ভদ্রমহিলার স্বামী। কোলের উপর বারংবার পরপুরুষ এসে পড়ছে, ভদ্রমহিলা এতে খুব আপত্তি করছেন না, আর করবেনই বা কেন, ঐ ভদ্রলোক তো আর ইচ্ছে করে পড়ছেন না, কিন্তু ভদ্রমহিলার স্বামীদেবতা প্রচণ্ড অসহিষ্ণু। তিনি চেঁচামেচি, গালিগালাজ শুরু করলেন, 'কি বদমায়েস লোক আপনি মশায়, কি অসভ্য, বারবার মহিলার গায়ের উপরে এসে পড়ছেন!'

পতনশীল ভদ্রলোকটি কিন্তু নির্বিকার। এসব গালিগালাজের কোনো গুরুত্বই দিলেন না, শুধু বাসের হ্যাণ্ডেলটা শক্ত করে ধরে অন্য দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে কটূক্তি হজম করতে লাগলেন। শেষে নামার সময় পকেট থেকে

একটা কার্ড বের করে উত্তেজিত স্বামীটির হাতে দিয়ে বললেন, 'দাদা, নিজের অজান্তে এবং অনিচ্ছায়, বাসের ঝাঁকুনি সামলাতে না পেরে দু'বার আপনার স্ত্রীর গায়ে পড়ে গিয়েছিলাম, আপনি অনেক গালমন্দ করেছেন, তবু আপনার মুখ দেখে মনে হচ্ছে এখনো খুব রেগে আছেন। এখনো যদি আপনার মনে শান্তি না হয়ে থাকে, এই কার্ডে আমার ঠিকানা আছে।'

ভদ্রলোকের এই অনুতাপ-দগ্ধ আচরণে স্বামী বেচারা কেমন একটু বিব্রত বোধ করতে লাগলেন। আমতা-আমতা করে বললেন, 'আপনার কার্ড, আপনার ঠিকানা দিয়ে আমি কি করবো?' গমনোদ্যত ভদ্রলোক সিঁড়িতে পা দিয়ে বললেন, 'কি আর করবেন? কোনো রবিবার কিংবা ছুটির দিনে দয়া করে একটু সময় করে আমার বাড়িতে আসবেন। আমার স্ত্রীর কোলে আধঘণ্টা বসবেন, আমি কিছু মনে করবো না। শোধবোধ হয়ে যাবে।'

(এই গল্পটি আর কেউ না হোক, শিবরাম চক্রবর্তী সম্ভবত একবার অন্যভাবে লিখেছেন। রসিক পাঠক নিজ গুণে আমার স্পর্ধা মার্জনা করবেন।)

তবে সুখের কথা, কলকাতায় আর ট্রামে-বাসে ভিড়ের সমস্যা থাকছে না। পাতাল রেল তলায় তলায় এসে গেছে।

যখন কলকাতায় চৌরঙ্গীতে প্রথম মাটি খোঁড়া শুরু হয়েছিলো, সেই কবে কতকাল আগে, অফিস ফেরত এক ভদ্রলোক প্রতিদিন সন্ধ্যায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মাটি খোঁড়ার ব্যাপারটা খুব দেখতেন। দেখতে-দেখতে তাঁর মাথার মধ্যে মাটি খোঁড়ার ব্যাপারট ঢুকে গেলো। তিনি খুব চিন্তা করতে লাগলেন। অফিসে-রাস্তায়, পাড়ায়-বাড়িতে চেনা-অচেনা যাকেই দেখেন, জিজ্ঞাসা করেন, 'কলকাতার পেটে পেটে এত মাটি ছিলো কখনো জানতেন? এত মাটি এখন কি করবে? কোথায় রাখবে?'

কেউই তাঁর এই প্রশ্নসমূহের সদুত্তর দেয়নি। কিন্তু ভদ্রলোকের আত্মীয়স্বজন তাঁকে দু' বছর ঊর্ধ্ববায়ুর জন্যে চিকিৎসা করিয়েছিলো।

চিকিৎসকেরা বলেছিলেন যে ভদ্রলোক যেন এমন কোথাও না যান যেখানে মাটি কাটা হচ্ছে। কিন্তু অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে কলকাতা এবং তার চারপাশে এখন আর একটা জায়গাও নেই যেখানে মাটি কাটা হচ্ছে না।

তবু যা হোক, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রলোকের মন থেকে মাটি-কাটার সমস্যাটা উধাও হয়েছে, এখন আর তিনি এত মাটি-কাটা নিয়ে মাথা ঘামান না। তা ছাড়া চালাক বন্ধুরা তাঁকে বুঝিয়েছে যে মাটি-কাটা নিয়ে আলাদা করে আদালত বসেছে, এ নিয়ে তোমার আর চিন্তা করার দরকার নেই।

কিন্তু যাঁর চিন্তা করা স্বভাব তাঁর মাথায় নতুন চিন্তা ঢুকতে দেরি হয় না। ভদ্রলোক কিছুদিন আগে খবরের কাগজে দেখেছেন চৌরঙ্গী-ময়দান শাখায় পাতাল রেল এ বছরই চালু হবে। ভদ্রলোক ভাবনায় পড়েছেন, ভীষণ ভাবনা তাঁর, চৌরঙ্গী পর্যন্ত পাতাল রেলটা আসবে কি করে? আর তাছাড়া সিমেন্টের বাক্স-বানানো শেষ। এখন এর মধ্যে পাতাল রেলটা ঢোকাবে কি করে?

যদি কোনোদিন সন্ধ্যার দিকে কেউ চৌরঙ্গীতে যান, দেখতে পাবেন, যেখানে পাতাল রেলের কাজ চলছে, সগৌরবে এবং সগর্জনে তারই কাছাকাছি এই চিন্তিত ভদ্রলোকটি ঘুরে বেড়াচ্ছেন আর যাঁরা পাতাল রেলের কর্মী তাঁদের মধ্যে মধ্যে চিৎকার করে পরামর্শ দিচ্ছেন, 'দাদা, বাক্স বন্ধ করার আগে, মাটি চাপা দেওয়ার আগে রেলগাড়িটা ঢুকিয়ে নিতে ভুলবেন না। রেলগাড়ি ভেতরে না ঢোকালে কোনো লাভই হবে না। শুধু শুধু পণ্ডশ্রম হবে।'

ভদ্রলোকের এই উপদেশবাণী মাঝে-মাঝেই পাতাল রেলের যন্ত্র-পাতির নিনাদে চাপা পড়ে যাচ্ছে কিন্তু ভদ্রলোক অদমিত। তিনি প্রতি সন্ধ্যায় চেঁচিয়ে যাচ্ছেন, 'রেলগাড়িটা ঢুকিয়ে নাও, রেলগাড়িটা ঢুকিয়ে নাও।' তাঁর চেঁচানি শুনে আমরাও চিন্তিত হয়ে পড়ছি।

দরজি
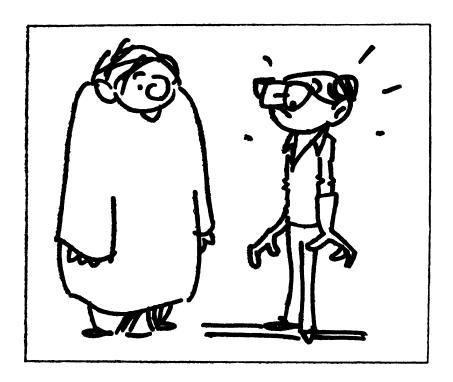
দরজি অর্থাৎ যাঁরা জামাকাপড় বানান। এই সীবন-শিল্পীদের কোথাও কোথাও কেউ কেউ খলিফা বলে থাকেন। বহুক্ষেত্রেই দরজি যদি মুসলমান হন, বলা হয় খলিফা সাহেব। এই খলিফা আরব্য রজনীর হারুন রশীদ বা কোন সম্রাট বা শাহ নন, এই খলিফা মানে ওস্তাদ।

ওস্তাদ অর্থাৎ দক্ষ কারিগর। দরজিদের ক্ষেত্রে এই কারিগরি দক্ষতার সবচেয়ে বড় ব্যাপার হলো লোক ঘোরানো। এত মোলায়েম হেসে গ্রাহককে দিনের পর দিন ঘুরিয়ে যাওয়া আর কোনো পেশায় দেখা যায় না।

দিল্লী বেড়াতে যাবে বলে যে নবীনা কিশোরীটি লাল ফুলফুল সালোয়ার

কামিজটি বানাতে দিয়েছে, দিল্লী থেকে বেড়িয়ে ফিরে এসেও সে যদি তা উদ্ধার করতে পারে তাহলে সে ধন্য। আমার এক বন্ধুর মামা এই অঘ্রান মাসে একটা সার্জের ফুলশার্ট দরজির দোকানে বানাতে দিয়ে পাঁচ মাস হাঁটাহাঁটি করে চৈত্রের শেষাশেষি শার্টটি হাতে পেলেন। প্রখর মধ্যাহ্ন-কাল, গ্রীষ্মের দাবদাহ শুরু হয়ে গেছে, এদিকে দরজিমশায়ের কাঁচঢাকা ছোট ঘরে যথারীতি লোডশেডিং। সেই মাতুল ভদ্রলোক নতুন পাওয়া গরম জামাটি ট্রায়াল দিতে দোকানের দমবন্ধ দু'ফুট বাই আড়াইফুট ট্রায়ালরুমে ঢোকেন। বেরোতে দেরি হচ্ছে দেখে দোকানের এক কর্মচারী দরজা ফাঁক করে দেখেন মাতুল মহোদয় ঐ গরমে, বদ্ধ ক্ষুদ্র কক্ষে বিলিতি সার্জের পাঞ্জাবি গায়ে দিয়ে চোখ উলটে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছেন। সেদিন আবার টালা ট্যাঙ্কের পাম্প চুরি আর পলতায় জলবিরতি। কোথাও এক বিন্দু জল নেই, শেষে পাশের পানের দোকান থেকে কুড়ি বোতল লেমনেড এনে মাথায় ঢেলে তারপর ভদ্রলোকের জ্ঞান ফেরে। সেই লেমনেডের দাম কে দেবে, দরজি না খদ্দের তা এখনো স্থির হয়নি, কিন্তু লেমনেডের জলের রঙে দুগ্ধশুভ্র সার্জের পাঞ্জাবিতে যে অপরিচিত মহাদেশের মানচিত্র আঁকা হয়েছে তা তুলে ফেলা সহজ হবে না।

কিন্তু এসব তো সামান্য কথা। নির্মলবাবু বলে এক ভদ্রলোককে চিনতাম। ভদ্রলোক অতিশয় সজ্জন, শিক্ষিত ব্যক্তি, তা ছাড়া সদালাপী। কিন্তু ভদ্রলোকের একটা দোষ ছিলো, ভদ্রলোকের একটু হাতটান ছিলো। অবশ্য লোকজনের জিনিসপত্র সরাতেন না, একটা ব্যাঙ্কে কাজ করতেন, সেখান থেকেই মাঝে-মধ্যে প্রয়োজন ও সুবিধেমত অল্পবিস্তর টাকা-পয়সা সরাতেন। যেমন হয়, অবশেষে ধরা পড়ে যান। বিচারে তহবিল তছরুপের গুরুতর দায়ে তাঁর পাঁচ বছর জেল হয়। জেলে যাওয়ার সময় নির্মলবাবু পকেটের কাগজপত্র, টাকা-পয়সা সব জেলের অফিসে জমা দিয়ে ভেতরে ঢোকেন, সেটাই নিয়ম। পাঁচ বছর পরে জেল থেকে বেরোনোর সময় যখন সব ফেরত পেলেন, দেখলেন পুরনো কাগজপত্রের মধ্যে একটা দরজির দোকানের রসিদ রয়েছে। নির্মলবাবুর মনে পড়লো, মামলায় খালাস

পেয়ে যাবেন আর খালাস পেলেই চুটিয়ে ফুর্তি করবেন এই আশায় একটা গরদের পাঞ্জাবি বানাতে দিয়েছিলেন। সে সাধ তাঁর পূরণ হয়নি, কিন্তু পাঁচ বছর পরে রসিদটি নিয়ে তিনি সেই দরজির দোকানে এবার গেলেন। দরজির দোকানটি একই রকম আছে, খুব রমরমা, বহু লোকজন জামা-কাপড়ের মাপ দিচ্ছে। পাঁচ বছরের পুরনো রসিদটা নির্মলবাবু সন্তর্পণে কাউণ্টারে দেখালেন। এতদিন হয়ে গেছে কিন্তু কেউ কিছু মাথাই ঘামালো না, রসিদটি হাতে হাতে ঘরের পিছনে কারিগরি সেকশনে চলে গেলো, সেখান থেকে এক ভদ্রলোক রসিদটি হাতে কাউণ্টারে এসে নির্মলবাবুকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'গরদের কাপড় তো?' নির্মলবাবু যখন বললেন, 'হ্যাঁ', ভদ্রলোক বিনীতভাবে মোলায়েম হেসে বললেন, 'দাদা, কিছু মনে করবেন না, একটু দেরি হয়ে গেলো, একবার কষ্ট করে সামনের সপ্তাহের শেষের দিকে আসুন।'

এ গল্প নিশ্চয়ই অতিরঞ্জিত, কিন্তু খুব অতিরঞ্জিত নয়। দরজিরা বহু সময়েই খুব অসুবিধা সৃষ্টি করেন। কত বিয়ের পাঞ্জাবি, ইণ্টারভিউয়ের শার্ট, ছোট ছেলের পুজোর পোশাক দরজির দোকান থেকে শেষ মুহূর্তেও উদ্ধার করা যায় না। লোকে জামাইবাবুর পাঞ্জাবি পরে বিয়ে করতে যায়, পুরনো কলার ফাটা শার্ট পরে চাকরির ইণ্টারভিউ দিতে যায়, ছোট মেয়ে ময়লা ফ্রক পরে পুজো মণ্ডপের একপাশে দাঁড়িয়ে থাকে।

অন্যদিকে দরজিদের জন্যে তাঁদের খদ্দেররাও কম অসুবিধার সৃষ্টি করেন না। আমি একবার দেখেছিলাম একজন শৌখিন লোক এক দরজির দোকানে রাগারাগি করছেন, 'বাঁ হাতের সামনের দিকটা হবে লাল এবং পেছনের দিকটা নীল, ডান হাতের সামনে নীল পেছনে লাল, আর তুমি করে দিলে বাঁয়ে নীল-লাল আর ডাইনে লাল-নীল। রইলো তোমার জামা, এ জামা আমি নেবো না।' বিব্রত দরজি হাতজোড় করে বলছেন, 'জামাটা নিয়ে যান দাদা, এ জামা আপনি ছাড়া আর গায়ে দেবার লোক আমি জোগাড় করতে পারবো না।'

আরেক ধরনের লোক রয়েছে, তাদের ধারণা দরজি বুঝি কাপড় বেশি

নিচ্ছে। এ বিষয়ে বিখ্যাত গল্প আছে। এক গৃহস্থকে তাঁর ছেলে পাঞ্জাবির জন্যে সাদা কাপড় পাঠিয়েছে। তিনি টেলারিং শপে গেছেন। দরজি মাপ নিয়ে যখন কাপড়টা তুলছে, তখন তাঁর কি মনে হলো, তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'কাপড় একটু বেশি হবে?' দরজি বললেন, 'তা একটু হতে পারে।' তখন গৃহস্থ বললেন, 'ঠিক আছে, বেশি কাপড় দিয়ে দু-একটা রুমাল বানিয়ে দেবেন।' দরজি বললেন, 'তথাস্তু।'

রাস্তায় নেমে ভদ্রলোকের মনে হলো অতিরিক্ত দুটো রুমালে যখন দরজির আপত্তি হলো না, হয়তো একটা পাজামাও হয়ে যাবে। ভদ্রলোক ফিরে গেলেন দরজির দোকানে, দরজিকে তাঁর আবদার জানালেন। দরজি বললেন, 'সে সম্ভব নয়।' ভদ্রলোক বললেন, 'দেখুন না চেষ্টা করে।' দরজি দেখলেন কথা বাড়িয়ে লাভ নেই, চুপ করে রইলেন। দরজিকে মৌন দেখে ভদ্রলোক বললেন, 'আর ঐ রুমাল দুটোও কাপড় বেঁচে গেলে করে রাখবেন।'

কিছুক্ষণ পরে আবার ভদ্রলোক ফিরে এসেছেন, সামনে শীত আসছে, কাপড় যদি একটু বেশিই থাকে তবে কাটছাঁট যা বাঁচবে তা দিয়ে একটা টুপিও বানিয়ে নিলে মন্দ হয় না। দরজি ততক্ষণে বাক্‌রহিত হয়ে গেছেন। ভদ্রলোক এর পরে আরও দু'বার ফিরলেন, শেষ পর্যন্ত তিন মিটার কাপড়ে মোটামুটি ফরমাস দাঁড়ালো একটা ঢোলা হাতা পাঞ্জাবি, একটা ঢোলা পাজামা, দুটো আণ্ডারওয়ার, দুটো ফতুয়া, দুটো রুমাল এবং একটি টুপি।

নির্দিষ্ট দিনে সেই ভদ্রলোক দরজির দোকান থেকে সবই পেলেন; পাঞ্জাবি, পাজামা, ফতুয়া, টুপি, রুমাল, যা যা যত সংখ্যক চেয়েছিলেন। কিন্তু এ কি? সবই অতি ছোট ছোট, পুতুলের জামাকাপড়। কোনো শিশুও সেগুলো পরিধান করতে পারবে না। শুধু বাচ্চা মেয়েদের পুতুল খেলায় কাজে লাগতে পারে। ভদ্রলোকের রাগারাগিতে রাস্তায় লোক জমে গেলো, কিন্তু দরজিমশায় নির্বিকার, তিনি বলছেন, 'তিন মিটার কাপড়ে এতগুলো জিনিস এর চেয়ে বড় করা যাবে না, কেউ পারবে না।'

এর বিপরীত গল্পটি আরো জটিল। দামী গরম কাপড় বিলেত থেকে

এনে দরজির দোকানে এক ভদ্রলোক কোট বানাতে গেছেন। দরজি মেপে বললেন, 'এতে হবে না।' ফেরত নিয়ে পাশের দোকানে যেতে সেখানকার মালিক হাসিমুখেই অর্ডার গ্রহণ করলো। ভদ্রলোক যেদিন কোট আনতে গেছেন, দেখেন সেই দরজির দোকানে একটি ছোট ছেলে তারই কোটের কাপড়ে তৈরি একটা কোট গায়ে দিয়ে খেলছে। ওদিকে তাকাতে দোকানদার একটু মোলায়েম হেসে বললেন, 'আপনার কাপড়টা থেকে অনেকটা কাটিং বেরিয়েছিল, তাই দিয়ে বানিয়ে দিলাম।' ভদ্রলোক দেখলেন তাঁর কোনো ক্ষতি হয়নি, আর তাঁর নিজের কোটটাও ভালো ফিট করেছে। তিনি নিজের কোটটা নিয়ে, সেই প্রথম দোকানে যে কাপড় কম হবে বলেছিলো তাকে গিয়ে ধরলেন, 'আপনি কি রকম দরজি, আমার কোট হয়েও ঐ দরজির ছেলের একটা কোট হয়ে গেলো ; আর আপনি বলেছিলেন যে কাপড় কম হবে।'

একটি গলাবন্ধ কোটের গলা কাটতে কাটতে দরজি মশায় জবাব দিলেন, 'আরে, ওর ছেলের বয়েস সাত আর আমার ছেলের বয়েস উনিশ, আমার ছেলের কোট কি ওতে হতো, কাপড় কম পড়তো না ?'

সংখ্যাতত্ত্ব

যাঁরা আমাকে হরপ্পার যুগ থেকে চেনেন এবং তাঁদের মধ্যে যাঁরা জানেন কিংবা যাঁদের মনে আছে যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষায় শেষ পত্রে সংখ্যাতত্ত্বের বিশেষ বিষয়ে আমি শূন্য পেয়েছিলাম, তাঁদের কারো পক্ষে এ কথা ভাবা হয়তো অসম্ভব নয় যে, আমার এই কাণ্ডজ্ঞানটি নিতান্তই বিদ্বেষপ্রসূত এবং প্রতিহিংসাবশত।

তবে সত্যি কথা, বুকে হাত দিয়ে বলতে পারি, এই পঁচিশ বছর পরে এখন আমার আর এ বিষয়ে রাগ বা হিংসে বলে মনের মধ্যে কিছু নেই। আর তাছাড়া অদৃষ্টের নিষ্ঠুর পরিহাসে সম্প্রতি কিছুদিন আমাকে জীবিকার
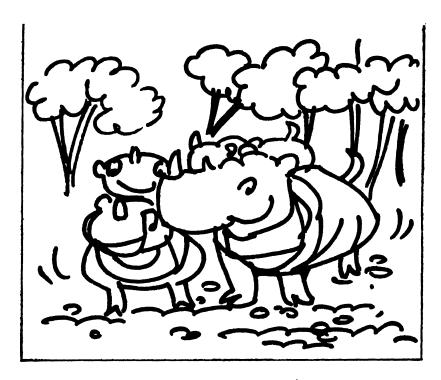
জন্যে যে কাজটি দেখতে হচ্ছে সে ঐ সংখ্যাতত্ত্ব নিয়েই।

আর তা ছাড়া ঐ শূন্যের ব্যাপারটার আমার কাছে আর কোনো গুরুত্ব নেই। শুধু ঐ পরীক্ষায় নয়, তার আগে ও পরে জীবনের বহু পরীক্ষায় আমি অবলীলাক্রমে শূন্য পেয়েছি।

খুব অল্প বয়েসে ইস্কুলের নিচু ক্লাসে অঙ্কের পরীক্ষায় প্রথম যেবার শূন্য পাই, বাবা আমাকে মারতে এসেছিলেন। পরম স্নেহশীলা আমার রাঙা পিসিমা সেখানে ছিলেন, তিনি বাবাকে বাধা দেন এবং নাম ধরে ধমকিয়ে দিয়ে বলেন, 'জটু, খোকাকে মারতে যাচ্ছো কেন, খুব খারাপ কি করেছে? একেবারে কিছুই যে পায়নি তা তো নয়, শূন্য তো পেয়েছে।'

শূন্য পাওয়া একেবারে কিছুই না পাওয়া নয়, সেটা তখন থেকেই আমি জেনে গিয়েছি। কিন্তু শূন্যের সমস্যা বড় বেশি জটিল, তা নিয়ে অন্য কোনো দিন হাসাহাসি করা যাবে। আজ সংখ্যাতত্ত্ব।

কোনো এক মেডিক্যাল কলেজে সে বছর স্নাতকের সংখ্যা ছিল একশো, আর স্নাতকীর সংখ্যা ছিলো দশ। এর মধ্যে পাঁচটি ডাক্তার ছেলে ভালোবেসে তাদের পাঁচজন সহপাঠিনীকে বিয়ে করেছিলো পাস করে বেরোনোর পরেই। সে বছর সেই ডাক্তারি কলেজের পুনর্মিলন উৎসবের সুভেনিরে সম্পাদক রিপোর্ট করেছিলেন, 'আমাদের মেডিক্যাল কলেজের শতকরা পাঁচজন ডাক্তারবাবু শতকরা পঞ্চাশজন ডাক্তার দিদিমণিকে আলোচ্য বছরে পরিণয়পাশে আবদ্ধ করেছেন।'

সংখ্যাতত্ত্বের দিক থেকে নিশ্চয়ই এই ডাক্তারি রিপোর্টে কোনো ভুল নেই। কিন্তু ব্যাপারটা কি সাংঘাতিক গোলমেলে। সাধে কি আর সেই বিখ্যাত সাহেব বুদ্ধিজীবী বলেছিলেন, 'মিথ্যে তিন রকম—'মিথ্যে, ডাহা মিথ্যে এবং সংখ্যাতত্ত্ব।' সেই সাহেব আমার মতো শূন্য পাওয়ার রাগে ঐ কথা বলেননি, সম্ভবত তাঁর রাগের কারণ ছিলো অন্য।

'এ সভায় প্রায় আধাআধি লোকই বোকা' এবং 'এ সভায় প্রায় অধিকাংশ লোকই বুদ্ধিমান,' এ দুটি বাক্যের যে একই মানে, সে বুঝি শুধু সাংখ্য বিজ্ঞানেই সম্ভব।

তবুও সংখ্যাতত্ত্বের উপরে কিছু লোকের বড় বেশি ঝোঁক। আমার পরম গুরুদেব স্বর্গত স্টেফান লীকক সাহেব এ নিয়ে চরম রসিকতা করে গেছেন। লীকক সংখ্যাতত্ত্বে প্রচণ্ড উৎসাহী দুই ব্যক্তির আলাপ-আলোচনা নিয়ে লিখেছিলেন।

ধরা যাক, এই দুই ব্যক্তি আলোচনা করছিলেন ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য নিয়ে কিংবা সৌর মণ্ডল নিয়ে। দুজনেই জানেন এর মধ্যে বড় বড় অঙ্কের ব্যাপার রয়েছে এবং দুজনেই সব ঘুলিয়ে ফেলেছেন। একজন বলছেন, 'হিসেবটা দেখেছো একবার? আমেরিকায় কত সাইকেল বিক্রি করি আমরা প্রত্যেক বছর? দাঁড়াও বলছি, এইতো কালকেই কাগজে দেখলাম, বহু হাজার, না না হাজার নয়। বেশ কয়েক লক্ষ সাইকেল চালান যায়, সংখ্যাটা ঠিক মনে পড়ছে না তবে বোধ হয় লক্ষ নয়, বেশ কয়েক কোটিই হবে। নাকি কয়েক হাজারই হবে। হাজার হাজার

সাইকেল যাচ্ছে আমেরিকায়।'

কিংবা সৌরমণ্ডল, 'ত্যাখো, কালকে একটা চমৎকার হিসেব পড়লাম। একজন মানুষকে যদি কামানের মধ্যে পুরে ছুঁড়ে দেওয়া যায়, আচ্ছা মানুষ নয়, ধরো একটা বল যদি মনে করো ঘণ্টায় দশ মাইল, না না দশ মাইল নয়, সম্ভবত সেকেণ্ডে বারো হাজার তেত্রিশ কিংবা ঐ রকমটা কি একটা কিলোমিটার গতিতে চাঁদের দিকে, সম্ভবত সূর্যের দিকে অথবা মঙ্গলগ্রহের দিকে, মনে হচ্ছে মঙ্গলগ্রহই হবে তাই পড়েছিলাম, চমৎকার বুঝিয়ে লিখেছে, যদি সেই বলটা যেতে থাকে তা হলে এক মাস সতেরো দিন, না সতেরো বছর এক মাস পরে সেই বলটা, হ্যাঁ এইবার যেন মনে পড়ছে, মঙ্গলগ্রহের মাটিতে পড়তে পারে।'

লৌকক সাহেবকে কাণ্ডজ্ঞানে কায়দা করতে গিয়ে মনে হচ্ছে খুব জট পাকিয়ে ফেললাম। তার চেয়ে সংখ্যাতত্ত্বের সহজ সরল পুরনো গল্পটি যাঁরা জানেন না তাঁদের জন্যে আরেক বার বলি।

, দিল্লী থেকে ভারত সরকার কোনো কারণে জানতে চেয়েছেন, বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন রকম গৃহপালিত জন্তুর সংখ্যা কি রকম। প্রশ্নটির উত্তরের জন্যে টেলিগ্রাম গিয়েছে রাজ্যস্তর থেকে জেলাস্তরে, সেখান থেকে মহকুমায়, সেখান থেকে ব্লকে, সেখান থেকে গ্রামে।

সাধারণত গ্রামের চৌকিদার মশায় এ রকম সংখ্যাতত্ত্ব সরবরাহ করেন। তিনি বাড়ি বাড়ি ঘুরে কোনো এক গ্রামের খবর সংগ্রহ করলেন। ত্রিশটি গরু, বারোটি মোষ, একুশটি শুয়োর, চল্লিশটি ছাগল, আড়াইশ পাতিহাঁস, চারটি রাজহাঁস, হাজার খানেক মুরগি ইত্যাদি। চৌকিদার মশায়ের ছেলে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে, তাকে তিনি বললেন, 'এগুলো সব ইংরিজি করে দে।' সে বেচারী অত্যন্ত ন্যায়-নিষ্ঠভাবে কাউ, বাফালো, সব সেরে শেষে অভিধান মিলিয়ে চারটি রাজহাঁসকে করলো ফোর গ্যাণ্ডারস (Four Ganders)। সে অবশ্য ঠিকই করলো। কিন্তু ব্লক অফিসে একজন এই রিপোর্ট দেখে জীবজন্তুর নাম ইংরেজিতে পড়ে ভাবলেন, চৌকিদারটা কি মূর্খ, গণ্ডার ইংরাজি জানে না, ত্যাখো কি লিখেছে! তিনি ইংরেজি

অভিধানে বানান দেখে শুদ্ধ করে লিখে দিলেন, 'ফোর রাইনোসেরাস।'

চল্লিশটি গ্রাম থেকে রাজ্যান্তরে রিপোর্ট এসেছে, তার মধ্যে একটি ঐ চারটি গণ্ডার। রাজ্যে চল্লিশ হাজার গ্রাম, পরিসংখ্যান রিপোর্ট গেলো সারা রাজ্যে চার হাজার গৃহপালিত গণ্ডার আছে।

অবশ্যই এই রিপোর্টের পর শুধু ভারতে নয়, সারা পৃথিবীতে হুলুস্থুল পড়ে গেলো। অনেক পর্যটক এলেন এইসব গৃহপালিত গণ্ডারদের দেখতে। তারপর কি হলো আমরা জানি না। কারণ এটা নিতান্তই গল্প, এ গল্পের মর্মার্থ হলো, বড় হিসেবে ছোট গোলমাল অনেক বর্ধিত আকারে দেখা দিয়ে সব তালগোল পাকিয়ে দিতে পারে। আবার সব সময় সব জিনিস বোঝানোও যায় না।

যেমন এই উদাহরণটি। কোনো এক বিলিতি শহরে পুলিশকর্তা হিসেব করে দেখালেন, শতকরা দশটি দুর্ঘটনার জন্যে মাতাল ড্রাইভারেরা দায়ী। এই কথা শুনে এক মদ্যপ পুলিশকে জানালেন, 'শতকরা নব্বুইটি দুর্ঘটনা যখন হচ্ছে মদ না-খেয়ে গাড়ি চালানোর জন্যে, তা হলে মদ না-খেয়ে গাড়ি চালানো বন্ধ করে দিচ্ছো না কেন?'

মাতালের কাণ্ডজ্ঞান

এবার গঙ্গাজলে গঙ্গা পূজা। বহু জায়গা থেকে বহু গল্প চুরি করে সঙ্গে কিছু গোঁজামিল দিয়ে সপ্তাহে সপ্তাহে কাণ্ডজ্ঞান চালাতে হয়। অনেকেই সেটা দেখেও দেখেন না, খেমাঘেন্না করে ছেড়ে দেন।

এইভাবে আমার সাহস বেড়ে গেছে। এইবার দেশ পত্রিকার খোদ সম্পাদক মহোদয়ের গল্প দিয়েই শুরু করবো। শ্রীযুক্ত সাগরময় ঘোষের বলা এই গল্পটি অনেকেই অনেক জায়গায় বিভিন্ন ভাষ্যে শুনেছেন, 'সম্পাদকের বৈঠকে' বইতে গল্পটি তিনি চমৎকার রসালো ভাবে লিখেও রেখেছেন। তবুও কাণ্ডজ্ঞানের জন্যে গল্পটি আমি সংক্ষিপ্ত করে আবার এখানে লিখছি।

দুজন মাতাল অনেক রাতে মদ খেয়ে চুরচুর হয়ে বড় রাস্তার মোড়ে ঠিক মধ্যিখানটায় পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে দাঁড়িয়ে আছেন। পুলিশ এসে তাঁদের অনুরোধ করছে যাতে এভাবে দুজনে ধরাধরি করে বিপজ্জনকভাবে দাঁড়িয়ে না থেকে যে যার বাড়িতে চলে যায়। কিন্তু পরস্পরকে ছেড়ে তাঁরা যেতে পারছেন না। তাঁরা বলছেন, 'United we stand, divided we fall.' অর্থাৎ দুজনে দুজনকে জড়িয়ে এই অবস্থায় আছেন বলেই দাঁড়িয়ে আছেন, যে মুহূর্তে দুজনে বিচ্ছিন্ন হয়ে আলাদা হয়ে যাবেন অমনি সঙ্গে সঙ্গে গড়িয়ে মাটিতে পড়ে যাবেন।

এ গল্প মাতালের বাড়ি না-ফেরা নিয়ে। মাতালের বাড়ি ফেরা নিয়ে চমৎকার গল্প আছে সৈয়দ মুজতবা আলীর। একজন মাতাল গভীর রাতে বাড়ি ফিরে বাবাকে ডাকছে বাবা-বাবা বলে নয়; বাবার নাম হরিপদ, ডাকছে, 'হরিপদবাবু, ও হরিপদবাবু, দরজা খুলুন।' বাবা তো রেগে আগুন,

'কী, আমার নাম ধরে ডাকা ? মাতলামির জায়গা পাওনি !' মাতাল ছেলে তখন বাবাকে বোঝায়, 'আমি যদি নেশা করে এসে আপনাকে বাবা-বাবা বলে রাস্তায় দাঁড়িয়ে ডাকি, পাড়ার লোকেরা জানবে আপনার ছেলে মাতাল। তাতে কি আপনার সম্মান থাকবে। তার চেয়ে আমি যদি আপনাকে হরিপদবাবু বলে ডাকি, লোকে ভাববে আপনার কোনো ইয়ার-বন্ধু নেশা করে এসে আপনাকে ডাকছে। কত লোকেরই তো ইয়ার-বন্ধু মাতাল থাকে, তাতে আপনার কোনো মানহানি হবে না।' অকাট্য যুক্তি, অতঃপর পিতৃদেব কি করেছিলেন আমাদের জানা নেই।

(শ্রীযুক্ত সাগরময় ঘোষের এবং সৈয়দ মুজতবা আলীর গল্প দুটি মনে আছে, কিন্তু হাতের কাছে বই দুটি নেই। গল্প দুটি বোধহয় আরো মজার। স্মৃতি আমাকে কিঞ্চিৎ প্রতারণা করলো বলে মনে হচ্ছে, ত্রুটি মার্জনীয়।)

মদ্যপ সম্পর্কে একমাত্র বিয়োগান্ত গল্পটি শ্রীযুক্ত হিমানীশ গোস্বামীর। মাতাল ও মদ খাওয়া নিয়ে সব গল্পই ঐ উত্তেজক পানীয়টির মতই তরল। কিন্তু হিমানীশবাবুর গল্পটি বড়ই করুণ।

গল্পটি অযোধ্যা সিং নামে এক মদ্যপ যুবককে নিয়ে। সে অত্যন্ত বেশি মদ খেতো। একদিন পর পর কয়েক বোতল রাম দুয়েক ঘণ্টার মধ্যে গলাধঃকরণ করলো অযোধ্যা সিং। তারপর মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লো। তখন অযোধ্যা সিং-এর আত্মীয়বন্ধুরা অযোধ্যার শেষকৃত্যের সময় সে যে রামের বোতলগুলি খেয়েছিলো এবং যেগুলিতে তখনো রাম ছিলো সেগুলো অযোধ্যা সিং-এর চিতায় রাগ করে তুলে দেয়।

হিমানীশের এই গল্প শুনে অনেকে বিশেষ রকম আপত্তি করেছিলেন, তাঁরা বলেছিলেন, 'মদ অতিরিক্ত খেলে শরীর খারাপ হতে পারে, অজ্ঞান হয়ে যেতে পারে, অনেক দিন ধরে খেলে গুরুতর অসুখে ভুগে মরে যেতে পারে, কিন্তু বেশি মদ পান করে সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু, এ অতি অসম্ভব কথা।' এবার হিমানীশ করুণ মুখে বলেছিলেন, 'দেখুন, সব শুনলেন তো, ঐ অযোধ্যা সিং-এর সঙ্গে রামের বোতলগুলোও পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিলো। সে রামও নেই, সে অযোধ্যাও নেই। এখন যদি কিছু আমাকে প্রমাণ

করতে বলেন, সে আমি পারবো না। পারলে বিশ্বাস করুন, না পারলে বিশ্বাস করবেন না।'

মাতাল সম্পর্কে সবই শোনা গল্প বলছি। আমার সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতা লেখা অতি বিপজ্জনক। আমার এই লেখা পড়ে তাঁরা যদি কেউ বেশি উত্তেজিত হয়ে পড়েন, তারপর বেশি নেশা করেন, তারপর আমার খোঁজ করেন, সেই সমাগম খুব মধুর না হতেও পারে।

তার চেয়ে অমল কৈশোরের কথা বলি। কলকাতার থেকে অনেক দূরে যে ছোট শহরে আমরা বড় হয়েছি, সেখানে মদ খাওয়া খুব চালু বা জনপ্রিয় ছিলো না। মাত্র একটি কি দুটি স্থানীয় মাতাল ছিলেন, শহরসুদ্ধ লোক তাঁদের চিনতো, তাঁদের খ্যাতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিলো যে এমন কি সাত-সকালে যখন তাঁরা হয়তো বিশুদ্ধ, নির্মদ চিত্তে বাজারের থলে হাতে যাচ্ছেন, তখনো আমাদের মতো অল্পবয়স্করা তাঁদের হঠাৎ দেখলে, 'মাতাল-মাতাল' চিৎকার করে ভয়ে দৌড়ে পালাতাম। তাঁরা যে খুব ক্ষতিকর ছিলেন, বিপজ্জনক বা মারকুটে ছিলেন—তা কিছু মনে হয় না। শহরের সাধারণ লোকে একদিকে তাঁদের মাতাল বলে সমীহ করতেন, অন্যদিকে একটু রোমান্টিকভাবেও দেখতেন। আসলে সেটা ছিলো দেবদাস-পার্বতীর যুগ, নবীন বাংলার প্রমথেশ-পর্ব। তাই যে কোনো ভদ্রলোক মাতালকেই অহেতুক গৌরবান্বিত করে বলা হতো, 'ম্যাট্রিকে গোল্ড মেডাল পেয়েছিলো, বাবা-মা লাভ ম্যারেজ করতে দিলো না, এখন মদ খেয়ে এই অবস্থা দাঁড়িয়েছে', অথবা 'মদ খাওয়া আরম্ভ করার আগে কি চেহারা ছিলো নিখিলের, একেবারে রাজপুত্রের মতো। আর সব সময় ফটফট করে সাহেবদের মতো ইংরেজির খই ফুটতো মুখে।'

সেই সব সুপুরুষ, সুপণ্ডিত, ভগ্নহৃদয়, ব্যর্থ-প্রেমিক মাতালদের আজকাল আর দেখতে পাওয়া যায় না। আজকালকার অধিকাংশ মদ্যপ পেঁচি, ধান্দাবাজ এবং অত্যন্ত গোলমেলে। অবশ্য দু-একজন ফুর্তিবাজ মাতালও আছেন।

হাওড়া স্টেশনে একটা ওজনের যন্ত্র আছে, আমি তার পাশে দাঁড়িয়ে

এক বন্ধুর জন্যে অপেক্ষা করছিলাম। বন্ধুর আসতে দেরি হচ্ছে দেখে ভাবলাম ওজনটা নিয়ে নিই। ওজনের যন্ত্রটায় হেলান দিয়ে গিলেকরা পাঞ্জাবি ও তাঁতের ধুতি পরা এক ঈষৎ মত্ত ভদ্রলোক দাঁড়িয়েছিলেন। আমি পকেট থেকে ছুটো দশ পয়সা বের করে যন্ত্রটির দিকে এগুতেই ভদ্রলোক একটু আলগা হয়ে সরে দাঁড়ালেন। যন্ত্রটা নিশ্চয় খারাপ ছিলো, আমার কুড়ি পয়সা গলাধঃকরণ করে খটখট শব্দসহ যে কার্ডটি বেরিয়ে এলো তাতে আমার ওজন উঠেছে মাত্র পনেরো কেজি। আমার বিস্মিত দৃষ্টি অনুসরণ করে পার্শ্ববর্তী মত্ত ভদ্রলোক কার্ডটির দিকে ভালো করে দেখে হঠাৎ আমার পেটে একটা খোঁচা দিয়ে বললেন, 'দাদা একদম ফাঁপা।'

এ তো তবু রেল স্টেশনের কথা। একবার এক পার্টিতে দেখেছিলাম এক ভদ্রলোক প্রচণ্ড হইহুল্লোড়, নাচ-গান করছেন, তাঁর স্ত্রী একটু রক্ষণশীলা, তিনিও উপস্থিত, তবে স্বামীর আচরণে রীতিমত বিব্রতা। তিনি একা একা বাইরের বারান্দায় চলে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে স্বামী বেচারীর হুঁস হয়েছে, পার্টিও ভেঙে এসেছে, স্বামী টলতে টলতে গিয়ে দেয়ালে ঠেস দিয়ে স্ত্রীর সামনে দাঁড়িয়ে মাতালের পক্ষে যতটা অনুতপ্ত হওয়া যায় সেই রকম গলায় স্ত্রীর হাত ধরে বললেন, 'চলো, বাড়ি যাই।' পত্নীদেবী হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ঝংকার দিয়ে উঠলেন, 'না।' মাতাল তখন হাতজোড় করে বললেন, 'দেখুন, কিছু মনে করবেন না, আপনি অনেকটা আমার স্ত্রীর মতো দেখতে, তাই ভুল করেছিলাম, ক্ষমা করবেন।' স্ত্রী এবার অগ্নিমূর্তি ধারণ করলেন, 'বদমাইস, মাতাল, সব জায়গায় আমার মুখে কালি দিচ্ছো। তোমার মুখ শিল-নোড়া দিয়ে থেতলে দিলে আমার মনে শান্তি হবে।' হতভাগ্য মদ্যপ আরো সঙ্কুচিত হয়ে গেলেন, করুণ কণ্ঠে বললেন, 'দেখুন, আমার দোষ নেবেন না। আপনি যে শুধু আমার স্ত্রীর মতো দেখতে তাই নয়, আপনার কথাবার্তাও হুবহু আমার স্ত্রীর মতো।'

মাতালের গল্পের শেষ নেই। বত্রিশ পুতুল, চল্লিশ চোর কিংবা সহস্র এক আরব্য রজনীর চেয়েও দীর্ঘ সেই কথামালা। এই ধূলিমলিন, পাই পয়সা, শাকচচ্চড়ির গোমড়ামুখ পৃথিবীতে এখনো ছু-একটি মজার গল্প

মাতালেরাই রচনা করেন। তাঁরা আমাদের নমস্য, তবে দূর থেকে।

নমস্কার করার আগে শেষ গল্পটা আমি বলি। এ গল্পটা আমি দু'ভাবে শুনেছি। এক, মদের দোকানে দুজন অনেকক্ষণ ধরে মদ খাচ্ছে, শেষে একজন আরেকজনকে বললো, 'এই তুই আর মদ খাসনে, তোকে কেমন ঝাপসা দেখাচ্ছে।' দুই নম্বর গল্প, পার্টিতে এক মহিলার পদপ্রান্তে এসে বসলেন এক মাতাল, তারপর মুগ্ধ কণ্ঠে বললেন, 'দেখুন, মদ খেলে আপনাকে বড় সুন্দরী দেখায়।' ভদ্রমহিলা লেমনেড খাচ্ছিলেন, বললেন, 'কিন্তু আমি তো মদ খাচ্ছি না।' ভদ্রলোক সংশোধন করে বললেন, 'না না, আপনার কথা নয়, আমি তো মদ খাচ্ছি!'

ভুলোমন মাস্টারমশাই

তখনো আমি এ গল্পটা কোথাও পড়ি নি। শুনেছিলাম সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে।

পাড়াগাঁয়ের মাস্টারমশাইয়েয় গরু হারিয়েছে। পাগলের মত আশে-পাশের সমস্ত গ্রাম, মাঠ, ঝোপ-জঙ্গল চষে বেড়িয়েছেন। গরু-খোঁজা যাকে বলে আর কি। এ বিষয়ে যার কোনো অভিজ্ঞতা বা ধারণা নেই তার পক্ষে বোঝা অসম্ভব যে এ কি কঠিন কাজ। কাঁটালতায় শরীর ছড়ে গিয়েছে, পায়ের গোড়ালিতে বেলকাঁটা গেঁথে গেছে, দরদর করে ঘাম বেরোচ্ছে, ক্লান্ত মাষ্টারমশাই বাড়ি ফিরলেন শূন্য হস্তে। না, ঠিক শূন্য হস্ত নয়, হাতে পাটের দড়ি রয়েছে, গরু খুঁজে পেলে যেটা দিয়ে বেঁধে আনতেন ; ছোটো একটা বাঁশের কঞ্চিও আছে হাতে, পলাতক গরুটাকে ধরতে পারলে আচ্ছা করে চাবকাতেন মাস্টারমশাই। কিন্তু তাঁর সে বাসনা পূর্ণ হয় নি।

সারাদিন গরু খুঁজে খুঁজে সন্ধ্যাবেলা হাঁপাতে হাঁপাতে বাড়িতে ফিরে ঘরের দাওয়ায় এসে বসলেন। সেখানে হ্যারিকেনের আলোয় তাঁর ছেলে

ইস্কুলের পড়া করছিলো। মাস্টারমশাই তাঁকে বললেন, 'ভাই, এক গেলাস জল দাও তো।' ছেলেকে ভাই সম্বোধন করা দেখে ঘরের মধ্য থেকে মাস্টার-গৃহিণী ঝংকার দিয়ে বেরিয়ে এলেন, 'তোমার কি বুদ্ধিশুদ্ধি সব লোপ পেয়েছে, নিজের ছেলেকে ভাই বলছো?'

প্রলয়ঙ্করী স্ত্রীকে মাস্টারমশাই করজোড়ে বললেন, 'কিছু মনে করবেন না মা। গরু হারালে মানুষের যে কি অবস্থা হয়, সে আপনি বুঝবেন না, মা ঠাকরুন।'

গরু-হারানো অথবা গরু-না-হারানো এই যে বুদ্ধিভ্রষ্ট মাস্টারমশাই, বিলিতি হাসির গল্পে তিনি এক অনন্য চরিত্র। কোনো একটি বিশেষ চরিত্র নিয়ে বেশি রসিকতা আছে তা হিসেব করা হলে হয়তো দেখা যাবে শাশুড়ী ঠাকুরুন বা মাতালের পরেই আসছেন ভুলোমন মাস্টারমশাই বা অ্যাবসেণ্ট-মাইণ্ডেড প্রফেসর (The absent-minded professor) চরিত্রটি।

মাতাল সম্পর্কে সামান্য যৎকিঞ্চিৎ কিছুদিন আগে লিখে বেশ গোল-মালে আছি। পরম পূজনীয়া শাশুড়ী ঠাকরুন সম্পর্কে লেখার সাহস কোনো বাঙ্গালীরই নেই, আমারও নেই, খুব একটা কারণও নেই। তার চেয়ে সরল, সাদামাটা মাস্টারমশাইয়ের গল্প অনেক ভালো।

এই মাস্টারমশাই কিন্তু সব সময়েই খুব সাধারণ লোক তা নন। অনেক সময় তিনি নিউটন, অনেক সময় তিনি আইনস্টাইন, কখনো বা খুব কাছের মানুষ সত্যেন বসু।

ভুলোমন মাস্টারমশাইয়ের সঙ্গে তাঁর এক পুরনো চেনা লোকের দেখা। দেখে খুব খুশি হলেন তিনি, সেই ভদ্রলোকের হাত ধরে বললেন, 'কেমন আছেন আপনি অনুপমবাবু? আপনার চেহারা একদম বদলিয়ে গিয়েছে। কত রোগা ছিলেন, মোটা হয়ে গেছেন। গায়ের রং বেশ চেকনাই দিয়েছে, এদিকে মাথায় টাক ঢেকে নতুন চুল গজিয়েছে। আপনি সত্যি একদম বদলিয়ে গেছেন অনুপমবাবু।'

অনুপমবাবু নামে অভিহিত হয়ে দ্বিতীয় ব্যক্তিটি কিন্তু প্রতিবাদ করলেন, তিনি বললেন, 'আপনি ভুল করেছেন, আমার নাম অনুপম নয়।' নিজের গালে হাত দিয়ে তাজ্জব বনে গেলেন মাস্টারমশাই, 'সে কি, নিজের নামটাও বদলিয়ে ফেলেছেন?'

বলা বাহুল্য, আমাদের এই ভুলোমন মাস্টারমশাই পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের গল্পের সেই একই ভদ্রলোক, যিনি বাড়ি ফিরে বিছানায় শোয়ার সময় নিজেকে লাঠি ভেবে সারারাত দরজার পাশে দাঁড় করিয়ে রেখেছিলেন আর হাতের লাঠিটিকে শুইয়ে দিয়েছিলেন বিছানার উপরে ঘুমানোর জন্য।

এই মাস্টারমশাই একদিন সন্ধ্যাবেলা বেড়াতে বেরিয়ে একটু তাড়া-তাড়ি বাড়ি ফিরে এসেছেন। দরজায় কড়া নাড়তে তাঁর গৃহভৃত্য ভেবেছে, অন্য কেউ এসেছে বুঝি, ভেতর থেকে সে বললো, 'পরে আসবেন। মাস্টারবাবু বেড়াতে বেরিয়েছেন, এখনো ফিরে আসেন নি। আপনি একটু ঘুরে আসুন।' মাস্টারমশাই সঙ্গে সঙ্গে নিজের বাড়ির দরজা থেকে ফিরে

গেলেন ; বলে গেলেন, 'ঠিক আছে, আমি ঘণ্টাখানেক ঘুরে আসছি।'

ভুলোমন মাস্টারমশাইকে কে যেন জিজ্ঞাসা করেছিলো, 'আচ্ছা আপনার বন্ধু জগদীশবাবু নাকি সম্পূর্ণ পাগল হয়ে গেছে? সে নাকি একলা কথা বলে?' অনেকক্ষণ চিন্তা করলেন মাস্টারমশাই, তার পর জানালেন, 'দেখুন, আমার পক্ষে বলা কঠিন। আমি যখন ওর কাছে যাই তখন তো আর ও একলা থাকে না। আর ও যখন একলা থাকে তখন তো আমি নেই। আমি কি করে বলবো, বলুন তো? ও একা একা কথা বলে কিনা, আমি কি করে জানবো?'

এ সমস্যা প্রায় সেই নিউটন সাহেবের বিখ্যাত সমস্যার মতো, 'বড় খরগোশটা তো বড় দরজা দিয়ে ঢুকবে কিন্তু ছোট খরগোশটার জন্যে ছোট দরজা নেই, সে ঢুকবে কোন্ দরজা দিয়ে?'

অল্পবয়েসে মাস্টারমশাই তাঁর এক বন্ধুর বিয়েতে বরযাত্রী গিয়েছিলেন। অনেক লোক এক সঙ্গে এক বাড়িতে বিয়ের আগের রাতে গিয়ে ওঠেন। পরের দিন বিয়ের লগ্নের কিছু আগে বিকেলবেলায় বরকর্তা অর্থাৎ সেই বন্ধুর বাবা দেখলেন মাস্টারমশাইয়ের গালে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি হলো, এই বিয়ের দিনে বরযাত্রী তুমি, দাড়ি কামাও নি!' মাস্টারমশাই নিজের গালে হাত বুলিয়ে চিন্তিতভাবে বললেন, 'ও, দাড়ি কামানো হয় নি বুঝি? আমি কিন্তু সকালবেলায় দাড়ি কামাতে বসেছিলাম। তবে একটা বড় আয়নায় চার-পাঁচজন এক সঙ্গে দাড়ি কামাচ্ছিলাম, আমি বোধহয় ভুল করে অন্য কারো দাড়ি কামিয়ে দিয়েছি।'

সাবধান! এই সাদাসিধে মাস্টারমশাইকে দেখে আপনার যতই মমতা হোক, কখনো ভুলেও তাঁকে বাসায় আসতে বলবেন না, খেতে কিছুতেই বলবেন না। তিনি আসবেন না, খাবার নষ্ট হবে।

আর তাছাড়া এলেও খুব সুবিধে নেই। সে হয়তো আরো গোলমেলে ব্যাপার হবে।

আমার প্রতিবেশী ভরদ্বাজবাবু একবার ভুলোমন মাস্টারবাবুকে নেমন্তন্ন করে খুবই জব্দ হয়েছিলেন। অবশ্য এতে ভরদ্বাজবাবুর কোনো দোষ ছিলো

না। মাস্টারমশাইয়ের প্রতি বিশেষ মমতাবশতই তিনি তাঁকে একদিন খেতে বলেছিলেন।

ঘটনাটা অনেকটা এই রকম। ভরদ্বাজবাবু, ঐ মাস্টারমশাই এবং আমি, আমরা সবাই কাছাকাছি থাকি। এখন ঘটনাচক্রে হয়েছে কি, মাস্টার-মশাইয়ের গৃহভৃত্যটি, যে তাঁর দেখাশোনা ও রান্নাবান্না করে, সে দু'দিনের জন্যে বাড়ি গিয়ে প্রায় মাসখানেক আসছে না। ফলে মাস্টারমশাইকে বাড়ির বাইরে একটা হোটেলে, বাড়ি থেকে বেশ কিছু দূর হেঁটে গিয়ে দু' বেলার খাওয়াদাওয়া করতে হচ্ছে।

এই রকম এক সন্ধ্যাবেলা আমি আর ভরদ্বাজবাবু দুজনে রাস্তা দিয়ে গল্প করতে করতে বেড়িয়ে ফিরছি। হঠাৎ দেখি মাস্টারমশাই আসছেন। রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মাস্টারমশাইয়ের সঙ্গে প্রথমে কুশল বিনিময়, তারপরে বৈকালিক ভ্রমণের উপকারিতা, তারপরে শিক্ষাব্যবস্থায় দুর্নীতি, তারপরে আসাম ইত্যাদি নিয়ে প্রায় পনেরো-বিশ মিনিট গল্পগুজব হলো। আমি আর ভরদ্বাজবাবু যখন অবশেষে মাস্টারমশাইয়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে আসছি, মাস্টারমশাই আমাদের একটা অদ্ভুত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন, 'আচ্ছা, আপনাদের যখন আমার সঙ্গে দেখা হয়েছিলো তখন আমি ওদিক থেকে এদিকে আসছিলাম, নাকি এদিক থেকে ওদিকে যাচ্ছিলাম?'

এই প্রশ্নে আমি একটু বোকার মতো জিজ্ঞাসা করলাম, 'কেন, বলুন তো?' মাস্টারমশাই চিন্তিত মুখে বললেন, 'যদি ওদিক থেকে আসি তা হলে হোটেল থেকে খেয়ে ফিরছি, আর যদি এদিক থেকে যাই তা হলে হোটেলে খেতে যাচ্ছি।'

সাদাসিধে লোকটার উপরে কেমন মায়া হলো। ভরদ্বাজবাবু নেমন্তন্নই করে বসলেন, 'সামনের শনিবার দিন সন্ধ্যাবেলায় মাস্টারমশাই আপনি আমাদের বাড়িতে খাবেন।'

ভারদ্বাজবাবু আমাকেও নেমন্তন্ন করেছিলেন। আমাদের সমস্ত আশঙ্কা অমূলক প্রমাণ করে মাস্টারমশাই ঠিক সময়ে খেতে এলেন এবং ভরপেট খেয়ে গেলেন।

অসুবিধা হলো পরের দিন সন্ধ্যাবেলা। রাস্তায় আমি আর ভরদ্বাজ-বাবু বেড়াচ্ছি, আবার মাস্টারমশাইয়ের সঙ্গে দেখা। খুব লজ্জিত, খুবই কাঁচুমাচুভাব মাস্টারমশাইয়ের। হাত জোর করে বললেন, 'ভরদ্বাজবাবু, দয়া করে দোষ নেবেন না। এই আপনাকে দেখে এইমাত্র মনে পড়লো। কাল রাতে আপনার ওখানে নেমন্তন্ন ছিলো। একদম ভুলে গিয়েছিলাম। যাওয়া হয় নি বলে কিছু মনে করবেন না। পরে একদিন গিয়ে ঠিক খেয়ে আসবো।'

ভুতের কাণ্ডজ্ঞান

ভাগ্য এবং জীবিকাসূত্রে আজ বছরখানেক হলো আমি একটি রহস্যময় বাড়িতে বসবাস করছি, বাড়ি না বলে বলা উচিত প্রাসাদোপম অট্টালিকা। গভীর নিশীথে এ বাড়ির আনাচেকানাচে নূপুরের নিক্কণ, রূপসীর ক্রন্দনধ্বনি, বুকফাটা দীর্ঘশ্বাস শোনা যায়। কখনো বালুবেলায় উদ্দাম ঢেউয়ের মতো দূরে কোথাও থেকে উন্মাদের অট্টহাসি এ বাড়ির দেয়ালে আছড়িয়ে পড়ে।

আমার একতলায় থাকেন ডাক্তার বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি প্রকৃতই ডাক্তার, চিকিৎসা বিদ্যার ডাক্তার, অ্যানেসথেসিয়া অর্থাৎ অবেদনের অধ্যাপক, রীতিমত বিজ্ঞানবাদী। তিনি হঠাৎ একদিন সন্ধ্যাবেলা আমাকে বললেন, 'মশায়, একটা খোঁজ নেবেন তো এ বাড়িতে কখনো কেউ খুনটুন হয়েছিলো কি না, কেউ আত্মহত্যা করেছিলো কি না?'

একটু আগে লোডশেডিং হয়েছিলো, তাই দুজনেই বাড়ির পাশের ফাঁকা মাঠটায় বসেছিলাম। ডাক্তারবাবুর প্রশ্নে জরাজীর্ণ, অন্ধকার বাড়িটার দিকে তাকিয়ে বুকের ভেতরটা কেমন ছমছম করে উঠলো। এ রকম দু-একটা বাড়ি শহরতলীর বা পুরনো গ্রামগঞ্জের একান্তে ফাঁকা মাঠের মধ্যে দেখা যায়, কিন্তু একেবারে মহানগরের হৃৎপিণ্ডের মধ্যে, কি রকম যেন অস্বাভাবিক, কি রকম যেন ফাঁকা ফাঁকা মনে হয়। অনেক সময়
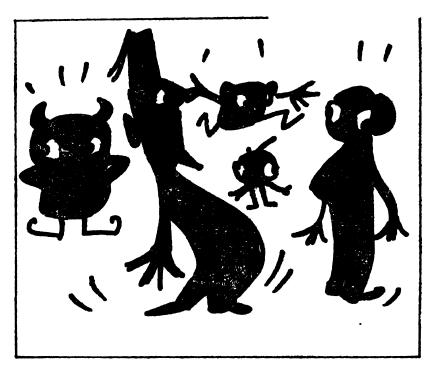
কাঠের সিঁড়িতে মানুষের পায়ের শব্দ শুনতে পাই, আলগা কথাবার্তা। দরজা খুললে কিন্তু কাউকে নামতে অথবা উঠতে দেখি না। ভয় হয়, গরীব মানুষ, বড় বাড়িতে থাকার লোভে শেষে সবংশে নিধন না হই।

প্রথম প্রথম ভূতের বিরুদ্ধে যথাসাধ্য লড়াই করেছিলাম। বাথরুমের একটা সাবানে ভূত প্রতিদিন রাতে, সে যে এসেছিলো সেটা জানাত, নখের আঁচড় রেখে যেতো। একদিন ধরে ফেললাম ভূত মহোদয়কে, ছুঁচোর ছদ্মবেশে এসে দৈনিক রাতে সাবানটাকে দাঁত দিয়ে কাটে। বাথরুমের দরজা খুলে কুকুরটাকে ছুদিন বাথরুমের সামনে রাখলুম। ভূত এলো না। ছাদের ওপরের ট্যাঙ্ক চুঁইয়ে জল দোতলার জানলায় একটা ভাঙা কাচের শার্সির ওপরে পড়ে, পাশের ঘর থেকে অন্ধকার রাতে মনে হয় নূপুর বাজছে, সেটাও আবিষ্কার করলাম।

এই রকম ছু-চারটে ধরে ফেললাম। কিন্তু ভয় এখনো কাটে নি।

আমার সাহস এখন খুব কম। ভূত বিশ্বাস করি না কিন্তু ভয় পাই। ভূতের ব্যাপারে সাহসের ব্যাপারে আমার বন্ধু চৌধুরী সাহেবের গল্পটা বলি।

চৌধুরী সাহেব গিয়েছিলেন মুর্শিদাবাদে, উঠেছিলেন মুর্শিদাবাদের সদর শহর বহরমপুরে সারকিট হাউসে। এটা সেই পুরনো সারকিট হাউস। এর সংলগ্ন পেছনের জমিতে আজকাল নতুন সারকিট হাউস হয়েছে, সেটা আলাদা। কিন্তু এই বহু পুরনো সারকিট হাউসটি, এর আশেপাশের সরকারী আবাসগুলি, এমনকি জেলাশাসকের বাড়িটি পর্যন্ত ভৌতিক সম্পদের জন্য বিখ্যাত।

এখানকার প্রধান বিশেষত্ব হলো কলকাতার ফোর্ট উইলিয়াম এবং রাইটার্স বিলডিংস আর দার্জিলিং-এ একটা পোড়ো বাড়ি বাদ দিলে সারা পশ্চিমবঙ্গে শুধু এখানেই এখনো সাহেবভূত আছে।

এইখানে ভূতেদের বিষয়ে দু-একটা কথা লিখে রাখি। সম্প্রতি প্রাণের দায়ে বিষয়টি আমি অধ্যয়ন করেছি। নানা রকম, নানা জাতের ভূত আছে। সাধারণ হিন্দু ভূত-পেত্নী ছাড়াও, অপঘাতে মৃত ব্রাহ্মণ ভূত রয়েছে। তারা হলো ভূত সমাজের শিরোমণি, তাদের বলা হয় ব্রহ্মদৈত্য, হিন্দিতে বলে বরমপিশাচ। মুসলমান ভূত হলো মামদো, শব্দটা মহামেডানের অপভ্রংশ। সাহেব ভূত হলো স্পুক, মেমসাহেব পেত্নী হলো পিক্সি।

আজকাল ভূত-পেত্নী এমনিই খুব কমে গেছে। স্পুক বা পিক্সি তো দেখাই যায় না। যা হোক, এই রকম একটি স্পুক এখনো বহরমপুরের পুরনো সারকিট হাউসে আছে। কেউ বলে ইনি স্বয়ং ক্লাইভ সাহেব, কেউ বলে ওয়ারেন হেস্টিংস। আবার কারো ধারণা, ইনি ফাদার জিন নামে এক প্রাচীন পাদ্রী, অন্যদের ধারণা এক নীলকর সাহেব, যে দেড়শো বছর আগে এ বাড়িতে খুন হয়েছিল।

সে যা হোক, সাহেব ভূতরা খুব খারাপ হয় না। তারা কোটপ্যাণ্ট পরে নিরিবিলিতে থাকতেই ভালোবাসে, তাদের দেখলে, শুধু 'হ্যালো, মিস্টার স্পুক' বললেই তারা খুশি।

বহরমপুরের পুরনো সারকিট হাউসের একটি ঘরে চৌধুরী সাহেবের ঘুম

ভাঙলো এক রাতে। আলোর সুইচটা বিছানা থেকে অনেক দূরে, চৌধুরী সাহেব বাথরুমে যাওয়ার জন্যে উঠলেন। ঘরটা ভালো চেনা নয়, আজকেই এসেছেন। ঘরের সঙ্গেই বাথরুম রয়েছে কিন্তু তিনি অন্ধকারের মধ্যে বাথরুমের দরজা ভুল করে ভিতরে হল-ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লেন। উপরে স্কাইলাইট থেকে ক্ষীণ চাঁদের আলোয় চৌধুরী সাহেব দেখতে পেলেন, হলঘরে সোফার মধ্যে অন্ধকারে বিলিতি পোশাক পরা কে একজন বসে রয়েছে। চৌধুরী সাহেবের বুঝতে এক মুহূর্ত দেরি হলো না, সঙ্গে সঙ্গে অভিনন্দন জানিয়ে বললেন, 'হ্যালো, মিস্টার স্পুক।' ছায়ামূর্তিটা ঘাড় দোলালো, চৌধুরী সাহেব বিনীতভাবে ইংরেজিতে জিজ্ঞাসা করলেন, 'মিস্টার স্পুক, আপনি তো পুরনো বাসিন্দা, দু-একশো বছর এ বাড়িতে হয়ে গেলো। আমাকে একটু দয়া করে বলে দেবেন বাথরুমটা কোন্ দিকে।' মিস্টার স্পুক কিন্তু সহজ বাংলায় বললেন, 'ভেতরে ঢুকে বাঁ দিকে।'

চৌধুরী সাহেবের এই বৃত্তান্ত শুনে আমি বলেছিলাম, 'বস্তুটি সাহেব ভূত না হয়ে জ্যান্ত বাঙালীও তো হতে পারে? হয়তো ঘর খালি পায় নি, তাই হলঘরে রাত কাটাচ্ছিলো।' চৌধুরী সাহেব বলেছিলেন, 'পাগল নাকি মশায়! একে বহরমপুর সারকিট হাউস, অন্ধকার মধ্য রাত, কোট-প্যাণ্ট পরে চুপচাপ বসে আছে, সাহেব ভূত না হয়ে যায়?'

এতটা লিখে, এখন এই রাত বারোটায় কেমন যেন মনে হচ্ছে, ভূতের ব্যাপারটা কাণ্ডজ্ঞানে টেনে আনা সঙ্গত হয় নি। আমার ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক নিরাপত্তার প্রশ্ন আছে। তা ছাড়া, বাঙালী পাঠক ভূতের বিষয়ে মজার কথা অনেকদিন ধরেই শুনছেন।

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় ভূত চিপে তেল বের করেছিলেন। পরশু-রামের 'ভূশণ্ডির মাঠে' কিংবা 'মহেশের মহাযাত্রা' অন্তত দশবার করে পড়ে নি এমন পাঠক আছে কি? আর সেই জটাধর বক্সী, দিল্লির গোল মার্কেটের ক্যালকাটা টি ক্যাবিনে সেই বহিরাগত, সে কি জোচ্চোর না ভূত?

শিবরাম চক্রবর্তীরও কোনো তুলনা নেই। দার্জিলিং-এ জলাপাহাড়ে

বড় ভূতের উপদ্রব, আগের বারে মনুষ্যবেশী ভূত যে ব্যক্তিটিকে খাদে ধাক্কা দিয়ে ফেলে মেরেছিলো, সে সেই জায়গাতেই এবারেও বসে আছে, তবে এখন সে নিজেও ভূত। কিন্তু পুরনো ভূত তা বুঝতে পারে নি, তাকে এবারও ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিতে গিয়ে নতুন ভূতের অশরীরী দেহের ভেতর দিয়ে গলে গিয়ে পুরনো ভূত নিজেই খাদে পড়ে গেলো।

আর শেষতম শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়। সরল, অমায়িক, মিশুকে ভূতেরা শীর্ষেন্দুর পোষমানা। শীর্ষেন্দু সামান্য স্মরণ করলেই তারা তাদের সূক্ষ্মদেহ শীর্ষেন্দুর কলমের নিবের ফাঁকে গলিয়ে দেয়।

সুতরাং ভূতের কাণ্ডজ্ঞানে প্রয়োজন নেই। তবে শেষ করার আগে ভূত সম্পর্কে আমার নিজের একটা সাহসের গল্প বলি।

গল্পটা পনেরো বছর আগেকার। তখন আমি এত কাপুরুষ ছিলাম না। তখন আমাদের পুরনো পণ্ডিতিয়া পাড়ার সন্ধ্যা সঙ্ঘ ক্লাবের গৃহনির্মাণ তহবিলে টাকা তোলা হচ্ছে। যদিও এ কাজে আমি খুব পটু নই, আমার উপরে পড়েছিলো একশো টাকা চাঁদা আদায়ের দায়িত্ব। টাকা-পয়সা কিছু আদায় করতে পারি নি কিন্তু চাঁদার বইটা আমি সব সময় পকেটে রাখতাম।

ঐ সময় একটা কাজে একটু পাটনা গিয়েছিলাম। উঠেছিলাম একটা ধর্মশালায়। এক বন্ধুর বোনের পাটনায় বিয়ে হয়েছে, সন্ধ্যাবেলায় তাকে দেখতে গিয়েছিলাম, ধর্মশালার নাম শুনে সে বললো, 'ও তারাপদদা, ওখানে থাকবেন না, ওখানে ভীষণ ভূতের উৎপাত।'

সত্যি রাতে ভূত এলো। বিছানায় ঘুমিয়ে আছি ধর্মশালায়, হঠাৎ কিসের শব্দে ঘুম ভাঙতে দেখি মশারির বাইরে ছায়া-ছায়া কি যেন হাত বাড়িয়ে আমার বালিশের নিচে কি খুঁজছে। বাধ্য হয়ে জানতে ইচ্ছে হলো, 'ভূত নাকি?' বালিশের নিচে হাতটি শক্ত হলো, মুখ দিয়ে চন্দ্রবিন্দু লাঞ্ছিত দুটি শব্দ বেরোলো, 'হাঁ ভূত।' বালিশের নিচ থেকে ম্যানিব্যাগ, টর্চ ও হাতঘড়িটা বার করে নিলাম। এক পাশে ছিলো সন্ধ্যা সঙ্ঘের চাঁদার খাতাটা, সেটা ভূতের হাতে তুলে দিয়ে বললাম, 'ভূতজী, এ ঘরে

আরো অনেক লোক শুয়ে আছে। আপনি নিশ্চয় তাদের কাছেও যাবেন। দেখবেন তো আমাদের ক্লাবের গৃহনির্মাণ কাণ্ডে কিছু আদায় করা যায় কি না। বড়ো ফ্যাসাদে আছি, একশোটা টাকা তুলতেই হবে।' তারপর মানিব্যাগ, ঘড়ি ইত্যাদি বালিশের খোলের মধ্যে ভরে সেটাকে শক্ত ক'রে জাপটে আবার ঘুম দিলাম।

ভূতজী আমার বাংলা বুঝতে পেরেছিলেন কি না জানি না, কিন্তু তিনি যে এসেছিলেন তার প্রমাণ, পরদিন ভোরে ধর্মশালার উঠোনে দেখলাম চাঁদার খাতাটি তিনি রেগে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে রেখেছেন।

বানরের কাণ্ডজ্ঞান

এক সার্কাসের দলে একটা বানরের বাচ্চা চমৎকার সব খেলা দেখাচ্ছিলো। এই একটা বিরাট কুকুরের পিঠে চড়ে মুখে লাগাম টেনে কুকুরটাকে ঘোড়ার মতো চালাচ্ছে, আবার আগুনের ওপর দিয়ে লাফিয়ে ট্রাপিজের লোহার রিংয়ের মধ্য দিয়ে গলে বেরিয়ে যাচ্ছে।

দর্শকেরা মন্ত্রমুগ্ধের মতো বানর বালকের ক্রীড়াকৌশল দেখছিলো। এমন সময় কোথা থেকে একটা বেরসিক গোদা বানর অতর্কিতে সার্কাসের তাঁবুর মধ্যে এসে বাচ্চা বানরটাকে কানে ধরে হিড়হিড় করে টানতে টানতে নিয়ে গেলো। দর্শকবৃন্দ এই অভাবিত দৃশ্য দেখে মহা হইচই বাধিয়ে দিলেন। তখন সার্কাসের ম্যানেজার সাহেব হাত জোড় করে ক্ষমাপ্রার্থী হয়ে মঞ্চে এসে দাঁড়িয়ে বললেন, 'দেখুন মশাইরা, এ ব্যাপারে আমার কিংবা আমার কোম্পানির কোনো দোষ নেই। ঐ যে ছোট বানরটা খেলা দেখাচ্ছিলো, বড় বানরটা হলো তার বাবা। বাবার ইচ্ছে নয় যে ছেলে সার্কাসে খেলা দেখায়, এতে নাকি তার সম্মানহানি হয়। তাই ছেলেকে কানে ধরে নিয়ে চলে গেলো। এ ব্যাপারে আমাদের কিছু করার নেই। বাপ না চাইলে কি আমরা নাবালক ছেলেকে দিয়ে খেলা দেখাতে পারি? বলুন, আপনারাই

বলুন।'

বানর নিয়ে ভালোই আরম্ভ করেছিলাম আজকের কাণ্ডজ্ঞান। সহসা আমার বাঙাল কর্ণকুহরে একটি প্রশ্নবোধক চিহ্ন সুড়সুড়ি দেওয়া শুরু করেছে, বানর না বাঁদর?

যতদূর মনে পড়ছে ছোটবেলায় রামায়ণে পড়েছিলাম,

ছোট ছোট বানরের
বড় বড় পেট।
পার হইতে লঙ্কা
মাথা হইল হেঁট॥

কিন্তু কৃত্তিবাসী রামায়ণ আঁতিপাঁতি করে খুঁজে 'বানর' শব্দটি কয়েক সহস্রবার পেয়ে গেলাম, এই পঙ্‌ক্তি দুটি কোথাও পেলাম না। পঙ্‌ক্তি দুটি কোথায় গেলো? হাওয়ায় মিলিয়ে গেলো? নাকি অন্য কোথাও আছে?

বরং কবি মনীশ ঘটকের সেই খ্যাতনাম্নী কুড়ানি বাঙালিনীকে অনেক সহজে হাতের কাছে পেয়ে গেলাম—

গলিতাশ্রু, হাস্তমুখী, কহে হাত ধরি,
'তরে বুঝি কই নাই ? আমিও বান্দরী।'

ছুটি বিখ্যাত বাংলা অভিধান খুলে দেখলাম, বানর মানে বাঁদর, এবং বাঁদর মানে বানর। সংস্কৃত বানর শব্দটি বাংলায় বাঁদর হয়ে গেছে, ব্যাকরণের ভাষায় তৎসম থেকে তদ্ভব। তারপর বাঁদর থেকে বাঁদুরে, বাঁদরামি। এইখানে প্রসঙ্গ সূত্রে একটা ছোট জিনিস লিখে রাখা ভালো। পূর্ববঙ্গের কথ্যভাষায় বাঁদর নেই, আছে বানর, বান্দর, বান্দরামি।

এ অবশ্য আমার বিষয় নয়। তবু সপ্তাহান্তে সাতশো শব্দ লিখতে গিয়ে এমন সমস্ত শব্দের মুখোমুখি হই, যার ব্যবহার জানি কিন্তু ব্যবহার করা উচিত কি-না জানি না। আশা করি শিক্ষিত ভদ্রজন দোষ নেবেন না, কখনো কদাচিৎ আমার এই বিপথগামিতায়।

ভো সাধারণ পাঠক, হে তরলমতি পাঠিকা, আসুন আমরা হাস্যকর প্রসঙ্গে ফিরে যাই। প্রসঙ্গটি সিংহ-চর্মাবৃত গর্দভের কাহিনীর কাছাকাছি।

সুন্দরবনের একটি তরুণ বাঘ খাদ্যের অভাবে এবং যৌবনের উত্তেজনায় জঙ্গল থেকে বেরিয়ে পড়ে। জঙ্গলে শিকার করে খাওয়া তার পোষাচ্ছে না। তা ছাড়া তার হইহল্লা, লোকজন, মেলা-বাজার এই সব খুব পছন্দ। আর একটা চাকরিও তার দরকার, কতকাল আর বিদ্যাধরীর খালে চুনো-মাছ খেয়ে কাটাবে। মা-বাবাও বুড়ো হয়েছে, তাদের সামর্থ্য নেই বড় বড় জন্তু মেরে এনে খাওয়ায়, সুন্দরবনে বড় জন্তুই বা কোথায় ? গৃহস্থ বা গৃহস্থের গরু-ছাগল ধরে খাওয়া যায়, কিন্তু সে বড় বিপজ্জনক পেশা।

সুতরাং আমাদের এই তরুণ বাঘটি অনেক ভেবেচিন্তে মনস্থির করলো যে একটা চাকরি তার জোগাড় করতে হবে। নামখানায় এক বড় সার্কাসের দল এসেছে, সে দলে অনেক বাঘ-সিংহ, হাতি-ঘোড়া, কুকুর-বানর। একদিন রাতে জঙ্গলের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে তরুণ বাঘটি হঠাৎ বহু দূর থেকে সার্কাসের আলো দেখে কৌতূহলবশত এগিয়ে এসে সার্কাসের

তাঁবুর মধ্যে ঢুকে পড়ে। ম্যানেজার সাহেব তখন ঘরে বসে কাজ করছিলেন, বাঘটি তাঁর সঙ্গে গিয়ে দেখা করে। সার্কাসের ম্যানেজার, সারা জীবন হিংস্র জীবজন্তু নিয়ে তাঁর কারবার। নতুন বাঘ দেখে তিনি ভয় পান নি। বরং জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি চাই?' বাঘটি নিবেদন করলো, সে সার্কাসে একটি কাজ চায়। অনেক রকম লাফ-ঝাঁপ, ডিগবাজি-গর্জন করে সে তার যোগ্যতা প্রমাণ করার অশেষ চেষ্টা করলো।

কিন্তু ম্যানেজারবাবু তাকে কাজ দিলেন না। বললেন, 'আমার এখানে কোনো বাঘের কাজ খালি নেই। এ সার্কাসে চারটে পুরনো বাঘ আছে। তোমাকে নিলে তাদের একজনকে ছাড়াতে হবে। তারা অনেক দিন আছে, এই বুড়ো বয়েসে যাবে কোথায়?'

ম্যানেজারবাবু অবশ্য নির্দয় নন। তরুণ বাঘটিকে পরামর্শ দিলেন, নদী পার হয়ে সামনের বাসরাস্তা বরাবর সোজা উত্তরে গেলে এক রাতে কলকাতা চিড়িয়াখানায় পৌঁছে যাবে। সেখানে এলাহি ব্যাপার, বহু জন্তু, বহু খাঁচা, বহু বাঘ। গিয়ে একটু কাঁদাকাটি করো, তোমার যা হোক একটা হিল্লে হয়ে যাবে।

উপদেশ মতো বাঘটি একদিন সাতসকালে কলকাতা চিড়িয়াখানায় এসে পৌঁছালো। কিন্তু, দুঃখের কথা, সেখানেও কোনো কাজ খালি নেই। শার্দুল যুবকটি অনেক রকম অনুনয়-বিনয়, কাকুতি-মিনতি করলো কিন্তু বাঘের সমস্ত খাঁচাই ভর্তি। এমন কি একেকটা খাঁচায় একাধিক বাঘ রাখতে হয়েছে, কোনো জায়গাই খালি নেই। শেষে বাঘটি যখন বললো, 'ঠিক আছে, সৎভাবে যখন হলো না, এখন থেকে আমি মানুষ মেরে খাবো', তখন কর্তৃপক্ষ ঘটনার গুরুত্ব উপলব্ধি করলেন, বললেন, 'আচ্ছা ঐ এক পাশে একটা ছোট খাঁচা আপাতত খালি আছে, তুমি ওর মধ্যে থাকো।'

বাঘ খাঁচার মধ্যে ঢুকলো। দর্শকেরা নতুন বাঘ দেখে খুব খুশি। বাঘ বেচারীও নতুন কাজের আনন্দে হম্বিতম্বি, তর্জন-গর্জন করে দর্শকদের অতিশয় মনোরঞ্জন করলো। সন্ধ্যাবেলা কিন্তু যখন অন্যান্য পুরনো বাঘদের দেওয়া হলো বড় বড় মাংসের খণ্ড, এই নতুন বাঘটিকে দেওয়া হলো দুটো

কলা আর এক মুঠো ছোলা। এই বৈষম্যের তীব্র প্রতিবাদ জানালো বাঘটি, সারাদিন কঠোর পরিশ্রম এবং জনতার সুপ্রশংসার পরে এই খোরাকি! সে গর্জে উঠলো। কর্তৃপক্ষ বললেন, 'রাগারাগি করে কোনো লাভ নেই। তোমাকে আগেই বলেছিলাম, বাঘের খাঁচা খালি নেই। তোমাকে বানরের খাঁচায় রাখা হয়েছে, বানরের খাবারই তোমার ন্যায্য বরাদ্দ।'

সেই বাঘটি এর পরে কি করেছিলো তার কোনো খবর নেই। কিন্তু বানরেরা শুনেছি একটা বাঘকে তাদের খাঁচায় রাখার প্রতিবাদে একদিন হরতাল করেছিলো।

বানরদের মনের জোর সত্যিই খুব বেশি। সেই বিখ্যাত তিন বানরের ছবি বা মূর্তি সবাই দেখেছে। তাদের মধ্যে একজন হাত দিয়ে চোখ ঢেকে রেখেছে—সে কোনো খারাপ দৃশ্য দেখবে না; একজন দু' হাত দিয়ে দু' কান চাপা দিয়েছে—কোনো কুবাক্য শুনবে না; আর তৃতীয় বানরটি হাত দিয়ে মুখ ঢেকে রেখেছে—সে কিছুতেই কোনো খারাপ কথা বলবে না।

কিন্তু অনুসন্ধিৎসু, ধীমান পাঠক, যদি আপনার হাতের কাছে ঐ ছবি বা মূর্তি একটি থাকে দয়া করে আরেকবার ভালো করে তাকিয়ে দেখুন।

ঐ যে প্রথমটি হাত দিয়ে চোখ ঢেকে রেখেছে, তার কিন্তু হাতের আঙুলের মধ্যে মধ্যে একটু ফাঁক আছে। সেই ফাঁক দিয়ে সে কিছু দেখছে না এমন কথা হলফ করে আপনি বলতে পারবেন না।

আর দ্বিতীয়টি, সে হাত দিয়ে কান ঢাকা দিয়েছে কিন্তু হাতের তালুর ফাঁক দিয়ে মনে হচ্ছে সে সব কিছুই শুনছে। শুনতে পাচ্ছে না এটা তার ভান মাত্র।

সর্বশেষ, পিছনের ঐ হাত দিয়ে মুখ চাপা দেওয়া বানরটি, হ্যাঁ, একথা ঠিক সে কিছুই বলছে না। কিন্তু একবার তার মুখের দিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখুন, সে কিন্তু অনেক কিছুই ভাবছে, আর কখনো কখনো কোনো কথা বলার চেয়ে কোনো কিছু ভাবাও কম খারাপ নয়, আপনারাই ভেবে বলুন।

কিঙ্কর-কিঙ্করী

নতুন কাজের মেয়েটি একটু দায়সারা ভাবে ঘর মুছছিলো। তাই দেখে গৃহিণী তাকে বললেন, একটু ভালো করে, যত্ন নিয়ে ঘরের মেঝেটা মুছতে। নবনিযুক্তা পরিচারিকাটি এই কথা শুনে গালে হাত দিয়ে চোখ গোলগোল করে বললো, 'অমন অলক্ষুনে কথা বলো না গো, বউদি!'

পরিচারিকার এই জবাবে গৃহিণী রীতিমত বিব্রত বোধ করলেন। ঘর মোছার মধ্যে সুলক্ষণ-অলক্ষণ কি আছে?

বিশেষ কিছু জিজ্ঞাসা করতে হলো না। মেঝে মোছা থামিয়ে পরিচারিকাটি নিজেই ব্যাখ্যা দিলো, 'আগের বাড়ির বউদি ঠিক এই রকম বলতো, তাদের মেজে মুছে মুছে এমন পিছলে হয়ে গিয়েছিলো যে দাদাবাবু

পা হড়কে পড়ে গিয়ে কোমরের হাড় ভেঙে আজ চার মাস হাসপাতালে।'

স্বীকার করা উচিত যে, এই পরিচারিকাটি ভালোভাবে ঘর না মোছার যে অব্যর্থ অজুহাত দেখিয়েছে তার তুলনা নেই। হয় সে খুব বুদ্ধিমতী, না হয় খুবই সরল।

পরিচারিকাদের সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের ধারণা একটু অন্যরকম ছিলো। বঙ্কিমচন্দ্রই বা কেন, সেই রামায়ণের মন্থরা থেকে সাহিত্যে কিঙ্করী-কীর্তন শুরু হয়েছে। দেশী-বিদেশী মহাকাব্য-নাটকে, গল্প-উপন্যাসে কিঙ্কর-কিঙ্করীর ভূমিকা কিছু কম নয়। বড়লোক দেশগুলিতে আজকাল অবশ্য উচ্চ মধ্যবিত্ত পরিবারগুলিও ঝি বা চাকর রাখতে পারে না। আমাদের মতো দেশে ভৃত্যতন্ত্র এখনো চমৎকার চলছে, এবং আমাদের জীবনে তার ভূমিকা কিছু কম নয়। সকালে উঠে কাজের লোক ঠিকমত না এলে, চিৎকার-চেঁচামেচি-হইচই, একটা সাধারণ পরিবারের চেহারা বদলিয়ে দেয়।

ঠিকে কাজের মেয়েটি এসে গেলেও খুব সুখকর নয়। অনেক সময়ই সে খুব মুখরা ও কলহপরায়ণা। তার চেয়েও বিপদ, সে প্রতিবেশীদের মধ্যে ঝগড়া বাধিয়ে দেয়।

বঙ্কিমচন্দ্রের কথা বলছিলাম, 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' বঙ্কিমচন্দ্র লিখে-ছিলেন :

'সুবিধা হউক, কুবিধা হউক, যাহার চাকরানী নাই তাহার ঘরে ঠকামি, মিথ্যা সংবাদ, কোন্দল এবং ময়লা এই চারিটি বস্তু নাই। চাকরানী নামে দেবতা এই চারিটির সৃষ্টিকর্তা। বিশেষ, যাহার অনেকগুলি চাকরানী, তাহার বাড়িতে নিত্য কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ, নিত্য রাবণবধ।'

বঙ্কিমচন্দ্র হয়তো কিঞ্চিৎ অতিরঞ্জন করে ফেলেছিলেন। কিন্তু আমার এই ক্ষুদ্র জীবনে আমি নিজেও দু-একটি মারাত্মক নমুনা দেখেছি।

একদিন সকালবেলায় দেখেছিলাম মনোহরপুকুর রোডে। গৃহস্থ বাজার করে ফিরছেন, প্রাক্তন (সম্ভবত সদ্য ত্যক্ত) পরিচারিকা পথের ওপরে তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছিল। দৃষ্টিপথে আসামাত্র, অতিকায়া ভীমরূপা মহিলাটি চিল যেভাবে ইঁদুরছানা ধরে সেইভাবে কিংবা তার

চেয়েও ক্ষিপ্রগতিতে ক্ষীণপ্রাণ, শীর্ণতনু তার পুরনো মনিবের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়লো। মনিব ভদ্রলোক একবারমাত্র কোঁক করার সুযোগ পেলেন, তাঁর শার্টের কলার ধরে হিড়হিড় করে টানতে টানতে পরিচারিকাটি কোনো অনির্দিষ্ট লক্ষ্যে তাঁকে নিয়ে চললো। ভদ্রলোকের হাত থেকে তাঁর বাজারের থলে মাটিতে পড়ে গেলো। ভদ্রলোক সেদিন কয়েকটা তাজা ছোট ছোট কই মাছ কিনেছিলেন, পতিত থলে থেকে সেই চঞ্চল মাছগুলি বেরিয়ে ফুটপাথের উপর লাফাতে লাগলো।

আমার স্মৃতিতে এই দৃশ্যটি অবিস্মরণীয় হয়ে রয়েছে। আমি হরিণঘাটার দুধ-নিয়ে বাড়িতে ফিরছিলাম, হাতের বোতলের দুধ জমে দই হয়ে গিয়েছিলো। পাঁচ বছর আগের ঘটনা। কিন্তু এরকম তো আমারও হতে পারতো। ভাবলে রীতিমত হৃৎকম্প হয়।

অবশ্য আমাকে এখনো ব্যক্তিগতভাবে আমার গৃহভৃত্য বা পরিচারিকার হাতে নিগৃহীত হতে হয় নি। তবে বছর দুয়েক আগে আমার দূর সম্পর্কের এক শালার বউয়ের মাথায় রান্নার ঠাকুর আঘাত করায় তিনি অজ্ঞান হয়ে যান। পাচকটির কোনো চুরি বা ডাকাতি করার উদ্দেশ্য ছিলো না। গৃহিণী সকাল থেকে খিচখিচ করছিলেন, পাচক নিঃশব্দে রান্না করে যাচ্ছিলো, হঠাৎ শেষ পর্যন্ত ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে ভাতের হাতা দিয়ে মনিবানীর মাথায় একটি আঘাত করে উধাও হয়ে যায়। বাসায় তখন আর কেউ ছিলো না। ঠাকুরটি সদর দরজা ভেজিয়ে রেখে মোড়ের মাথায় ডাক্তারবাবুকে খবর দিয়ে যায়, 'বারো নম্বর বাড়ির বউদির শরীরটা ভালো নেই। আপনাকে এখনই একবার ডেকেছে।' সেদিন ডাক্তার এসে শূন্য গৃহে ঐ শালাজকে ঐভাবে পড়ে থাকতে দেখেন, অবশেষে পাড়াপ্রতিবেশী ডেকে, সেবা-শুশ্রূষা করে, ওষুধ দিয়ে মহিলার জ্ঞান ফেরানো হয়। পাচকটি কিন্তু আর আসে নি, তার আর খোঁজ পাওয়াই যায় নি।

আমার সেই মিষ্টভাষিণী, সদাহাস্যময়ী, সুন্দরী শালাজ সাতসকালে পাচকটিকে এমন কি কটুবাক্যে জর্জরিত করেছিলেন যাতে সে প্রভুপত্নীকে

এমন নির্দয়ভাবে আঘাত করে, সে তথ্য কিন্তু জানা যায় নি। কিন্তু আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আছে, চমৎকার সব মহিলারা কাজের লোকদের সঙ্গে অনেক সময় এমন আচরণ করেন যে, তাঁরা যে খুন-জখম হন না সেটাই আশ্চর্য।

তবে অনেক সময় গর্হিত কারণ থাকে। এক বনেদী বাড়ির চাকরটি সকালবেলা ঘর ঝাড়তে গিয়ে একটি অমূল্য ও সুপ্রাচীন কাটগ্লাসের ফুলদানি ভেঙে ফেলে। গৃহিণী খুব ক্ষুব্ধ ও দুঃখিত হয়ে বললেন, 'এত পুরনো জিনিসটা এতদিন পরে ভেঙে ফেললে। কবে আমার দাদাশ্বশুরের বাবা বিলেত থেকে নিয়ে এসেছিলেন জিনিসটা।' ভৃত্যটা দাঁত বার করে বললো, 'তাই বলুন, পুরনো মাল, আমি ভয় পেলাম নতুন জিনিস ভাঙলাম বুঝি।' অতঃপর ভদ্রমহিলা এক গ্লাস জল ভৃত্যটির গায়ে ছুঁড়ে দিয়েছিলেন।

আমাদের বাড়িতে কিন্তু কখনো কোনো কাজের লোককে এরকম করি না। মাঝে-মধ্যে ইচ্ছে হয় না যে তা নয়; যখন দেখি রান্নাঘর থেকে চায়ের পেয়ালা টেস্ট করতে করতে নিয়ে আসছে। কারণ আর কিছু নয়, একটা চিনি ছাড়া, তিনটে চিনিওলা এবং কোনটা কি গুলিয়ে ফেলেছে, তখন মনে হয় ১৯৯১ সালে প্রকাশিতব্য অখণ্ড রবীন্দ্র রচনাবলী দিয়ে লোকটার মাথায় মারি।

তা যে করি না তার কারণ এই নয় যে, ঐ ভারি বইটি এখনো প্রকাশিত হতে আট বছর বাকি। হাতের কাছে ভারি বইয়ের অভাব নেই, ইচ্ছে করলে 'আঞ্চলিক ভাষার অভিধান' কিংবা যে বইয়ের উপর আমার স্পষ্ট অধিকার রয়েছে, আমাকে ও মিনতিকে উৎসর্গীকৃত 'নীললোহিত সমগ্র' দিয়েও মারতে পারি।

এই তো গত মাসের শেষ শনিবার। বাসায় আমি আর আমাদের একমাত্র কাজের লোক গোবিন্দ। শেষ শনিবার বা চতুর্থ শনিবার আমার অফিস বন্ধ। ভাইয়ের অফিস খোলা, ছেলের কলেজ খোলা। দুজনেই বেরিয়েছে। স্ত্রীও কোথায় কেনাকাটা করতে বেরিয়েছেন।

বাড়িতে লোক বলতে আমি আর গোবিন্দ। টেবিলের ওপরে একটা

দশ টাকার নোট পেপারওয়েট দিয়ে চাপা দিয়ে বাথরুমে স্নান করতে গেছি, স্নান সেরে এসে দুটো রুমাল কিনতে যাবো এই উদ্দেশ্যে।

দাড়ি কামিয়ে, স্নান করে জামাকাপড় পরে বেরোতে যাবো, ওমা, দেখি যে টেবিলে টাকাটা নেই।

সঙ্গে সঙ্গে গোবিন্দকে ধরলাম, 'গোবিন্দ, এই টেবিলে পেপারওয়েটের নিচে দশটা টাকা রেখেছিলাম, সেটা কি হলো?'

গোবিন্দ সরলভাবে বলল, 'পেপারেট কি বাবু?' আমি আরও রেগে গেলাম, কাচের কাগজচাপাটা তুলে দেখিয়ে বললাম, 'এইটা, এর নিচে দশটা টাকা এইমাত্র ছিলো, সেটা কি হলো?' গোবিন্দ সরলতরভাবে জানালো যে, এ বিষয়ে ঘুণাক্ষরেও সে কিছু জানে না। কোনো দশ টাকার নোট সে দেখে নি।

আমি বললাম, 'ছাখো গোবিন্দ, বাড়িতে আমি আর তুমি ছাড়া কেউ নেই। বেশি চালাকি করবে না, টাকা দিয়ে দাও।' গোবিন্দ বললো, 'ঠিক আছে, আপনার কথা বুঝেছি বাবু, বেশি কথা বাড়াবেন না, পঞ্চাশ-পঞ্চাশ, ফিফটি ফিফটি হয়ে যাক। আপনারও পাঁচ টাকা যাক, আমাবও পাঁচ টাকা যাক।' বলে গোবিন্দ অম্লানবদনে একটি পাঁচ টাকার নোট আমাকে এগিয়ে দিলো।

তবুও গোবিন্দকে কিছু বলি নি। গোবিন্দ, গোবিন্দের মা বা গোবিন্দের বউ, যখন যেই থাক কিঙ্কর-কিঙ্করী, কাউকে কিছু বলি না। মনোহরপুকুরের ভদ্রলোক আর শালার বউয়ের পরিণতির কথা মনে করে আত্মসংবরণ করি।

ডাক্তার-ডাক্তার

আমার মতো দুঃসাহসী লেখক আজকাল সহজে খুঁজে পাওয়া যাবে না। আজ কিছুদিন হলো ভয়ঙ্কর বুকের ব্যামোয় আমার জীবন সংশয় দেখা দিয়েছে, বস্তুত আমি বেঁচে আছি কয়েকজন দয়ালু ও মহানুভব

ডাক্তার মহোদয়ের অসীম কৃপায় ও ভালোবাসায়। অথচ সেই আমি, অকৃতজ্ঞ, কৃতঘ্ন, কাণ্ডজ্ঞানহীন 'কাণ্ডজ্ঞান' লেখক, এর মধ্যেই শ্রদ্ধেয় চিকিৎসকদের নিয়ে রসিকতায় মত্ত হলাম।

অনেকদিন আগে আমাদের কালীঘাটের পুরনো পাড়ায় আমাদের স্থানীয় ডাক্তারবাবুর চেম্বারে বসে আছি। ডাক্তারবাবু প্রৌঢ়, আমার সঙ্গে বয়েসের ঢের তফাত কিন্তু তাঁর সঙ্গে আমার একটা বন্ধুত্ব দাঁড়িয়ে গিয়েছিলো। রোগী ও চিকিৎসকের মামুলি কথাবার্তা, প্রশ্নোত্তর ইত্যাদি শেষ হলে তাঁর সঙ্গে আমি সিনেমা, রাজনীতি, সাহিত্য ইত্যাদি নানা বিষয় নিয়ে গল্পগুজব করতাম।

একদিন তখন রাত প্রায় সাড়ে ন'টা। শেষ রোগী বিদায় নিয়েছে, আমি ডাক্তারবাবুর সঙ্গে কাকের কামড়ে বিষ আছে কি না, থাকলে জলাতঙ্ক হতে পারে কি না এ বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করছি। দু'দিন আগে

সকালবেলায় কি এক অজ্ঞাত কারণে হাজরা পার্কে, (তখন পার্কটির এমন শোচনীয় অবস্থা হয়নি), একটা কাক সহসা উত্তেজিত হয়ে পর পর চার-পাঁচজন নিরীহ বায়ুসেবীকে কামড়িয়ে দেয়; এই অস্বাভাবিক ঘটনাই সেদিন আমাদের এই অদ্ভুত আলোচনার কারণ। সে যা হোক, আমাদের আলোচনার মধ্যেই এক সুবেশ যুবা ডাক্তারবাবুর চেম্বারে প্রবেশ করলেন। তাঁর পরনে ঝকঝকে দামী পোশাক, পায়ে মসৃণ অ্যামবাসাডর জুতো, হাতে দামী বিলিতি হাতঘড়ি, আঙুলে হীরের আংটি।

যুবকটি আমাদের ঐ কাকের আলোচনার মধ্যে অনুপ্রবেশ করে ডাক্তারবাবুকে নমস্কার করে বললেন যে, 'ডাক্তারবাবু, আপনাকে বহু ধন্যবাদ। আপনার চিকিৎসার জন্যে আমি খুব কৃতজ্ঞ।' ডাক্তারবাবুর কাছে অনেক রোগী আসে, ডাক্তারবাবুর স্মৃতিশক্তিও খারাপ নয়, কিন্তু তিনি এই কৃতজ্ঞ ব্যক্তিটিকে চিনে উঠতে পারলেন না। একটু ভেবে নিয়ে বললেন, 'আপনাকে ঠিক চিনতে পারছি না তো, আপনার কখনো চিকিৎসা করেছি কি আমি?'

যুবকটি মৃদু হেসে বললো, 'না, আমার চিকিৎসা নয়, আপনি আমার মামার চিকিৎসা করেছিলেন, তাই কৃতজ্ঞতা জানাতে এসেছি।'

ডাক্তারবাবু আরেকটু বিচলিত হলেন, 'আপনার মামা?'

যুবকটি বললো, 'আমার মামা হলেন রায়বাহাদুর স্বর্গীয় শশধর পাল। তিনি তো আপনার হাতেই মারা গেলেন। মামার তো কেউ নেই, আমি একমাত্র ভাগ্নে, আমিই সমস্ত সম্পত্তি পেয়েছি। আপনার প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা অপরিসীম।'

অবশ্য সমস্ত ডাক্তারবাবুর ভাগ্যে এমন কৃতজ্ঞ রোগী জোটে না। একজন রোগীকে ডাক্তার ফোন করেছিলেন, 'খগেনবাবু, আপনার যে বাতের চিকিৎসা করেছিলাম তার জন্যে আপনি আমাকে চেক দিয়েছিলেন। দুঃখের কথা, সেই চেকটি ব্যাঙ্ক থেকে ফেরত এসেছে।' টেলিফোনের ওপার থেকে নির্বিকার খগেনবাবু জবাব দিলেন, 'কি আর করা যাবে বলুন। আপনি যে বাতের ব্যথার চিকিৎসা করেছিলেন, সে ব্যথাটাও ফেরত এসেছে।'

অধিকাংশ চিকিৎসকই অধিকাংশ সময়ে সুজন ও সুরসিক। বহু মৃত্যু, বিপর্যয় ও মহামারীর মধ্যে দাঁড়িয়ে তাঁরা ঠাণ্ডা মাথায়, অকম্পিত হাতে কাজ করেন। তবে এর মধ্যে দু-একজন মারকুটে ডাক্তারও আছেন। আর সবচেয়ে দুঃখের কথা, রোগীরা মারকুটে ডাক্তারদের বেশি পছন্দ করেন। নরম ডাক্তারদের চেয়ে মারকুটে ডাক্তারদের পসার অনেক তাড়াতাড়ি হয়। ভবানীপুরে একজন মারাত্মক গোলমেলে ডাক্তার ছিলেন, তাঁর নির্দেশ, পথ্যাদি ঠিকমত না মানায় প্রত্যহ একাধিক রোগী তাঁর হাতে চড়চাপড় খেতো। আমি স্বচক্ষে দেখেছি তাঁর এক গলাব্যথার রোগী পাঞ্জাবী দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে বরফ দেওয়া লস্যি খাচ্ছিলো, তিনি রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে ঐ দৃশ্য দেখে রোগীর হাত থেকে কাচের গেলাস কেড়ে নিয়ে রাস্তায় ছুঁড়ে ভেঙে ফেলেন।

এই চিকিৎসককে তাঁর এক রোগী একবার বলেছিলেন, 'ডাক্তারবাবু, আমার যে জ্বরটা ছাড়ছে না। আপনি বললেন, আমার টাইফয়েড। কিন্তু টাইফয়েডের চিকিৎসায় তো কিছু হলো না। আমার নিমুনিয়া হয় নি তো?' ডাক্তারবাবু গর্জে উঠলেন, 'নিমুনিয়া? নিমুনিয়া কেন?' মুমূর্ষু রোগী ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন, 'আমাদের অফিসের রামবাবুর ডাক্তারেরা টাইফয়েড বলে চিকিৎসা করলো। কিছু ধরতেই পারে নি, শেষে রামবাবু মারা গেলে জানা গেলো নিমুনিয়া হয়েছিলো।' ডাক্তারবাবু আরো গর্জে উঠলেন, 'ও রামবাবু-ফামবাবু ছাড়ুন। আমি যদি কারো টাইফয়েডের চিকিৎসা করি সে টাইফয়েডেই মারা যাবে; নিমুনিয়ায় নয়।'

এ সব অভিজ্ঞ চিকিৎসকের কথা বেশি বলে লাভ নেই। বরং দু-একজন তরুণ চিকিৎসকের কথা বলি। বছর দশেক আগে একদিন কলেজ স্ট্রিটের ট্রামে ধর্মতলায় আসছি, হঠাৎ গোলদীঘির সামনে কয়েকটি তরুণ যুবক দৌড়ে এসে ট্রামে উঠলেন, তারপর বুক চাপড়াতে চাপড়াতে বলতে লাগলেন, 'আমাদের ডাক্তার ডাকুন, ডাক্তার ডাকুন।' যাত্রীরা হতভম্ব, এক প্রৌঢ়া জিজ্ঞাসা করলেন, 'বাবা, তোমাদের কি হয়েছে? ডাক্তার ডাকতে বলছো কেন?' একটি উৎফুল্ল যুবক আরেকবার বুক চাপড়িয়ে উত্তর

দিলেন, 'আমাদের ডাক্তার বলে ডাকুন। আজ এম বি বি এস-এর রেজাল্ট বেরিয়েছে। আমরা পাস করেছি, ডাক্তার হয়েছি।'

জানি না, সেই সদ্য স্নাতক নবীন চিকিৎসকেরা লাল ফিতে আর ঘোরানো সিঁড়ি, হাসপাতালের নোংরা বারান্দা আর প্রাইমারি হেলথ্ সেন্টারের নিরুপায় সীমাবদ্ধতার মধ্যে দমবন্ধ দাঁড়িয়ে এখনো বুক চাপড়িয়ে বলেন কি না, 'আমাদের ডাক্তার ডাকুন, আমাদের ডাক্তার ডাকুন।'

দুঃখের কথা বাড়িয়ে লাভ নেই, চিকিৎসকদের নিয়ে দু-একটি বিলিতি মজার গল্প আরেকবার বলা যাক।

ডক্টর হোয়াইট ডক্টর গ্রীন সাহেবকে মোটেই পছন্দ করেন না, গ্রীন ডাক্তারের নাম শুনলে হোয়াইট সাহেবের আপাদমস্তক জ্বলে যায়। একদিন হোয়াইট ডাক্তারের কাছে একজন চিকিৎসার জন্যে এসেছেন, হোয়াইট সাহেব তাঁকে প্রশ্ন করলেন, এর আগে আর কাউকে দেখিয়েছেন কি না। রোগীটি জবাব দিলেন, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, গ্রীন ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলাম।' গ্রীনের নাম শোনামাত্র ডক্টর হোয়াইট উত্তেজিত হয়ে পড়লেন, 'সেই মূর্খ, স্টুপিড গ্রীন হাতুড়ে আপনাকে কি কুপরামর্শ দিলো?' হতবাক্ রোগী একটু থেমে থেকে তারপর নিচু গলায় বললেন, 'স্যার, ডক্টর গ্রীন আমাকে পরামর্শ দিলেন আপনার কাছে এসে দেখাতে।'

পরের গল্পটি বড় বিপজ্জনক। এক রোগী সার্জনের কাছে অপারেশন করাতে এসেছে। অপারেশন টেবিলে শুয়ে রোগী ডাক্তারবাবুকে বলছে, 'ডাক্তারবাবু, আমার এই প্রথম অপারেশন। আমার কেমন ভয়-ভয় করছে।' সার্জন সাহেব বললেন, 'আপনি ঠিক আমার মনের কথা বলেছেন। আমারও এটা প্রথম অপারেশন। আমারও কেমন ভয়-ভয় করছে।'

আরেকটি অপারেশনের গল্প আরো মর্মান্তিক। একটি সার্জন রোগীকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন, 'আপনার এই অপারেশনটা খুব জটিল। দশজনের মধ্যে ন'জনই মারা পড়ে। তবে আমার হাতে এখন পর্যন্ত ন'জন সবশুদ্ধ মারা গেছে। তাই মনে হয় আপনার বাঁচবার সম্ভাবনা সেন্ট পারসেন্ট, শতকরা একশো।'

এই গল্পটি অনেকে এই পর্যন্ত জানেন। কিন্তু এক বিখ্যাত শল্যবিদের কাছে এর পরের অংশটুকু শুনেছি। অপারেশন টেবিলে রোগী তাঁর অপারেশনের গুরুত্ব ও সম্ভাব্য পরিণতি হৃদয়ঙ্গম করে সার্জন সাহেবের দিকে বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে, সার্জন জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনার কি কিছু বলার আছে?' রোগীটি ক্ষীণ কণ্ঠে মিনমিন করে বললেন, 'আমার প্যান্ট আর জুতো জোড়া দয়া করে ফেরত দিন, আমি বাড়ি ফিরে যাই।'

তবে তেজস্বী রোগীরও অভাব নেই। ডাক্তারকে আক্রমণ করছে, হাসপাতাল ভাঙচুর করছে—এ রকম খবর এখন প্রতিদিনের কাগজে। সেই অসভ্যতা রসিকতারও অযোগ্য। কিন্তু সেই যে রোগীটি সার্জনকে বলেছিলেন, 'ডাক্তারবাবু, দেখবেন আমার পেটের কাটার দাগটা যেন অন্তত আট ইঞ্চি হয়।' সার্জন বলেছিলেন, 'অপারেশনের জন্যে যেটুকু প্রয়োজন সেটুকু কাটতে হবে, শুধু শুধু আট ইঞ্চি কাটতে যাব কেন?' সাহসী রোগীটি বললেন, 'ডাক্তারবাবু, অন্তত আট ইঞ্চি চাই। এর জন্যে যা লাগে আমি দেবো।' কৌতূহলী সার্জন সাহেব বললেন, 'ব্যাপারটা কি বলুন তো?' রোগীটি অপারেশন টেবিলে উঠে বসে উত্তেজিত হয়ে বললো, 'দেখুন, সারা জীবন ধরে শুনে যাচ্ছি আমার শ্যালীর ছয় ইঞ্চি লম্বা অপারেশনের দাগ আর আমার শাশুড়ির সাড়ে সাত ইঞ্চি, আমার কাটা দাগটা অন্তত আট ইঞ্চি করবেন, স্যার।'

শিক্ষাদীক্ষা

মনে করুন, আপনি কাউকে উচিত শিক্ষা দিতে চান, কোনো দায়িত্বজ্ঞানহীন বন্ধু অথবা সময়-অচেতনা বান্ধবীকে, যে আপনাকে কোনো পার্কের বেঞ্চে অথবা সিনেমা হলের সামনে আসতে বলে দেড় ঘণ্টা বা দু'ঘণ্টা অপেক্ষা করিয়ে রেখেছিলো এবং তারপরেও সে আসে নি এবং পরের দিন যখন তার সঙ্গে দেখা হলো তখনো কোনো লজ্জা নেই, অনুশোচনা নেই; যেন একজনকে একাধিক ঘণ্টা দাঁড় করিয়ে রাখা অতি সামান্য

ঘটনা।' কিন্তু আপনার কি মাথা গরম হয়ে যায় না, মনে হয় না এই কাণ্ডজ্ঞানহীন ব্যক্তিটিকে কিঞ্চিৎ উচিত শিক্ষা দিই।

আমার নিজের যখন কম বয়েস ছিলো, যে বয়স পর্যন্ত আমি বন্ধুবান্ধবীর সঙ্গে রাস্তাঘাটে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করতাম তখন কিন্তু এরকম প্রত্যেকটি গাফিলতির আমি ন্যায্য প্রতিশোধ নিয়েছি। আমি গাফিলতিকারীকে আরেকটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করতাম, কোনো রকম রাগ বা ক্ষোভ না দেখিয়ে। কিন্তু খুব লোভনীয় শর্ত থাকতো তাতে, আমি খাওয়াবো বা সিনেমা দেখাবো কিংবা কোনো নিষিদ্ধ বা দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ তাকে পড়তে দেবো। এমন প্রস্তাব যে সে আসবেই। এবার তাকে আসতে বলবো দুপুর আড়াইটায় মেট্রোর সামনে। বলবো দুটো থেকে আড়াইটার মধ্যে, তবে আমার একটু দেরি হলে যেন অপেক্ষা করে। আমি অবশ্যই যাবো না। চৌরঙ্গীর ঐ পূর্ব ফুটপাথে যেখানে এক বিন্দু ছায়া নেই বেলা একটার

পর থেকে, দক্ষিণ-পশ্চিম আকাশে উচ্চণ্ডতপ্ত সূর্য যখন পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কোনাকুনি তীক্ষ্ণ বর্শার মতো কিরণ নিক্ষেপ করছে, তখন ঐ অকুস্থলে কারো পক্ষে দু'মিনিট দাঁড়ানো অসম্ভব। সে অবশ্যই আমার জন্যে অপেক্ষা করবে অন্তত এক ঘণ্টা, অন্তত তিনটে পর্যন্ত। পরে আমাকে যখন পাবে নিশ্চয়ই গালাগাল দেবে কিন্তু তার সারা জীবনের মতো উচিত শিক্ষা হয়ে যাবে।

অবশ্য এ সব অল্প বয়েসের চিন্তা। এখন জেনে গেছি, যে সময়মত আসবে না সে কখনোই আসবে না, কেউ তাকে শিক্ষা দিতে পারবে না। সারা জীবন ধরে সে ট্রেন ফেল করবে, সিনেমা-হলে ইন্টারভ্যালের পরে হাঁফাতে হাঁফাতে ঢুকবে, বেড়াতে যাবে বলে তার স্ত্রী সারাজীবন শাড়ি পরে, সেজেগুজে বসে থাকবে কিন্তু তার কিছুতেই সময়মত আসা হবে না। কে তাকে শিক্ষা দেবে ? কবে তার শিক্ষা হবে।

শিবরাম চক্রবর্তী শিক্ষা দেওয়ার ব্যাপারে একটা সুন্দর প্রেসক্রিপশন দিয়েছিলেন। যদি কাউকে তোমার পছন্দ না হয়, মনে করো কারো বাড়িতে তুমি বেড়াতে গিয়ে তাদের আদর-আপ্যায়ন তোমার পছন্দ হলো না, নানা কারণে তোমার মনে হলো এই বেআদপ গৃহস্থটিকে কিঞ্চিৎ শিক্ষা দেওয়া দরকার, তুমি আসার সময় ঐ বাড়ির ছোট ছেলে বা মেয়েটিকে একটি ট্যামট্যামি বা ঢোল কিনে দাও। সেই শিশুটি ঐ ট্যামট্যামি পেয়ে আহ্লাদে আত্মহারা হয়ে কেবলই বাজাবে, বাজিয়ে যাবে। সকাল-সন্ধ্যা, দুপুর নেই, বিকেল নেই, সারাদিনভর ট্যামট্যামির প্রবল আওয়াজে সেই বাড়ির লোকদের কান ঝালাপালা এবং জীবন অতিষ্ঠ হয়ে যাবে। আর, একবার কোনো শিশুর যদি ঢোল বাজানোর নেশা হয়ে যায়, তার কাছ থেকে সেটি কেড়ে নিয়ে কোনো লাভ নেই ; সে যে ভাবেই হোক আবার ট্যামট্যামি সংগ্রহ করবে, ট্যামট্যামি না হলে ঢোল, ঢোল না হলে ক্যানেস্তারা বাজাবে মায়ের রান্নাঘর থেকে খালি টিন নিয়ে।

এই যে দুটি উপদেশ দিলাম শিক্ষাদান বিষয়ে, সে নিতান্তই হিংসামূলক এবং দুষ্টবুদ্ধিপ্রসূত। এই জাতীয় শিক্ষা আমরা যেমন অন্যদের দিয়ে থাকি তেমনি অনেক সময়ে পেয়েও থাকি। ইস্কুল-কলেজের শিক্ষাপ্রাপ্তির সঙ্গে

মানুষের কাছ থেকে এরকম শিক্ষাপ্রাপ্তির সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ নয়। তবে কারিগরি বিদ্যা, গাড়ি চালানো, ডাক্তারি, ওকালতি ইত্যাদি হরেক রকম কাজে ও পেশায় নানা ধরনের হাতেকলমে শিক্ষা নিতে হয়।

এক চৌকিদার যখন রাতের বেলায় তার গ্রামে টহল দিচ্ছিলো তখন একটা বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে সে একটা ঘরের মধ্যে একরকম ভয়াবহ বাক্যালাপ শুনতে পেলো। একজন ভারি গলার বৃদ্ধ ব্যক্তি নির্দেশ দিচ্ছে, 'হাতটা কেটেছিস তো, বা চমৎকার কেটেছিস। নে এবার গলাটা কেটে ফেল।' উত্তরে কম্পিত কণ্ঠে একজন অল্পবয়েসী বলছে, 'না কাকা, আমি পারবো না। আমার ভয় করছে।' প্রবীণ কণ্ঠস্বরটি উত্তেজিতভাবে বলছে, 'আরে, না না, ভয় কিসের। কাট, সাহস করে গলাটা কেটে ফেল।'

বন্ধ দরজার ভিতরে গভীর রাতে দুজন অদৃশ্য ব্যক্তির এই মারাত্মক কথোপকথন শুনে হতভম্ব চৌকিদার সোজা থানায় একদৌড়। সেখানে গিয়ে সমস্ত বলতেই দারোগাবাবু সেপাই-সান্ত্রী নিয়ে সেই বাড়িতে এসে হানা দিলেন। তখন কিন্তু সেই বাড়িটি নিস্তব্ধ, আলো নিবিয়ে সবাই শুয়ে পড়েছে। বেশ ধাক্কাধাক্কির পর এক বৃদ্ধ ব্যক্তি সদ্য ঘুমভাঙা চোখে দরজা খুলে চৌকিদার-পুলিস দেখে অবাক। দারোগা বললেন, 'এই বাড়িতে খুন হয়েছে, কাল রাত্রে একজন লোকের গলাকাটা হয়েছে, এই চৌকিদার স্বকর্ণে শুনেছে।' বৃদ্ধ ব্যক্তিটি রীতিমত স্তম্ভিত হয়ে গেলো, আমতা আমতা করে বললো, 'আমার বাড়িতে খুন! থাকি তো আমরা মাত্র দুজন। আমি আর আমার ভাইপো। আমরা দুজনেই তো বেঁচে আছি। দাঁড়ান, আমার ভাইপো ঘুমুচ্ছে, তাকে ডাকি।'

দারোগাবাবু ভাইপোকে জীবন্ত দেখে আশ্বস্ত হলেন না, বললেন, 'তা হলে তোমরাই কারো গলা কেটেছো।' গলাকাটার কথায় বৃদ্ধটি যেন কিছু অনুমান করতে পারলো, বললো, 'ও গলা কাটার কথা বলছেন, কাল রাতেই আমি ভাইপোকে গলাকাটা শেখাচ্ছিলুম।' দারোগাবাবু রীতিমত বিচলিত হলেন, 'গলাকাটা শেখাচ্ছিলুম, মানে?'

কিঞ্চিৎ জেরা করে ব্যাপারটি পরিষ্কার হলো। বৃদ্ধটি পেশায় দরজি, সে

তার ভাইপোকে দরজির কাজ শেখাচ্ছে। নতুন-নতুন বলে ছেলেটি জামার বা পাঞ্জাবির হাত কাটতে, গলা কাটতে ভয় পাচ্ছে। কিন্তু শিখতে তো হবে।

শেখার ব্যাপারটা সোজা নয়। শেখানো সম্ভবত আরো কঠিন। এক প্রবীণ সর্দারজীর কাছে অনেকদিন আগে আমার এক বান্ধবী গাড়ি চালানো শিখতেন, ড্রাইভিং। আমার বান্ধবীরা, বলা বাহুল্য, সবাই পরমা সুন্দরী, বিশেষ করে আলোচ্য ড্রাইভিং শিক্ষার্থিনী সত্যিই রূপসী, হরিণনয়না, টানা-টানা ডাগর-ডাগর চোখ। দিন পনেরো শেখার পরেও তিনি ক্রমাগত ভুল করে যেতে লাগলেন, হাতে স্টিয়ারিং, পাশে নির্দেশরত সর্দারজী, মহিলা কখনো ল্যাম্পপোষ্টকে গাড়ি নিয়ে তাড়া করে যাচ্ছেন, কখনো ফুটপাতে উঠে যাচ্ছেন। অবশেষে একবার যখন তিনি একটি স্থাণু লরির নিচে গাড়িটাকে প্রায় ঢুকিয়ে নিয়েছেন, সর্দারজী বলিষ্ঠ হাতে স্টিয়ারিং সমেত সুন্দরীর হাত দুটি চেপে ধরে বললো, 'মেমসাহেব, তোমাকে কেউ কোনো দিন বলেনি, তোমার চোখ দুটো খুব সুন্দর, খুব বড় বড় ?'

শেষরাতের রাজপথে ঘনিষ্ঠ হয়ে পাশে বসা প্রবীণ সর্দারজীর একি সাংঘাতিক প্রশ্ন! আমার বান্ধবী রীতিমত ঘাবড়িয়ে গেলেন। বোকার মতো থমকে রইলেন। সর্দারজী আবার গর্জে উঠলো, 'তুমি নিজে তো জানো তোমার এত বড় বড় কেমন ভালো চোখ। চোখ দুটো ব্যবহার করছো না কেন, ঠিকমত দেখেশুনে গাড়িটা চালাতে পারছো না!'

গাড়ি চালানো শেখার চেয়ে বোধ হয় অনেক কঠিন বিমান চালানো শেখা। আমি দুটোর কোনোটাই জানি না, সুতরাং এ বিষয়ে আমার কোনো কিছু বলা উচিত হবে না। কিন্তু এক শিক্ষার্থী বিমানচালক সম্পর্কে একটি গল্প বলতে পারি। সেদিন প্যারাসুট লাফের ট্রেনিং হচ্ছে। নির্দেশক দেখিয়ে দিয়েছেন, এই ভাবে প্যারাসুটটি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে, এইভাবে ফিতে টানলে প্যারাসুট খুলে যাবে, তারপর ধীরে সুস্থে নিচে নেমে, সেখানে বিমানদপ্তরের গাড়ি থাকবে, তাতে শিক্ষাকেন্দ্রে ফিরে আসবে।

নির্দেশমত শিক্ষার্থী যথাসময়ে বিমান থেকে ঝাঁপ দিলেন। দুঃখের বিষয়

হাজার টানাটানি করেও প্যারাসুটটি খুললো না, তিনি শোঁ-শোঁ করে অতি দ্রুতগতিতে নিচে নামতে লাগলেন। এই দ্রুত পতনের মধ্যে তাঁর মাথায় ভাবনা এলো, 'প্যারাসুটটা খুললো না, নির্দেশকের যত বাজে কথা। এর পরে নিচে হয়তো দেখবো গাড়িটাও নেই।'

গাড়িটা থাকলে বা না থাকলে কি হবে? তিনি যে নিচে পড়ামাত্র চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবেন, এটাই যে তাঁর শেষ শিক্ষা, সেটা বুঝবার মতো বুদ্ধি বা সময় এখন আর তাঁর নেই। কখনো কখনো আমাদের কারোই থাকে না।

দাঁত

দক্ষিণ কলকাতায় কালীঘাট অঞ্চলে, (জানি না এখনো আছে কিনা, পাতাল রেলের কল্যাণে সে রাস্তা দিয়ে আজ কয়েক বছর যাতায়াত নেই) একটা বাড়ির সামনে বহুকাল ধরে একটা সাইনবোর্ড ছিলো, তাতে লেখা ছিলো, 'দান্তের হাসপাতাল'।

বলা বাহুল্য, এটি একটি নিতান্তই বানান-বিভ্রাট, মহাকবি দান্তের সঙ্গে এই হাসপাতালটির সামান্যতম যোগাযোগ থাকার কোনো সম্ভাবনাই নেই। আসলে দাঁতের চন্দ্রবিন্দু কোনো বিচিত্র ভ্রমে পিছিয়ে গিয়ে 'ন' হয়ে গেছে, ফলে দাঁতের হাসপাতাল দান্তের হাসপাতালে পরিণত হয়েছে।

শুধু বানানে নয়, বাস্তবে চিকিৎসায় এরকম দাঁত বিভ্রাট অনবরতই শোনা যায়। হাসপাতালে দেখা গেছে বারো নম্বর রোগীর মাড়ির দাঁতে ব্যথা, কাগজ দেখে ভুল করে তেরো নম্বর রোগীর মাড়ির দাঁত তুলে ফেলা হয়েছে, যার আসলে সামনের দাঁতে ব্যথা। একবার এক রোগীকে দেখেছিলাম দাঁতের চেয়ারে যন্ত্রণাকাতর বিকৃত মুখে ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে ককাচ্ছেন, ডাক্তার বলছেন, 'কি হলো? এখনো তো আমি

আপনার দাঁতে হাত দিই নি।' রোগী বলছেন, 'দাঁত নয়, আপনি পায়ের বুটজুতো দিয়ে আমার পায়ের বুড়ো আঙুল মাড়িয়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।'

কিন্তু এ সমস্ত গল্পই খুবই তুচ্ছ এবং হাস্যকর মনে হবে, আজ আমি আপনাদের যে মর্মান্তিক কাহিনী শোনাতে বসেছি তার তুলনায়। কাণ্ডজ্ঞানের মতো তরল পৃষ্ঠার পক্ষে কাহিনীটি মোটেই উপযুক্ত নয়। কিন্তু এই মুহূর্তে হাতে কোনো ভালো বিষয় না থাকার জন্যে নিতান্ত বাধ্য হয়ে এই গর্হিত কাজটি করছি।

এই গল্পটির কোনো ইতিহাস বা ভূগোল নেই। কবে কোথায় ঘটেছিলো তা বলা যাবে না, বলা উচিতও হবে না। বর্ণনার সুবিধের জন্যে আমি গল্পটি উত্তমপুরুষে বলছি, কিন্তু গল্পটি আমার নয়, আমি শুনেছিলাম যাঁর কাছে তিনি কার কাছে শুনেছিলেন বা কোথাও

পড়েছিলেন কি না, তা বলতে পারবো না।

গল্পটির কেন্দ্রস্থল এক মফস্বল শহর, কলকাতার কাছেই। সেখানে এই গরমে এক প্রীতিসম্মেলন সহ মধ্যাহ্নভোজে গিয়েছিলাম। আজকাল সন্ধ্যায় বিদ্যুতের অভাব এবং চুরি-ছিনতাইয়ের প্রাচুর্যের জন্যে কলকাতা এবং মফস্বলে বহু গৃহস্থই প্রীতিভোজের আয়োজন দুপুরবেলা করছেন।

যেমন হয়, সেই প্রীতিভোজের আসরে অনেক পরিচিত লোকের সঙ্গে বেশ অনেকদিন পরে দেখা হলো। এখানেই অনেকদিন পরে চিন্তাহরণ বন্ধুর সঙ্গে দেখা। একসময় ওঁর সঙ্গে গভীর বন্ধুত্ব ছিলো, এক পাড়ায় থাকতাম, প্রায় প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা একসঙ্গে আড্ডা দিতাম। এখন দুজনে দু'জায়গায় দু'রকম ব্যস্ত জীবন যাপন করি, কদাচিৎ দেখা হয় তাঁর সঙ্গে, আজ এখানে দেখা হলো দেড় বছর বাদে।

চিন্তাহরণবাবুকে দেখে বিশেষ ভালো লাগল না। মুখ কালো করে, গালে হাত দিয়ে অর্ধনিমীলিত চোখে স্থির হয়ে বসে আছেন, পাশে গিয়ে জিজ্ঞাসা করতে বললেন, দাঁত ব্যথা, সকাল থেকেই অল্প অল্প ছিলো। ব্যথাসুদ্ধই বাড়ি থেকে বেরিয়েছেন। কিন্তু তখনো কোনোরকম ছিলো, কিন্তু এখন অসহ্য, শুধু দাঁত নয় সমস্ত শরীর যেন টনটন করছে। জিজ্ঞাসা করে আরো জানতে পারলাম, এখানে আসবার পথে মোড়ের ওষুধের দোকান থেকে এক শিশি 'টুথেক কিওর' কিনে লাগিয়েছেন, পায়ের কাছে লাল ওষুধের ফাঁকা শিশিটা পড়ে রয়েছে। তারপর সামনের পানের দোকান থেকে চারটে কোডোপাইরিন কিনে সোডাওয়াটার দিয়ে খেয়েছেন। তারপর সহনিমন্ত্রিতদের পরামর্শে ভোজবাড়ির ব্যস্ত রান্নাঘর থেকে এক ঘটি গরমজল এনে নুন দিয়ে কুলকুচি করেছেন, এমনকি যারা পান সাজছে তাদের কাছ থেকে গুটিকয় লবঙ্গ চেয়ে নিয়ে দাঁতের গোড়ায় চেপে রেখেছেন।

কিছুতেই কিছু হয় নি। সর্বশেষে স্থানীয় এক ভদ্রলোক কিছুক্ষণ আগে পাশের পাড়ায় এক হাফ-সন্ন্যাসীর কাছে নিয়ে যান। মাত্র পাঁচ সিকে পয়সার বিনিময়ে সেই সন্ন্যাসীটি চিন্তাহরণবাবুকে স্বপ্নলব্ধ ব্যথাহরণ একটি

মন্ত্র দিয়েছেন, মন্ত্রটি মনে মনে আটশো আটবার জপ করা মাত্র ব্যথা দূর হয়ে যাবে; জপটি খুবই গোপন এবং অব্যর্থ। কিন্তু এই দুঃসহ ব্যথায় আটশো আটবার কোনো মন্ত্র জপ করার মতো মনের জোর তাঁর নেই। আর মন্ত্রটিও অতি খটমটে, আমি জিজ্ঞাসা করায় গোপনীয়তা ভঙ্গ করে চিন্তাহরণবাবু জানালেন মন্ত্রটি হলো—

'পরম ব্রহ্মা প্রজাপতি ঋষি
শূল শাস্তি অহর্নিশি
সুখ শাস্তি দিশি দিশি
পরম শাস্তি প্রজাপতি ঋষি।'

বলা বাহুল্য, এই মন্ত্র আটশো আটবার জপ করে যন্ত্রণা দূর করা বোধহয় কারো পক্ষেই সম্ভব নয় এবং সময় লাগে অন্তত বারো-চৌদ্দ ঘণ্টা।

এখন চিন্তাহরণবাবু একা একা গালে হাত দিয়ে বসে রয়েছেন এমনিতে যদি ব্যথাটা একটু কমে যায়। নিমন্ত্রণ খাওয়া মাথায় উঠেছে, ব্যথাটা সামান্য কমলেই সোজা একটা রিকশা করে স্টেশনে, সেখান থেকে কলকাতা ফিরবেন। আমি প্রস্তাব করলাম, 'তার চেয়ে চলুন একজন ডেন্টিস্টের কাছে যাই।' চিন্তাহরণবাবু বললেন, 'সে কথা কি আমি ভাবিনি? কিন্তু এই গ্রীষ্মের ভরদুপুরে ছুটির দিনে এই মফস্বল শহরে দাঁতের ডাক্তার কোথায় পাবো?'

প্রতিবেশী এক ভদ্রলোক আমার আর চিন্তাহরণবাবুর কথাটা শুনছিলেন, তিনি বললেন, কাছেই রেল স্টেশনের ওপারে 'সিওর কিওর' নামে একটা নার্সিং হোম আছে, সেখানে মিলিটারির প্রাক্তন ডাক্তার মেজর সিং, দাঁত-চোখ-কান-বুক যাবতীয় চিকিৎসা করেন এবং তাঁকে দিবা-রাত্র পাওয়া যায়।

রিকশা করে চিন্তাহরণবাবুকে নার্সিং হোমে নিয়ে গেলাম। ডাক্তার সিংকে দেখে শ্রদ্ধা হলো। আমরা যখন গেলাম তখন তিনি স্থূলদেহ এক স্থানীয় ব্যবসায়ীর নাতিবৃহৎ তলপেট হাঁটু দিয়ে চেপে সেই ব্যক্তির

লিভারের ক্ষমতা পরীক্ষা করছিলেন। শুধু লিভার নয়, দাঁত ব্যথা, চক্ষু পরীক্ষা, পাগলের চিকিৎসা, অস্ত্রোপচার ইত্যাদি নানাবিধ ডাক্তারি ও শল্যচিকিৎসা মেজর সিং একা নিজ হাতে করেন।

আমাদের নতুন লোক দেখে এবং প্রয়োজন শুনে মেজর সিং যকৃৎ রোগীকে কিছুক্ষণের জন্যে ছেড়ে দিয়ে আমাদের কাছে এলেন। একটা পুরনো লোহার চেয়ারে চিন্তাহরণবাবু বসলেন, চেয়ারের পিছনে চুলকাটার সেলুনের মতো একটা স্কন্ধাসন, তাতে মাথা হেলিয়ে দিলেন। মেজর সিং একটা টেবিলের ড্রয়ার থেকে কয়েকটা ছুরি, কাঁচি, ফরসেপস্ ইত্যাদি বার করে নিয়ে এলেন ; যন্ত্রপাতি পুরনো কিন্তু বেশ মজবুত, বোধহয় মিলিটারি থেকে আসার সময় নিয়ে এসেছেন। চিন্তাহরণবাবু এত যন্ত্রণার মধ্যেও আশঙ্কান্বিতভাবে মেজর সাহেবের ও তাঁর অস্ত্রাদির দিকে তাকাতে লাগলেন। আমি চিন্তাহরণবাবুর মাথার ওপাশে গিয়ে দাঁড়ালাম।

মেজর সিং চিন্তাহরণবাবুর ডান দিকে এসে তাঁকে হাঁ করতে বললেন। চিন্তাহরণবাবু হাঁ করা মাত্র মুহূর্তের মধ্যে এক অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটলো। কোনো প্রশ্ন না করে, কিছু না জেনে, কোনো বিবেচনা না করে মেজর সাহেব বিদ্যুৎগতিতে চিন্তাহরণবাবুর ওপরের পাটির সামনের তিনটা দাঁত ফটাফট তুলে মেজেতে ফেলে দিলেন। আমি দেখলাম একটা রক্তারক্তি ব্যাপার হতে চলেছে, কিন্তু চিন্তাহরণবাবুর এক ফোঁটা রক্ত বেরোল না, মেজর সাহেবও বললেন, 'সাংঘাতিক এনিমিয়া দেখছি, একবিন্দু রক্ত নেই।'

চিন্তাহরণবাবু ইতিমধ্যে চেয়ার থেকে লাফ দিয়ে উঠে পড়েছেন। সদ্য তোলা দাঁত তিনটে মেজে থেকে তুলে পাশের বেসিন থেকে ধুয়ে নিলেন, তারপর সযত্নে ওপরের পাটিতে দাঁত তিনটি লাগালেন। তারপর মেজরকে বললেন, 'খুব রক্ত দেখার সাধ হয়েছে বুঝি ? কথা নেই বার্তা নেই, তিনটে দাঁত তুলে ফেললেন ? পাগল নাকি ? ভাগ্যিস বাঁধানো দাঁত তাই রক্ষা পেয়ে গেলাম।'

চিন্তাহরণবাবু আমাকে বললেন, 'চলুন এই পাগলের আস্তানা থেকে

বেরিয়ে প্রাণ বাঁচাই। তবে এমন ভয় পাইয়ে দিয়েছিলো যে উত্তেজনায় দাঁতের ব্যথাটা মরে গেছে।'

দুজনে বেরিয়ে এলাম। তখনো মেজর সাহেব আমাদের পিছু ছাড়েন নি। পিছন ফিরে তাঁর দিকে তাকাতেই তিনি বললেন, 'আমার ভিজিটটা!'

টেলিফোন

স্বর্গত ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের একটি অসামান্য কৌতুকনকশা ছিলো, যেখানে এক গ্রাম্য ব্যক্তি জীবনে প্রথমবার টেলিফোন ধরেছে। সে অবশ্য প্রথমে ধরতে চায় নি, কিন্তু টেলিফোনটির কাছাকাছি কোনো লোক ছিলো না এবং রিসিভারটি ক্রমাগত বেজেই চলেছে, ফলে বাধ্য হয়েই সে রিসিভারটি তোলে। তখন অপর প্রান্ত থেকে যিনি ফোন করছেন, তিনি যথারীতি বলেছেন, 'হ্যালো।' এই গ্রাম্য ব্যক্তিটি, যে এ প্রান্তে ফোন ধরেছে, সে ভেবেছে তাকে হেলতে বলা হয়েছে। সুতরাং সে একটু কাত হয়েছে। আবার ও প্রান্ত থেকে 'হ্যালো' বলেছে আর এই ব্যক্তিটি আরো একটু কাত হয়েছে। যত 'হ্যালো' শুনছে, তত কাত হয়ে যাচ্ছে, মুখে কিছু বলছে না, ফলে ও-প্রান্ত থেকে ক্রমাগত 'হ্যালো, হ্যালো···' হয়ে যাচ্ছে, এ লোকটিও কাত হতে হতে একদম মেজেতে শুয়ে পড়েছে এবং তখন বলছে, 'আর হেলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়, হেলতে হেলতে আমি চিত হয়ে গেছি।'

আমার বর্ণনার ত্রুটির জন্যে হয়তো এই নকশাটিকে কারো কারো একটু মোটা দাগের মনে হতে পারে, কিন্তু ভানুবাবুর অননুকরণীয় প্রসাদগুণে অসম্ভব কৌতুকের সৃষ্টি হতো এই উপস্থাপনায়।

টেলিফোন প্রসঙ্গে আমার অবস্থা ঐ কৌতুকনকশার গ্রাম্য ব্যক্তিটির চেয়েও খারাপ। আমি টেলিফোনে কোনো কথা বুঝতে পারি না, বলতেও পারি না। বলতে পারি না তার কারণ আমার অস্বাভাবিক ভারি গলা, যা টেলিফোন যন্ত্রের মাধ্যমে আরো বিপজ্জনক হয়ে ওঠে। আমার সবচেয়ে

বড় অসুবিধে হলো যে, আমি কিছুতেই আস্তে কথা বলতে পারি না। এই অস্বাভাবিক কণ্ঠস্বর, তারপর চেঁচিয়ে, তারপর ফোনে, ওদিকে যিনি থাকেন তাঁর অবস্থা অকল্পনীয়। কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর সঙ্গে একবার ফোনে কথা বলছিলাম। দুজনের মধ্যে ব্যবধান ডালহৌসি স্কয়ার থেকে প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, নীরেন্দ্রনাথ আমার চেঁচানি শুনে আমাকে উপদেশ দিয়েছিলেন, 'শুধু শুধু টেলিফোন কোম্পানিকে পয়সা দিয়ে লাভ কি? তার চেয়ে ফোনটা নামিয়ে রেখে কথা বলো, আমি বেশ শুনতে পাবো।'

বাড়িতে বা অফিসে আমি কখনোই পারতপক্ষে ফোন ধরি না, বিশেষ নিরুপায় না হলে ঐ গ্রাম্য ব্যক্তিটির মতো ফোনের ক্রিং ক্রিং এড়িয়ে চলি। অবশ্য আমাদের বাড়িতে ফোন ধরার সুযোগও খুব কম। যেদিন প্রথম আমাদের সংসারে ঐ যন্ত্রটি এলো সেদিন থেকে ফোন বাজা মাত্র আমার ছোট ভাই এবং ছেলে দুজনে পাগলের মতো ছুটে যায় ফোন ধরতে। ফোন

বেজে চলে, এদিকে দুজনের মধ্যে যাকে বলে ধ্বস্তাধ্বস্তি, মারামারি। ইতিমধ্যে আমাদের কাজের লোকটিও এই ফোন ধরার প্রতিযোগিতায় যোগদান করেছে। এদের মারামারি ও গোলমালে কত দরকারি ফোন যে চাপা পড়েছে, ধরাই হয় নি। আবার হয়তো ধরা হলো, কিন্তু যিনি ফোন করেছেন, তিনি আমাদের দিক থেকে গোলমাল, চেঁচামেচির শব্দ শুনে ভয় পেয়ে নিঃশব্দে ছেড়ে দিয়েছেন।

প্রথমে ভেবেছিলাম এটা সাময়িক উত্তেজনা। কালক্রমে ধীরেসুস্থে দূর হয়ে যাবে। কিন্তু বেশ কয়েক বছর হতে চলেছে টেলিফোন লড়াই এখনো পূর্ণগতিতে চলেছে। আমি একবার জানতে চেয়েছিলাম, ওরা এরকম কেন করে? আমার ভাই বলেছে, রং নাম্বার হলে মনের সুখে গালাগাল দেবে সেই জন্য। আমার ছেলে বলেছে, বিশেষ কোনো কারণে নয়, তবে কেন যেন টেলিফোন বেজে উঠলেই তার মাথায় রক্ত উঠে যায়, সে দিশেহারা বোধ করে। আর পরিচারকটি বলেছে, দাদাবাবু আর কাকাবাবু ওরকম করে বলে সেও ওরকম করে।

নিজের বাড়ির ফোনের কথা থাক। এক বন্ধুর বাড়িতে দেখেছি বন্ধুপত্নী প্রায় ঘণ্টাখানেক ফোনে কথাবার্তা বলার পর অবশেষে ক্লান্ত হলেন। অপর পক্ষকে জানালেন, 'ভাই একটু ধরো। কানটা বদলিয়ে নিই।' বলে ফোনটি ডান কান থেকে বাঁ কানে ঘুরিয়ে নিলেন। আরো কিছুক্ষণ কথা বলার পরে আলাপ শেষ হলো। ভদ্রমহিলা টেলিফোনটা নামিয়ে রেখে সবে উঠেছেন, ইতিমধ্যে আরেকটি ফোন এলো। তিনি আবার গিয়ে ফোন ধরলেন। ঘরের অপর প্রান্তে আমরা বসে গল্প করছিলাম, ভদ্রমহিলার স্বামী মানে আমার বন্ধুটি, চাপাগলায় বললেন, 'আবার এক ঘণ্টা।' কিন্তু পতিদেবতার ভবিষ্যৎ-বাণী নস্যাৎ করে দিয়ে এবারের আলাপ মাত্র দশ মিনিটের মধ্যে সাঙ্গ করলেন। বন্ধুপত্নী ফোন রেখে উঠে আসতে আমি রঙ্গ করে বললাম, 'এতো তাড়াতাড়ি কথা ফুরোলো?' ভদ্রমহিলা ভুরু কুঁচকে বললেন, 'কি আর কথা বলবো? এটা যে রং নম্বর ছিলো।'

রং নম্বর কোনো এক যুগে বেশ রোমান্টিক ব্যাপার ছিলো। তখন রং

নম্বরের সুযোগ কম ছিলো, টেলিফোন তখনো স্বয়ংক্রিয় হয়নি, নম্বরের জন্য এক্সচেঞ্জে টেলিফোন সহায়িকার উপর নির্ভর করতে হতো। তিরিশের, চল্লিশের দশকে বাঙালী টেলিফোন-মহিলা আধুনিকতার প্রতীক। তাঁদের নিয়ে কত গল্প, উপন্যাস, সিনেমা। পাড়ায় একজন মহিলা টেলিফোন অপারেটর থাকলে সমস্ত লোক অবাক হয়ে তাঁর যাতায়াত, কথাবার্তা পর্যবেক্ষণ করতো। নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'দূরভাষিণী' এখনো অনেকেরই হয়তো মনে আছে।

অটোমেটিক হওয়ার পর থেকে টেলিফোনের সেই রোমান্টিক যুগ শেষ হয়েছে। এখন দূরভাষণ একটি প্রয়োজনীয় বিরক্তি। রং নম্বরে রং নম্বরে গ্রাহক সদা অতিষ্ঠ। অবশ্য যদি যন্ত্রটি চালু থাকে। যন্ত্রটি চালু না থাকলে, যা প্রায়শই হয়, অবশ্য রং নম্বরের ভয় নেই। আর এই ভুল নম্বর যখন হতে থাকে ক্রমাগতই হতে থাকে। একই লোক একই ভুল নম্বর বারবার পেতে থাকে। একবার এইরকম একটি লোক ক্লান্ত হয়ে আমাকে আমার ফোন নম্বর জিজ্ঞাসা না করে জিজ্ঞাসা করেছিলো, 'দাদা, এটা কি রং নম্বর?' আমি কিছু না বুঝতে পেরে বলেছিলাম, 'হ্যাঁ।' সঙ্গে সঙ্গে লোকটি ফোন নামিয়ে রাখলো। একটু পরে আবার ক্রিং, ক্রিং, আবার সেই প্রশ্ন, 'দাদা, এটা কি রং নম্বর?' ক্রমাগত চলতে লাগলো। আমি মরিয়া হয়ে গেলাম, ও দিকের লোকটিও তাই। কিন্তু শেষে সে আর পারলো না, উনত্রিশ বারের মাথায় যখন আমি আবার জানালাম, 'হ্যাঁ, এটা রং নম্বর', তখন ও প্রান্তে স্পষ্ট একটা গুলির শব্দ শোনা গেল এবং তারপরেই হাত থেকে রিসিভার মেঝেতে পড়ে যাওয়ার আওয়াজ। বোধ হয় লোকটা এত চেষ্টা করেও সঠিক নম্বর না পাওয়ায় হতাশ হয়ে আত্মহত্যা করলো।

নবনীতা দেবসেনের বাড়িতে একবার গভীর রাতে একটা খুব গোলমেলে রং নম্বর এসেছিলো। গলার স্বর এবং ইংরেজি উচ্চারণ শুনে নবনীতা বুঝতে পারে এটা একটা মাদ্রাজি মাতাল। আমরা জানতে চাই, 'মাতাল বোঝা গেলো কি করে? আর মাদ্রাজিই বা কেন?' নবনীতা বললো, 'ব্যাপারটা খুবই সোজা। লোকটা পাঁচ সংখ্যার নম্বর চাইছিলো; কলকাতা,

বোম্বে, দিল্লী সব ছয় সংখ্যার নম্বর। আর তাছাড়া মাতাল ছাড়া আর কে মধ্যরাতে অন্য শহরের রং নম্বর চাইবে ?'

ফোনের গল্প অনেক। ব্যাপারটা সেই জন্য সাহিত্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখছি। কয়েকদিন আগে শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে দেখেছি ফোনে ক্রিং ক্রিং বাজা মাত্র বাড়িসুদ্ধ সবাই, এমন কি শক্তির মতো দুঃসাহসী লোক পর্যন্ত চমকে চমকে উঠছে। কি ব্যাপার, এতো ভয় কিসের ? কোনো দুঃসংবাদ আসার আশঙ্কা করছে নাকি অথবা কোনো দুর্দান্ত লোকের শাসানি ? শুনলাম তা নয়, টেলিফোনটা ধরতে গেলেই সাংঘাতিক শক দিচ্ছে, বৈদ্যুতিক শকের চেয়েও তীব্র। ফোন বাজলে ধরতে হবে, ধরলেই শক। এই ভয়ে সবাই অতিষ্ঠ। এর আগে কিংবা পরে, আর কোথাও এমন শকিং ফোনের কথা শুনি নি, শিবরাম চক্রবর্তী বেঁচে থাকলে হয়তো বলতেন শক থেকেই শক্তি।

এই শক তবু সহ্য করা যায়। কিন্তু একধরনের টেলিফোন কিন্তু প্রচণ্ড বিরক্তিকর। কিছুতেই আত্মপ্রকাশ করবে না, নাম বলবে না। ভাঙা ন্যাকা গলায়, 'বল তো, আমি কে বলছি ? চিনতে পারছো না তো ? কি করে চিনবে বলো ? কতদিন পরে, কত রোগা হয়ে গেছি, মাথায় এতবড় টাক পড়েছে, সত্যি চিনতে পারছো না ?' এসব লোকের টেলিফোন নামিয়ে রাখা ছাড়া উপায় নেই।

পুনশ্চ : টেলিফোনে ক্রশ-কানেকশন থেকে দ্রুত অব্যাহতি পাওয়ার আমার একটি ফর্মুলা আছে। পরীক্ষা করে দেখতে পারেন, শতকরা নব্বুই ভাগ ক্ষেত্রে সঙ্গে সঙ্গে ফল পাওয়া যাবে। ফোন তুলে ডায়াল টোন পেয়েই শুনলেন লাইনে কারা কথা বলছে কিংবা আপনি কথা বলতে বলতে লাইনে কাদের বাক্যালাপ চলে এলো। এদের লাইন ছেড়ে দিতে অনুরোধ করে কোনো লাভ নেই। বরং সঙ্গে সঙ্গে চাপাগলায় বলুন, 'ট্রাঙ্ক কল, দিল্লী, ট্রাঙ্ক।' দেখবেন অপর পক্ষদ্বয় ফোন নামিয়ে দিয়েছে, তারা ভাবছে তাদের বুঝি দিল্লী থেকে ট্রাঙ্ক কল এসেছে। সেটা ধরার জন্য তারা ফোন নামাতেই আপনার জট আপাতত খুলে যাবে।

পাখি সব করে রব
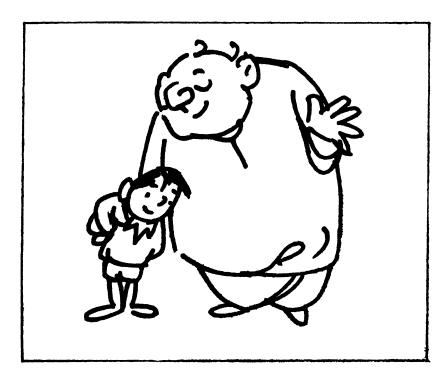
জানুয়ারি মাস মানে নতুন বছর আসতে আর মাত্র সাত মাস বাকি। যে সব বাড়িতে বাচ্চাদের ইস্কুলে ভর্তি করানোর ব্যাপার আছে তাদের এখন সাজোসাজো রব পড়ে গেছে। ব্যস্ত লেখকের শারদীয় সংখ্যার কাজ যেমন আরম্ভ হয় বৈশাখ পড়তে না পড়তে, সেইরকমই ফর্ম সংগ্রহ, দরখাস্ত পূরণ, কাগজপত্র পেশ ইত্যাদি বাচ্চাদের ইস্কুলে ভর্তি-সংক্রান্ত যা কিছু কাজ এখনই করে ফেলতে হবে, অবিলম্বে দরখাস্ত গ্রহণের শেষ তারিখ পার হয়ে যাবে।

মাত্র দশ-বারো বছর আগেও বাচ্চাদের ভর্তি করা নিয়ে এত ঝামেলা ছিলো না। আমার মা সরাসরি গিয়ে বেশ একটা ভালো স্কুলে আমার

ছেলেকে ভর্তি করে দিয়ে এসেছিলেন। শুধু ভর্তি করা নয়, ভারপ্রাপ্তা শিক্ষিকাকে তিনি একটি আশ্চর্য অনুরোধ করেছিলেন, 'এই কৃত্তিবাস আমার একমাত্র নাতি। অতি আদরের ধন। কখনো আমরা কেউ একে মারধোর করি না। আপনারাও করবেন না। কৃত্তিবাস এমনি খুব শান্ত, তবে হঠাৎ যদি কখনো দুষ্টুমি করে তো আপনি ওর পাশের ছেলেকে মারবেন, তা হলেই ও ভয় পাবে।' মা এসে যখন আমাকে বললেন যে কৃত্তিবাসের দিদিমণিকে এই কথা বলে এসেছি, আমি মাকে কিছুতেই বোঝাতে পারলাম না—তোমার নাতির দোষে অন্য ছেলে মার খাবে কেন?

তবে সব সময় মারার দরকার পড়ে না। আমার এক বন্ধুর মেয়েকে কয়েক বছর আগে একটা বড় ইস্কুল ভর্তির ইন্টারভিউ নিচ্ছিলো। হঠাৎ দেখা গেলো যে-ঘরে ইন্টারভিউ দিতে মেয়েটি ঢুকেছিলো সেই ঘর থেকে মেয়েটি চীৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে, 'ওরে বাবা রে, মেরে ফেললে রে, ওরে মা রে···' বলতে বলতে ছুটে বেরিয়ে এলো, হলেও-হতে-পারতো ছাত্রীর পিছনে পিছনে অপ্রস্তুত শিক্ষিকা বেরিয়ে এলেন। ভর্তিপ্রার্থিণীর মা বারান্দার একপ্রান্তে অপেক্ষা করছিলেন। মায়ের কাছে মেয়েটি ছুটে যেতে দিদিমণি মাকে গিয়ে বললেন, 'দেখুন, বিশ্বাস করুন, আমি কিন্তু আপনার মেয়েকে কিছু বলি নি, যেই জিজ্ঞাসা করেছি তোমার নাম কি, তখনই প্রাণপণ আর্তনাদ শুরু করেছে।' সুখের কথা, আমার বন্ধুপত্নী তাঁর মেয়েকে বিচক্ষণ জানতেন, তিনি বললেন, 'আমার মেয়ে ঐ রকমই করবে আমি জানতাম, আপনি কিছু মনে করবেন না।' এই বলে মেয়েকে দুটি চড় মেরে বাড়ি নিয়ে এলেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, সেই মেয়েটি কিন্তু পরের বছর বেশ একটি ভালো স্কুলে ভর্তি হতে পেরেছিলো, এখন সে রীতিমত ভালো ছাত্রী। সপ্তাহান্তে কাণ্ডজ্ঞান পড়ে সে চমৎকার হাসে। অবশ্য এবার নিজের গল্প পড়ে নিজেকে চিনতে পারবে কিনা, হাসবে কিনা বলা কঠিন।

আগে লেখাপড়া শুরু হতো বাড়িতে, তারপর বিদ্যালয়ে। এখন লেখাপড়ার আগেই স্কুল। দু' বছর বয়েস না হতে হতে বাচ্চাকে নার্সারিতে

পাঠিয়ে মা নিশ্চিন্ত। তবে নার্সারিতেই হোক বা বাড়িতেই হোক, প্রথম পাঠ খুব সোজা ব্যাপার নয়। অ-আ থেকে এ-বি-সি-ডি, অক্স-আম-ইট কিংবা কর-কর খর-খর প্রভৃতি ধাপই যথেষ্ট পরিশ্রম ও ধৈর্যের সঙ্গে পার হতে হয় শিশুকে এবং সেই সঙ্গে তার শিক্ষাদাতাকে।

প্রথম পাঠের চেয়ে প্রথম লেখা আরো অনেক কঠিন। প্রথম হাতের লেখা শেখানো নিয়ে আমি একটি চমৎকার গল্প শুনেছিলাম কবি মণীন্দ্র রায়ের কাছে।

একদিন সকালবেলা এক ভদ্রলোক শুনলেন যে তাঁর পাশের বাড়ির বৃদ্ধ প্রতিবেশী খুব চেঁচামেচি করছেন। একেক সময় বেশ উত্তেজিত, একেক সময় বেশ সন্তুষ্ট কণ্ঠস্বর। যথেষ্ট উচ্চগ্রামে সেই বৃদ্ধ কি সব যেন নির্দেশ দিচ্ছেন। মনে হলো যেন কোনো খুব ভারি আসবাব, আলমারি বা টেবিল জাতীয় কিছু তোলা হচ্ছে বা ঘরে গোছানো হচ্ছে, "ঠিক আছে, ঠিক আছে, আরেকটু বাঁয়ে, আরেকটু, হ্যাঁ এইবার উপরে, আরো উপরে, আরো, আরো। আর না, এবার ডান দিকে, আরো যেতে হবে, আরো ডানদিকে। আরেকটু, আরেকটু, ব্যস্, আর অল্প একটু নিচে···' প্রায় আধঘণ্টা-একঘণ্টা এই রকম চললো। বৃদ্ধ কাকে বা কাদের নির্দেশ দিয়ে গেলেন।

বেলার দিকে বৃদ্ধের সঙ্গে দেখা হতে প্রতিবেশী ভদ্রলোক জানতে চাইলেন, 'কি হলো, কোনো নতুন ফার্নিচার-টার্নিচার কিনলেন বুঝি? সকালে খুব হৈ-হল্লা শুনছিলাম।' বৃদ্ধ একটু বিস্মিত হলেন, 'ফার্নিচার? প্রতিবেশী বললেন, 'ঐ যে কি সব ওঠাচ্ছিলেন, নামাচ্ছিলেন।' বৃদ্ধ কিন্তু আরো অবাক হলেন। কিছুতেই মনে করতে পারলেন না সকালে কোনো আসবাবপত্র তাঁর বাড়িতে টানাটানি করা হয়েছে বলে।

প্রতিবেশীও যৎপরোনাস্তি বিস্মিত হলেন এই ভেবে যে, বৃদ্ধ ভদ্রলোকটির কি স্মৃতিভ্রংশ হয়েছে, নাকি পাগল হয়ে গেছেন?

কিন্তু পরের দিন সকালে আবার এই একই ঘটনা। প্রতিবেশী চা খেতে খেতে শুনলেন বৃদ্ধটি সেই 'ঠিক আছে, ঠিক আছে, আরেকটু বাঁয়ে, আরেকটু ডাইনে' শুরু করেছেন। তাজ্জব ব্যাপার! এরা কি প্রতিদিনই

আসবাব টানাটানি করবে নাকি।

তাড়াতাড়ি চা খাওয়া শেষ করে প্রতিবেশী ভদ্রলোকটি একটি অশালীন কাজ করলেন। তাঁর দোতলার চিলেকোঠা থেকে বৃদ্ধের বাড়ির ভেতরটা দেখা যায়। তিনি সেখানে উঠে চিলেকোঠার জানলা দিয়ে দেখলেন, আসবাব-টাসবাব নয়, বৃদ্ধ ভদ্রলোক তাঁর কনিষ্ঠ নাতিটিকে নিয়ে বারান্দায় বসে স্লেটে অক্ষর লেখা শেখাচ্ছেন, ক-খ-গ। একেকটা অক্ষরের উপর শিশুটি চক বোলাচ্ছে, আর বৃদ্ধটি সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে যাচ্ছেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আর একটু বাঁয়ে, আর একটু, ব্যস, এবার একটু ডাইনে, আর একটু, এবার নিচে, নিচে নামাও··· ।'

ঠাকুর্দা-ঠাকুমার কাছেই হোক কিংবা বাবা-মায়ের কাছেই হোক, শিশুদের প্রথম লেখাপড়াটা বোধ হয় নিজের লোকদের দিয়েই হওয়া ভালো। না হলে অনেক সময় খুব সাংঘাতিক গোলমাল হতে পারে।

আমার আগের এক প্রতিবেশীর ছেলে দশ-বারো বছর বয়েস পর্যন্ত বাংলা ঢ অক্ষরটি লিখতে পারতো না, পড়তে বা উচ্চারণ করতে পারতো না। সাহেবদের মতো ঢাকাকে বলতো ডাকা, ঢোলকে বলতো ডোল। তার যে জিহ্বা বা উচ্চারণের কোনো গোলমাল আছে তা নয়, বুদ্ধির গোলমালও নেই, লেখাপড়ায় সে মোটামুটি ভালো, কিন্তু সে যখন ফাইভে পড়ে তখন কি করে যেন ধরা পড়লো ঢ অক্ষরটি সে চেনে না, ট বর্গের ঐ চতুর্থ অক্ষরটির অস্তিত্বই তার জানা নেই। ছোটবেলায় বর্ণপরিচয়ের সময় সে ঐ অক্ষরটি পড়ে নি বা লেখে নি।

খোঁজ নিতে নিতে দেখা গেলো ঐ সময় তাকে এক দিদিমণি পড়াতেন। প্রৌঢ়া শিক্ষিকা এমনি মোটামুটি ভালো কিন্তু কিঞ্চিৎ ছিটগ্রস্ত ছিলেন। একবার পুরীতে গিয়ে জগন্নাথ দেবকে তিনি কি যেন ভেবে বাংলা ঢ অক্ষরটি উৎসর্গ করে দিয়ে আসেন। তারপর থেকে তাঁর ঘণ্টা ঢং ঢং করে না বেজে ডং ডং করে বেজেছে, তার ছাত্ররা ড-এর পরই ণ পেয়েছে ; ঢ বাদ দিয়ে তিনি সব শিখিয়েছেন। বাংলায় ঢ দিয়ে শব্দ বেশি নেই, তাই রক্ষা। পরে বহু কষ্টে বেশি বয়েসে বালকটির ঢ অক্ষরজ্ঞান আয়ত্তে আসে।

এ তবু একটি বালকের সমস্যা। মেদিনীপুর না বাঁকুড়া জেলার একটি পুরো গ্রামে কয়েক বছর আগে এই রকম একটা সমস্যা ভয়াবহ আকারে দেখা দিয়েছিলো। সেই গ্রামের এক প্রাথমিক শিক্ষক উপর্যুপরি বহু মাস ধরে মাইনে না পেয়ে সাংঘাতিক প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে ওঠেন। তিনি সেই গ্রামের সমস্ত শিশুকে উল্টো ক-খ শিখিয়ে দেন।

পাঠক, আপনার যদি বর্ণপরিচয় বা শিশুশিক্ষা প্রথম ভাগের কথা মনে থাকে, মনে করে দেখুন ব্যঞ্জনবর্ণের পরের পৃষ্ঠায় ব-র-ক-ধ-ঝ, যাকে বলা হয় সেই উল্টো ক-খ। এই পৃষ্ঠাটিতে ব্যঞ্জনবর্ণ মিলিয়ে দেওয়া আছে ছাত্রদের পরীক্ষা করার জন্যে, তাদের অক্ষর পরিচয় হয়েছে কি না। এখন এই পৃষ্ঠাটিই কেউ যদি ক-খ-গ-ঘ-ঙ হিসেবে শেখায়, তা হলে শিশুটি ক অর্থে শিখছে ব, খ অর্থে র, তার বাবা হয়ে যাচ্ছে কাকা, কান হয়ে যাচ্ছে গান।

ঘটনাটি ধরা পড়ার পর থেকে গ্রামের লোকেরা সেই শিক্ষক ভদ্রলোককে খুঁজে বেড়াচ্ছে, কিন্তু তিনি নাকি তারপর থেকে নিরুদ্দেশ।

হয়তো এটা নিতান্তই গল্প। কিন্তু গল্প যদি না হয়? সেই মাস্টারমশাই হয়তো আপনার বাড়িতেই এখন পড়াচ্ছেন। তাঁকে বঞ্চিত করবেন না, তা হলে আপনার সর্বনাশ হতে পারে।

পাঠ করি আনন্দে

এবারে ইস্কুলের গল্প, লেখাপড়ার গল্প।

লেখাপড়া নিয়েও কাণ্ডজ্ঞান, লেখাপড়া নিয়েও রসিকতা? কেউ কেউ হয়তো ভুরু কুঞ্চন করতে পারেন, কিঞ্চিৎ বিরক্তিবোধও করতে পারেন। কিন্তু আমি অপারগ, আমার মাথায় লেখাপড়া নিয়ে অনেকগুলো গল্প জমেছে, তাড়াতাড়ি না লিখে ফেললে হয়তো ভুলে যাবো। পাগলের কাণ্ডজ্ঞানে, মাতালের কাণ্ডজ্ঞানে কত ভালো ভালো গল্প ভুলে বাদ দিয়ে

ফেলেছি, কয়েকজন পরে মনে করিয়েও দিয়েছেন। ইস্কুলের কাণ্ডজ্ঞানে সে ভুল করতে চাই না।

আমার আগের পাড়ার এক প্রতিবেশিনী প্রতি শনিবার সন্ধ্যাবেলা ছেলের উপর রাগারাগি করতেন। অনুসন্ধান করে জেনেছিলাম শনিবার ছেলেটির উইকলি টেস্ট হতো, হাতে হাতে ফল দেওয়া হতো, মা সন্ধ্যাবেলা এই রেজাল্টের পর্যালোচনা করে যথারীতি সাপ্তাহিক ভৎর্সনা করতেন।

একবার দেখি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যাবেলা ছেলের উপর খুব রাগারাগি করছেন। কি ব্যাপার, নতুন কোন দোষ করেছে নাকি ছেলে অথবা সাপ্তাহিক পরীক্ষার বার পালটালো? আমার স্ত্রী খোঁজ নিয়ে জানলেন, না তা কিছু নয়, ভদ্রমহিলা মায়ের অসুখ বলে দু'দিনের জন্যে বাপের বাড়ি যাচ্ছেন, ছেলে এখানে তার বাবার কাছে থাকছে। শনিবার উইকলি টেস্ট নিশ্চয়ই খারাপ করবে, তাই শনিবারের প্রাপ্য গালিগালাজ ছেলেকে

বৃহস্পতিবারই আগাম করে যাচ্ছেন।

আমি নিজেও অবশ্য ছেলের পরীক্ষা ইত্যাদির ব্যাপারে যথাসাধ্য সজাগ ছিলাম, কিছুটা স্বেচ্ছায়, অনেকটা স্ত্রীর অত্যাচারে। স্কুলের খাতায় দিদিমণিরা নম্বর দিতেন, তার পাশে অভিভাবকের স্বাক্ষরের জায়গা ছিলো। স্বাক্ষর করার সময় আমিও নম্বর দিতাম। একবার সংশ্লিষ্ট ক্লাস-টিচার আমাকে বলেছিলেন, 'আমিই তো নম্বর দিই, আপনি আবার দিতে যান কেন?' আমি বললাম, 'আমি তো ছেলেকে নম্বর দিই না।' ভদ্রমহিলা চিন্তিত হলেন, 'তবে?' আমি বললাম, 'আমি আপনাকে নম্বর দিই। আপনি কেমন খাতা দেখেছেন, ভুল-টুল ঠিকমত ধরেছেন কিনা এইসব বিবেচনা করে আপনাকে দশের মধ্যে কখনো আট, কখনো সাড়ে চার অথবা খুব খারাপ হলে দুই-আড়াই দিয়ে ফেল করিয়ে দিই।' আমার বক্তব্য শুনে ভদ্রমহিলা এমন বিচলিত হয়ে পড়েন যে আমার ছেলের খাতায় আর কখনো নম্বর দেন নি।

শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিয়ে রসিকতা আমি করছি বটে, কিন্তু আমার নিজেরই জীবিকা শুরু হয়েছিলো শিক্ষকতা দিয়ে। গৃহশিক্ষকতা নয়, রীতিমত ইস্কুল মাস্টারি, প্রথম শ্রেণী থেকে একাদশ শ্রেণী পর্যন্ত। সকালে জনগণমন দিয়ে দিন শুরু আর দিন শেষ কাঁঠালগাছ তলায় লণ্ঠন জ্বালিয়ে বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রে। মধ্যে প্রাথমিক থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত ক্রমাগত ক্লাস। আমার বিদ্যে তো তখন এখনকার চেয়ে বেশি ছিলো না। এখন ভাবলে বুক দুরুদুরু করে ওঠে, কি অপরিসীম সাহস আর মূর্খতা নিয়ে আমি পড়াতে গিয়েছিলাম।

প্রথম দিন ইস্কুলে গিয়ে দেখলাম ছেলেদের প্যারেড করানো হচ্ছে। সারি দিয়ে ছেলেরা একেক ক্লাস দাঁড়িয়ে আছে, সবচেয়ে লম্বা ছেলে সবচেয়ে পিছনে, তারপর আস্তে আস্তে বড় থেকে ছোট, সবচেয়ে বেঁটে ছেলে সারির প্রথমে দাঁড়িয়ে। কিন্তু একটা ক্লাসে মাঝারি লম্বা একটি ছেলে সারির সামনে আর তার পিছনে বেঁটে থেকে লম্বা উচ্চতা ধরে সবাইকে সাজানো। আমি চেষ্টা করলাম এই প্রথমের লম্বা ছেলেটিকে

সারির মধ্যে তার উপযুক্ত জায়গায় পাঠাতে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সারির ছেলেরা বলে উঠলো, 'স্যার, ওকে লাইনের মধ্যে ঢুকতে দেবেন না। ও ভীষণ চিমটি কাটে, তাই ওকে হেডমাস্টার মশাই সবচেয়ে সামনে দিয়েছেন যাতে ওর সামনে ও চিমটি কাটার জন্যে কাউকে না পায়।' এই প্রথম দিন থেকেই অভিজ্ঞতা শুরু। আমি অবশ্য অভিজ্ঞতা যথেষ্ট সঞ্চয় করার আগেই শিক্ষকতা ছেড়ে চলে আসি। এরই মধ্যে অন্তত কয়েকটি ঘটনার কথা লিখে রাখা ভালো। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা উচিত, সবগুলি কাহিনীই আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে নয়। হয়তো শোনা গল্প কিন্তু আজ পঁচিশ বছর পরে মনে হচ্ছে এসব ঘটনা শুধু আমার ক্লাসেই হওয়া সম্ভব ছিলো।

প্রথম কাহিনীটি একটি বালকের। দৈনিক তিন সের করে দুধ দিলে একটা গরু এক সপ্তাহে কতটা দুধ দেবে? ছেলেটা লিখেছিলো, সাড়ে ষোলো সের। এই আশ্চর্য উত্তর দেখে আমি তাকে প্রশ্ন করেছিলাম, 'সাড়ে ষোলো সের কেন? এই অদ্ভুত সংখ্যাটি কি করে পেলে?' ছেলেটি খুবই বুদ্ধিমান, সে গরুটিকে সপ্তাহে দেড় দিন ছুটি দিয়েছে, শনিবার অর্ধদিন, রবিবার পূর্ণদিন ছুটি। সুতরাং পাঁচদিনে পনেরো আর আধ দিনে দেড়— মোট সাড়ে ষোলো সের।

আরেকবার 'একটি ফুটবল খেলার বর্ণনা' বলে একটি রচনা লিখতে দিয়েছিলাম একটি মাঝারী শ্রেণীতে। সাধারণত সব ছেলেই, ভালো হোক, খারাপ হোক, এই ধরনের রচনা যে যার সাধ্যমত লেখে। কিন্তু দেখলাম একটি ছেলে প্রায় সমস্ত পিরিয়ড চুপচাপ বসে রইলো। শেষে শেষ মুহূর্তে তাড়াতাড়ি কি এক পঙ্‌ক্তি লিখে খাতাটা জমা দিলো। কৌতূহলবশত তার খাতাটা নিয়ে দেখি সে লিখেছে, 'বৃষ্টির জন্যে আজ খেলা বন্ধ।'

আরেকবার পরীক্ষার মধ্যে হলের ভিতরে ঘুরছি। কোনো একটা নিচু শ্রেণীর পরীক্ষা হচ্ছে। হঠাৎ একটি ছেলে উঠে দাঁড়িয়ে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললো, 'স্যার, দেখুন বলাই টুকছে।' বলাই নামে ছেলেটি এই ছেলেটির পাশেই জানলার ধারে বসেছে। নালিশ শুনে আমি এগিয়ে গেলাম। দেখলাম বলাই জানলা দিয়ে তাকিয়ে রয়েছে, আমি কিন্তু তার

টেবিলে বা কাছাকাছি টোকবার মতো কোনো বই বা কাগজপত্র দেখতে পেলাম না। বলাই একেকবার মুখ তুলে জানলার বাইরে তাকাচ্ছে আর লিখে যাচ্ছে। নালিশকারী ছেলেটি আবার সরব হলো, 'স্যার, ঐ দেখুন টুকে যাচ্ছে।' অনেক চেষ্টা করার পর আসল ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম। প্রশ্নপত্রে গরুর উপরে রচনা এসেছে। জানলার বাইরে একটা গরু বাঁধা রয়েছে, বলাই সেটা দেখছে আর লিখে যাচ্ছে। এই গল্পটি যারা আগেই শুনেছেন তাঁদের জন্যে জীবজন্তু বিষয়ক রচনার ব্যাপারে আরেকটি কাহিনী লেখার দরকার আছে। দুই ভাই, সামান্য ছোট বড়, একই ক্লাসে দুই সেকশনে পড়ে। ঐ দুটি সেকশনেই আমি পড়াতাম এবং দু' জায়গাতেই আমার প্রিয় বিষয় 'একটি গৃহপালিত কুকুর' নিয়ে নিবন্ধ লিখতে দিয়েছিলাম। দুই সেকশনে দুই ভাই একই রচনা লিখে নিয়ে এসেছে, প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আগাগোড়া সব একরকম। এক ভাইকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'তোমার আর তোমার ভাইয়ের উত্তর হুবহু একরকম হলো কি করে?' ছেলেটি সরলভাবে প্রশ্ন করলো, 'কোন উত্তরটা স্যার?' আমি বকলাম, 'কেন, এই কুকুরের রচনাটা।' ছেলেটি নির্বিকার ভাবে কবুল করলো, 'স্যার, তা তো হবেই। আমাদের দুজনের যে একই কুকুর, স্যার।'

এমন সরল সহজ ব্যাপার আজকাল অবশ্য আর নেই। কুকুর, গরু কিংবা ফুটবল খেলার রচনার কথা এখন আর ভাবাই যায় না। ছেলে-মেয়েরা এখন একেকজন দিগ্‌গজ পণ্ডিত, তা ছাড়া তাদের সদাসতর্ক শিক্ষিতা মায়েরা ক্লাসগৃহের একশো গজের ভিতর থেকে সর্বদা কড়া দৃষ্টি রাখছেন, কি বা কতটুকু খাঁটি লেখাপড়া তাঁর ছেলে বা মেয়ে শিখছে। একদিকে ছেলে বা মেয়ের, অন্যদিকে মাস্টারমশাই বা দিদিমণির সামান্য গাফিলতি হলে তাঁরা ঝাঁপিয়ে পড়ছেন। শিবরাম চক্রবর্তীর সেই যে ছাত্র ইতিহাসের খাতায় লিখেছিলো, 'শের শাহ ঘোড়ার ডাকের প্রচলন করেন, ইহার পূর্বে ঘোড়া ডাকিতে পারিত না,' সেই ছাত্রের পৌত্র এখন মিশনারি ইস্কুলে লণ্ডনে ছাপা ইংরেজি বইতে রোম সাম্রাজ্যের ইতিহাস পড়ে। আমার পরিচিতা এক তরুণী শিক্ষয়িত্রী সেদিন দুঃখ করছিলেন, 'আর পারছি না। এমন সমস্ত

জিনিস এইটুকু-টুকু ছোট বাচ্চা জানতে চায়। কল্পনা করা কঠিন। সেদিন একটা বাচ্চা আমার কাছে জানতে চাইলো, পৃথিবীর ওজন কত। অনেক বইপত্র, এনসাইক্লোপিডিয়া ঘেঁটে উত্তরটা বার করে পরের দিন ক্লাসে বলতেই, পর পর তিনজন উঠে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলো, এই ওজনটা শুধু পৃথিবীর ওজন, না গাছপালা, জীবজন্তু, মানুষজন সমেত ওজন? এখন এর জবাব আবার কোথায় খুঁজি?'

গরম

একবার পুজোর আগে আমার মাতামহ দেওঘর না গিরিডি, কোথায় যেন যাচ্ছিলেন। দিনটা ছিলো মহালয়ার আগের দিন। সন্ধ্যার ট্রেনে কলকাতার অফিস-যাত্রীরা ভিড়ে গাদাগাদি হয়ে ঘামতে ঘামতে বাড়ি ফিরছে, সেদিন গরমও ছিলো অসহ্য। গাড়িটা উত্তরপাড়া পেরোতে না পেরোতেই দাদাবাবু ট্রেনের কামরার বেঞ্চির উপরে রাখা মিলিটারি ডিসপোজালে কেনা বড় কালো ট্রাঙ্কটা আমাকে দিয়ে খোলালেন। তখন ট্রাঙ্কটার ওপরে চারজন বর্ধমানের প্যাসেঞ্জার টোয়েনটি নাইন খেলছিলেন, প্রতিটি খেলোয়াড পিছু চার-পাঁচজন উৎসাহদাতা। ট্রাঙ্ক থেকে বেরোলো ঐ মিলিটারি ডিসপোজালেই কেনা খাকি কম্বলের মোটা ওভারকোট, যা গায়ে দিয়ে মাঘ মাসের মধ্যনিশীথে সীমান্ত রক্ষীরা হিমালয় পাহারা দেয়। ওভারকোটটা ভীষণ ভারী, আমার পক্ষে তোলাই কঠিন, তখনকার হিসেবে অন্তত দশ-পনেরো সের হবে।

সেই ভাদ্র সংক্রান্তির প্রচণ্ড গরমে সামান্য দ্বিধা বা চিন্তা না করে আমার মাতামহ ওভারকোটটি গায়ে দিয়ে বসলেন গুটিসুটি হয়ে, মুখে শুধু বললেন, 'বাবা, পশ্চিমে কি শীত!' এবং এখানেই শেষ নয়, ওভার-কোটের দুই ফোলা পকেট থেকে বেরোলো একটা উলের কানঢাকা বানর টুপি, আর একটা স্থূল মাফলার। মাথা এবং গলায় সেগুলি সাবধানে

জড়িয়ে মাতামহ আমাকে আদেশ দিলেন ট্রাঙ্কের ভিতরে ভালো করে খুঁজে দেখতে, হাতের দস্তানাগুলো কোথায় গেলো।

এই অসম্ভব ঘটনার আকস্মিকতায় বর্ধমানের ঘর্মাক্ত দিনযাত্রীরা কি রকম হতভম্ব হয়ে গেলেন এবং কি ভেবে হাতের তাস গুটিয়ে শ্রীরামপুর স্টেশন আসতে না আসতে সবাই সুড়সুড় করে নেমে গেলেন। ঐ গরমে গরম পোশাক দেখে তাঁরা এতটা বিচলিত কেন হয়েছিলেন তা আমি কখনোই ভেবে পাই নি। আমার মাতামহ কিন্তু নির্বিকারভাবে তখন শীতবস্ত্রের উষ্ণ নিরাপত্তার আচ্ছাদনে বসে জানলার বাইরে তাকিয়ে কাল্পনিক পশ্চিমা শীতের দৃশ্য উপভোগ করছেন।

প্রায় অনুরূপ ঘটনা ঘটেছিল কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের। তিনি স্ত্রী-পুত্র-কন্যা নিয়ে একবার বৈশাখের শেষে শান্তিনিকেতন গিয়েছিলেন। যতই গরম হোক, ভুবনডাঙার মাঠে দগ্ধতাম্র গ্রীষ্ম যতই অসহ্য হোক,

একজন কবি জুন মাসে রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন যাবেন এর মধ্যে আশ্চর্যের কিছু নেই। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার ছিলো অন্যত্র। ঐ গরমে শান্তিনিকেতনে শক্তি বহন করে নিয়ে গিয়েছিলেন, লেপ, কম্বল, আলোয়ান, কোট, ফুলহাতা সোয়েটার ইত্যাদি। পরিবারের প্রত্যেকের জন্যে আলাদা-আলাদা শীতবস্ত্র। বলা বাহুল্য, শান্তিনিকেতনে সবাই যাঁরা শক্তির সঙ্গে এইসব মারাত্মক শীতবস্ত্র সেই রুদ্র বৈশাখে দেখেছিলেন, বুঝতে পারেন নি এসবের আয়োজন কেন ?

এ বিষয়ে একটু ব্যাখ্যা দেওয়া দরকার। শক্তি চট্টোপাধ্যায় কলকাতার বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন দার্জিলিং যাবেন বলে। পোশাক-বিছানাও তদনুরূপ ছিলো। শেয়ালদা এসে দার্জিলিং মেলে চড়েছিলেন নিউ জলপাইগুড়ি যাবেন বলে। কিন্তু অতীব দুঃখের বিষয়, যাঁর টিকিট নিয়ে আসার কথা ছিলো তিনি আসতে পারেন নি। ফলে টিকিট না থাকায় নিউ জলপাইগুড়ি না গিয়ে শান্তিনিকেতন স্টেশনে, পথেই পড়ে, নেমে যেতে হয়।

প্রচলিত প্রবাদ আছে গরমে নাকি মানুষের মাথা খারাপ হয়ে যায়। রোদ্দুরের তাপে অসহ্য গ্রীষ্মে ঊর্ধ্ববায়ু হয়ে মানুষের পাগলামি বেড়ে যায়। এ কথা কতটা বৈজ্ঞানিক সত্য তা জানি না। কিন্তু আমি ছোটবেলায় যে মফস্বল শহরে বড় হয়েছি সেখানে প্রতি বছর গরমে একটা অদ্ভুত জিনিস দেখতাম। চৈত্র শেষ হয়ে গরম পড়তে না পড়তেই আমাদের প্রতিবেশী এক ভদ্রলোক গরমে পাগল হয়ে যাবেন ভয়ে অস্থির হয়ে যেতেন। এই পাগল হওয়ার বিরুদ্ধে তিনি যে প্রতিষেধক ব্যবস্থা নিতেন সেটা অতুলনীয়। সকালবেলা রোদ উঠতে না উঠতেই তিনি তাঁর বাড়ির পাশে পানাপুকুরে নেমে যেতেন। সেখানে কিছুটা পানা সরিয়ে আকণ্ঠ জলের নিচে মাথায় একতাল ঠাণ্ডা কাদা দিয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতেন। মাথার কাদা থেকে জল ঝরে গেলে সেটা বদলিয়ে আবার নতুন করে কাদা লাগিয়ে দিতেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করে জানা গিয়েছিলো যে, অতিরিক্ত গরমে যাতে মাথার গণ্ডগোল না হয় তাই এই ব্যবস্থা তিনি নিয়েছেন।

বহুকাল পরে উক্ত ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার আরেকবার দেখা হয়েছিলো। তখন আর মাথায় কাদা দিয়ে গ্রীষ্মের দিনে ডোবার জলে তিনি দাঁড়িয়ে থাকেন না। বরং উলটে তাঁর আত্মবিশ্বাস প্রচণ্ড বেড়ে গিয়েছে। অনেকগুলি দীর্ঘ গ্রীষ্ম পাগল না হয়ে পাড়ি দিতে পেরেছেন এই আনন্দে তখন তিনি আত্মহারা। তখন তাঁর মনে বদ্ধমূল ধারণা, তিনি এর পরে কোনো কারণেই কখনো পাগল হবেন না, হতে পারেন না।

ভদ্রলোক কোথায় যেন শুনেছিলেন যে, কাকের মাংস খেলে উন্মাদ হয়ে যায়। আমার সঙ্গে দেখা হতে তিনি আমাকে বলেছিলেন, 'ছাখো তারাপদ, ঐ কাকের মাংস খেয়ে পাগল হওয়ার ব্যাপারটা সম্পূর্ণ ভুয়ো। যে পাগল হবে না সে কিছুতেই পাগল হবে না। এই তো আমি পরীক্ষা করে দেখলাম। গত তিন মাস ধরে একটা করে কাক ধরে খাচ্ছি। কি তেতো, কি শক্ত কাকের মাংস, আর কি মড়াপচা গন্ধ। দৈনিক একটা করে কাক ধরে খাওয়া কি কম কঠিন। তা ছাড়া, আমি রাস্তায় বেরোলে যত রাজ্যের কাক দল বেঁধে কা-কা করে আমাকে তাড়া করে আসে। তা হোক শুধু সত্যের খাতিরে গত নব্বুই দিনে আমি নব্বুইটা কাক ধরে খেয়েছি। কিন্তু তাতেও আমার মাথার কোনো গণ্ডগোল হলো না।'

ভদ্রলোকের এই অসম্ভব আত্মবিশ্বাস দেখে আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম। ভদ্রলোক করুণ কণ্ঠে আমাকে বললেন, 'বুঝলে তারাপদ, শুনেছি প্রচণ্ড গরমে শুয়োর খেপে যায়, সেই খ্যাপা শুয়োর যদি মানুষকে কামড়ায় তাহলে মানুষ পাগল হয়ে যায়। আমি ভাবছি এই জ্যৈষ্ঠ মাসে ডোম-পাড়ায় শুয়োরের খোঁয়াড়ে গিয়ে একটু ছুটোছুটি করবো, দেখি সত্যি সত্যি শুয়োরে কামড়ালে আমি খেপে যাই কি না।'

অবশ্য গরমে উন্মাদ হওয়া সম্পর্কে এটাই শেষ গল্প নয়। শেষ গল্পটি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের। সুনীলের মতো সরল ভাষায় বলার ক্ষমতা আমার নেই। গল্পটি আত্মসাৎ করে আমি আমার মতো করে লিখছি।

মনে করুন, একত্রিশে জ্যৈষ্ঠ, বুধবার, বেলা একটা। এখনো কলকাতার আকাশে একবিন্দু মেঘ বা বৃষ্টির দেখা নেই। আপনি আলিপুরের একটা

অফিসে কি কাজে গিয়েছিলেন, বেরিয়ে এসে টের পেলেন চারদিকে সারা শহর গনগন করে জ্বলছে, গলা পিচ থেকে রাস্তায় ধোঁয়া উঠছে। রাস্তায় যানবাহন অতি বিরল। ট্রাম আসছে না দেখে আপনার লেডিস ছাতা মাথায় আপনি ট্রামরাস্তা ধরে হাজরার মোড়ের দিকে এগোচ্ছেন। কালীঘাট ব্রিজে উঠে আপনার বুকের রক্ত হিম হয়ে গেলো। শূন্য সাঁকোর উপরে উল্টোদিক থেকে একজন উলঙ্গ শক্তিশালী উন্মাদ উঠে আসছে। একটি বড় মিষ্টির ভাঁড় সে মাথায় টুপির মতো করে পরেছে, তার গলায় গামছার মতো কি একটা বাঁধা, এবং তার শরীরে ঐটিই একমাত্র বস্ত্র। তার হাতে একটি ডাবের শূন্য খোলা, রীতিমত বড়সড় ডাব সেটা। মাথায় মারলে, বিশেষ করে এই গরমে, যে কেউ অজ্ঞান হয়ে যাবে। উন্মাদটি আপনার মুখোমুখি এসে পড়েছে, কাছাকাছি সব ফাঁকা, পিছন ফিরে যাওয়া বোকামি হবে। সশঙ্ক চিত্তে অনিবার্য বিপদের প্রতীক্ষা করা ছাড়া আপনার গত্যন্তর নেই।

কিন্তু সে রকম কিছু ঘটলো না। পাগলটি ডাবের খোলাটি ব্রিজের রেলিং টপকিয়ে খালের মধ্যে ফেলে দিলো। তারপর আপনার কাছে এসে গলার ছেঁড়া গামছা দিয়ে মুখ মুছে লাজুক হেসে নিতান্ত বিনীত কণ্ঠে বললো, 'আর বলবেন না দিদি। যা একখানা গরম পড়েছে না, একেবারে পাগল করে দেবে!'

আমি কিরকমভাবে

কাণ্ডজ্ঞানের এই এক পৃষ্ঠার সংক্ষিপ্ত পরিসরে আমার নিজের চেহারা, কণ্ঠস্বর, বিদ্যা-বুদ্ধি, আত্মীয়-স্বজন নিয়ে এত কথা লিখেছি যে অতি বড় নির্লজ্জ ছাড়া বোধহয় আর কারো পক্ষে সেটা সম্ভব নয়। কোনো পাঠক বা পাঠিকা আমাকে যদি ইগো-ম্যানিয়াক ভাবেন তা হলেও আমার কিছু করার নেই।

আমি অনুপায়। নিজেকে নিয়ে এমন সমস্ত দুঃখজনক অভিজ্ঞতার মধ্য
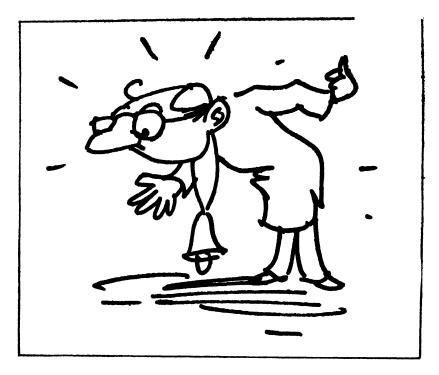
দিয়ে আমাকে অনবরতই যেতে হয় যে তা হয়তো অনেক সময় অনেকের কাছেই বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে না। আমার তবু উপায় নেই, লিপিবদ্ধ করে আমার বেদনাভার যতটুকু লাঘব করা যায় তাই আমার চেষ্টা।

কেন যে লোকেরা আমাকে বারবার ভুল বোঝে সেটা আমি আজ অবধি কিছুতেই ধরে উঠতে পারি নি। এই তো গত রবিবার সন্ধ্যাবেলা রীতিমত ধোপদুরস্ত ধুতি-পাঞ্জাবি পরে সেজেগুজে সস্ত্রীক একটি বিখ্যাত হলে নাটক দেখতে গিয়েছিলাম। দুঃখের বিষয় মঞ্চের উপর স্বরপ্রক্ষেপণ যন্ত্রটি ঠিকমত কাজ করছিলো না। কখনো অতিশয় উচ্চগ্রাম, আবার কখনো অতি স্তিমিত ; নাটকটির স্বরসাম্য বারবার বিঘ্নিত হচ্ছিলো। অন্যান্য শ্রোতাদের মতো আমিও কিঞ্চিৎ বিব্রত বোধ করছিলাম। এমন সময় একজন কর্মকর্তা অন্ধকার প্রেক্ষাগৃহে বেড়ালের মতো চোখে খুঁজে খুঁজে আমার সিটের সামনে এসে দাঁড়ালেন, তারপর পিঠে মৃদু টোকা দিয়ে

আমাকে উঠে আসতে বললেন। আমি কিছু অনুমান না করতে পেরে ভদ্রলোকের সঙ্গে পিছনের দরজা দিয়ে মঞ্চে উঠে গেলাম। একটু পরেই বুঝলাম ভদ্রলোক ভুল করেছেন; তিনি ভাবছেন যে আমি এই হলের ইলেকট্রিক মেকানিক এবং যদিও ধুতি-পাঞ্জাবি পরে থিয়েটার দেখছি, এই যন্ত্রপাতি আমাকে ঠিক করে দিতে হবে এখনই। না হলে আমার চাকরি উনি খেয়ে দেবেন।

আমার চাকরি অবশ্য শেষ পর্যন্ত ঐ ভদ্রলোক খান নি কিন্তু কি অন্যায় নাজেহাল হলাম! বিনা প্রতিবাদে রীতিমত অপমানিত হলাম। প্রতিবাদ করে লাভ নেই। কারণ আমি জানি যে চিরকাল যেখানে যে গাফিলতি হয়েছে, আমাকেই সেখানকার লোকেরা গাফিলতকারী হিসাবে সনাক্ত করেছে। আমার এক বন্ধবী তাঁর বাড়িতে তাঁর অসাক্ষাতে যখনই কোনো কাচের গেলাস বা পেয়ালা ভাঙে, তিনি বাড়ি এসে খোঁজ করেন, 'নিশ্চয়ই তারাপদ এসেছিলো?' আমি স্বকর্ণে শুনেছি, মহিলা ভিতরের দিকে রান্নাঘরে কি করছেন, এদিকে বাইরের ঘরে আমাদের চায়ের আসরে কি করে একটা চীনেমাটির প্লেট কার হাত থেকে পড়ে ঝনাৎ করে ভেঙে গেলো। মহিলা রান্নাঘর থেকে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'ঐ যাঃ, তারাপদ আবার যেন কি ভাঙলো!' কিন্তু প্রকৃত সত্য এই যে ঐ বাড়িতে কিংবা নিজের বাড়িতে অথবা অন্য কোথাও আমি কদাচিৎ কোনো জিনিস ভেঙেছি।

কিন্তু শুধু চেনাশোনা বন্ধুবান্ধব আত্মীয়-স্বজন নয়, রাস্তাঘাটে অচেনা জায়গায় অপরিচিত লোক পর্যন্ত আমাকে সামান্য দেখেই কি একটা ভুল ধারণা তৈরি করে ফেলে।

কেউ বিশ্বাস করবেন না জানি। তবু ব্যাপারটা বলে রাখা ভালো। তখন আমি খুব একটা নাবালক নই। রীতিমত অফিসে চাকরি করছি, প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা অফিস ছুটির পর কলেজ স্ট্রিটে যাই আড্ডা দিতে। ডালহৌসি স্কয়ার থেকে গোলদীঘি সামান্যই রাস্তা, হেঁটেই যেতাম। লাল-বাজারের পর বৌবাজার-বেন্টিঙ্ক স্ট্রিটের মোড়ে ডানদিকে কয়েকটা চামড়ার জিনিসের দোকান পাশাপাশি। এই দোকানগুলোতে বাস কণ্ডাক্টরের

খুচরোর ব্যাগ, চাপরাসির কোমরবন্ধ, ঘোড়ার তকমা, ছাগলের বা গরুর গলার ঘুঙুরের মালা ইত্যাদি আশ্চর্য সব দ্রব্যাদি বিক্রি হয়। এ সব জিনিসের কিন্তু কোনো ক্রেতার অভাব নেই, সবগুলি দোকানই বেশ জমজমাট।

একদিন সন্ধ্যার দিকে ঐ দোকানগুলির সামনের ফুটপাথ দিয়ে দ্রুত হেঁটে কলেজ স্ট্রিটের দিকে এগোচ্ছি। সেদিন কি কারণে যেন অফিস থেকে বেরোতে একটু দেরি হয়ে গেছে। হঠাৎ একটা চামড়ার দোকানের সামনে বাধা পড়লো, দুই গ্রাম্য ভদ্রলোক চামড়ার সরঞ্জাম কিনছিলেন, তাদেরই একজন আমাকে আটকালেন, 'দাদা, এক মিনিট দাঁড়িয়ে।' তারপর দুজনে মিলে আমার ঘাড় এবং গলার দিকে তাকিয়ে অস্ফুট কণ্ঠে কি আলোচনা করতে লাগলেন। একটু পরেই বুঝতে পারলাম বিষয়টি আমার পক্ষে মোটেই সম্মানজনক নয়। এঁদের গ্রামের বাড়িতে সদ্যোজাত গোবৎসটি কিঞ্চিৎ চঞ্চল, তার অবস্থান ও গতিবিধি নির্ণয়ের জন্যে তার গলার জন্যে একটি ঘুঙুর-বসানো চামড়ার নেকলেস চাই। কিন্তু বাছুরটির গলার মাপ তাঁরা নিয়ে আসেন নি। তবে আমাকে দিয়ে চলবে। আমার গলার চেহারা নাকি একেবারে তাদের বাছুরের গলার মতো। আমার যদি কোনো অসুবিধা না হয় তা হলে আমি যদি একটু দাঁড়াই তাহলে আমার গলার মাপে বাছুরের ঘুঙুরটা তাঁরা কিনতে পারেন।

এ অবস্থায় আমি কি করেছিলাম? কি প্রতিক্রিয়া হয়েছিলো আমার? একটি গোবৎসকে গলায় ঘুঙুর বাঁধার আনন্দ থেকে বঞ্চিত করে মিথ্যা আত্মসম্মানে অন্ধ হয়ে হনহন করে হেঁটে গিয়েছিলাম, নাকি গলা বাড়িয়ে দিয়েছিলাম মাপ দেবার জন্যে?

যাই করে থাকি, আমি কিন্তু এই গ্রাম্য ব্যক্তিদের সরলতাকে মনে মনে অনেকদিন আগেই ক্ষমা করে দিয়েছি। কিন্তু আমার সহপাঠী বন্ধু সিদ্ধিনাথকে কোনো কালে ক্ষমা করতে পারবো না।

অনন্তকাল আগে আমি আর সিদ্ধিনাথ এক কলেজে এক সঙ্গে পড়তাম। আজকাল তার সঙ্গে কালেভদ্রে দেখা হয়। কি কারণে যেন

সিদ্ধিনাথ চিরকালই আমাকে খুব তালেবর, শাহেনশা ব্যক্তি বলে মনে করে। হঠাৎ হঠাৎ এসে উল্টোপাল্টা পরামর্শ বা সাহায্য চায়। নানারকম ফিকির সিদ্ধিনাথের। শহরতলীতে এক আত্মীয়ের সঙ্গে একটা কাঠ-চেরাইয়ের ব্যবসা করেছিলো সিদ্ধিনাথ। ভালোই চালাচ্ছিলো, হঠাৎ একদিন এসে বলে আত্মীয়-অংশীদারের সঙ্গে কি গোলমাল হয়েছে, ও ব্যাটাকে ভাগাতে হবে। আমি তাকে বললাম কোনো উকিলের কাছে গিয়ে দেওয়ানি মামলা করতে। বললো, 'তা নয়। ওকে আমি পুড়িয়ে মারতে চাই। তুমি আমার এই উপকারটুকু করো।' আমি অবাক হয়ে বললাম, 'মানে?' সিদ্ধিনাথ যা বললো তাতে বুঝলাম ব্যাপারটা তেমন কিছু না, আজ রাত দুটো থেকে আড়াইটার মধ্যে সে তার শত্রুর বাড়ির পিছনের রাস্তায় আমাকে নামিয়ে দেবে। উদ্যোগ আয়োজন, সব রকম বন্দোবস্তই সে করেছে, যথা পেট্রলের টিন, তুলোর বল, মশাল। আমাকে শুধু নির্দিষ্ট বাড়িটিতে অগ্নিসংযোগ করে রাতের অন্ধকারের আড়ালে দৌড়ে তার জিপে এসে উঠতে হবে। পুরনো বন্ধু হিসেবে অন্তত এটুকু কি আমি তার জন্যে করবো না?

সিদ্ধিনাথকে আমি জন্মজন্মান্তরেও ক্ষমা করবো না, কিন্তু আমি তার কাছে কৃতজ্ঞ, সে আমার অন্তর্দৃষ্টি খুলে দিয়েছে।

উপনিষদের ঋষি বলেছিলেন, আত্মানং বিদ্ধি—নিজেকে জানো। আমি এখন নিজেকে জানতে চাই। আমি কে? আমি কেমন? আমি কি অগ্নিসংযোগের নায়কের মতো, আমি কি গরু বাছুরের বিকল্প, নাকি নিতান্তই সাদামাঠা কাচ কিংবা চীনেমাটির বাসন ভাঙার কারিগর?

আমার এই চিরায়ত প্রশ্নের চমৎকার জবাব দিয়েছিলেন আমার পূজনীয়া স্ত্রী। বিদেশ যাওয়ার জন্যে পাসপোর্টের ফটো তুলেছিলাম। যেমন হয়—অনেকটা আমার মতো, অনেকটা অস্পষ্ট, যেন আমি নই, তবে আমার ডবল, দু' নম্বর তারাপদর দু' নম্বরি ছবি।

পাঁচ সপ্তাহ বিদেশ ঘুরে ফিরে এলাম। ঘাটা-আঘাটায়, পথে-বিপথে। মাথায় একমাসের আতেলা চুল, চোখের নিচে কালি, ওজন সাত কেজি

কম। দমদম বিমানবন্দরের লাউঞ্জে প্রাণাধিকা বললেন, 'জানো, তোমাকে ঠিক তোমার পাসপোর্ট ফটোর মতো দেখাচ্ছে।'

মন মোর মেঘের সঙ্গী

যদি কোন পাঠক 'ভুলোমন মাস্টারমশায়' এবং 'পাগলের কাণ্ডজ্ঞান' পড়ে থাকেন, তবে তাঁর পক্ষে আজকের এই রচনা পড়ে হাসা হয়তো একটু কঠিন হবে।

ভুলোমন মাস্টারমশায় এবং উদ্দাম পাগলের মধ্যে হাজার হাজার লোক রয়েছে যারা খাচ্ছে-দাচ্ছে, অফিস যাচ্ছে, ঘুমোচ্ছে কিন্তু কোথায় যেন মনের মধ্যে কি একটা ব্যাপারে কি রকম যেন গোলমাল রয়েছে, কিসের খটকা, অস্পষ্টতা।

আমাদের এক বিখ্যাত বন্ধু নানারকম ছক এঁকে স্থাপত্য বিজ্ঞানের নকশা বানিয়ে এবং বীজগণিতের অতি দুরূহ সমস্ত সমীকরণ করে বার করে-ছিলো যে উনিশশো চুয়াত্তর সালের সাতই জুলাই, রাত এগারোটা বেজে সাতাশ মিনিট সাড়ে বত্রিশ সেকেণ্ডে কলকাতা ময়দানের অক্টরলোনি মনুমেণ্ট মানে শহীদ মিনার ভেঙে পড়ে যাবে, একেবারে মুখ থুবড়ে, গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে পড়ে যাবে। কুতুব মিনার, তাজমহল, ভিক্টোরিয়া স্মৃতিসৌধ ইত্যাদি ঐগুলি কবে ভেঙে পড়বে সে বিষয়েও তার বেশ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম হিসেব ছিলো। তার বাধ্যবাধকতায় এবং বন্ধুর প্রতিভার প্রতি চক্ষুলজ্জার খাতিরে দশ বছর আগের আষাঢ় শেষের এক প্রবল বৃষ্টির রাতে আমরা সাত-আটজন বন্ধু ছাতামাথায় দিয়ে দাঁড়িয়ে এগারোটা সাতাশ মিনিট বেজে যাওয়ার পরেও আরো ঘণ্টাখানেক এক হাঁটু কাদাজলের মধ্যে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করেছিলাম। সেদিন রাতে কেন, মনুমেণ্ট আজও ভাঙে নি, অদ্যাবধি তাজমহল ইত্যাদিও অটুট আছে। আমার সেই বন্ধুটি এ বিষয়ে আর উচ্চবাচ্য করেন নি।

এরকম মানসিক সমস্যা অনেকের সাময়িকভাবে দেখা দেয়। তারপর কিছু সময় অথবা কোনো এক বিশেষ ঘটনার পরে সেটা মন থেকে উবেও যায়।

কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে মানসিক রোগীর মনে কোনো কোনো ধারণা বদ্ধমূল হয়ে থাকে। খিদিরপুরের দিকে এক প্রৌঢ় ভদ্রলোককে জানি। তাঁর বাল্যকাল কেটেছিলো জাপানী যুদ্ধের আমলে ঐ খিদিরপুরের পাড়ায়। কেন যেন তাঁর ধারণা রয়েছে যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এখনো শেষ হয় নি। জাপানী যুদ্ধবিমান যে কোনো মুহূর্তে হানা চালাতে পারে। এখনো মাঝরাতে তিনি কখনো কখনো ছাদে উঠে যান, চিলেকোঠার জানলার নিচে হামাগুড়ি দিয়ে বসে সন্তর্পণে সারা আকাশ তন্নতন্ন করে দেখেন, কোথাও বোমারু বিমানের ছায়া চোখে পড়ে কি না।

এক সাহেবের কথা পড়েছি হাসির গল্পের বইতে। তার ধারণা সে

গরু। মাঝেমধ্যে মাঠে নেমে চার পায়ে হামাগুড়ি দিয়ে কচি ঘাস খাওয়ার চেষ্টা করে, কখনো কখনো হাম্বা-হাম্বা করে ডাকে।

অফিস-কাছারি সবই ঠিকঠাক চালিয়ে যাচ্ছিলো সেই সাহেব। শুধু ফাঁকে-ফাঁকে, ছুটিতে-অবসরে একটু-আধটু গরুগিরি করতো। রবিবারের সকালে মাঠে নেমে ঘাস খাওয়া, হঠাৎ মধ্যরাতে ঘুম ভেঙে হাম্বা-হাম্বা রব তোলা—সাহেবের মিসেস সাহেব, মানে এককথায় মেমসাহেব, কোনো রকমে মানিয়ে-শুনিয়ে প্রায় চালিয়ে যাচ্ছিলেন।

বিপদ হলো, একদিন ঐ সাহেব কি এক উত্তেজনার আতিশয্যে নিজেকে ওভার-এস্টিমেট করে ফেললেন। একটি প্রকৃত চার পেয়ে, লেজঝোলা, দুগ্ধ-দায়িনী গরুর সঙ্গে হঠাৎ গুঁতোগুঁতি বাধিয়ে ফেললেন। তবু ষাঁড় নয়, বলদ নয়, নিতান্ত গরু সেটা। অস্থিচর্মসার, বেঁটে নিতান্তই আটপৌরে দিশি গরু না হলেও বিলিতি গরু। ষাঁড় কিংবা বলদের তুলনায় কম শক্তিশালী। তাই সাহেব প্রাণে বেঁচে গেলো। এক রবিবার বিকেলে গ্রামের মাঠে নেমে নিরীহ একটি গরুর সিং-এর সঙ্গে নিজের কপাল ঠেকিয়ে হাম্বা রব তুলে লড়ে গিয়েছিলেন। হতভম্ব গরুটি এক গুঁতোয় তাঁকে মাটিতে ফেলে, পিছনের দুই খুর দিয়ে লাথি মেরে ছুটে পালিয়ে গেলো।

এই অঘটনের পর মেমসাহেব প্রায় জোর করে তাঁকে নিয়ে গেলেন মনোবিকারের ডাক্তারের কাছে।

নানা রকমের কথাবার্তা, আলাপ-আলোচনা করে ডাক্তার সাহেব তাঁর রোগীর কোনো বিকার আবিষ্কার করতে পারলেন না। সব বিষয়ে সব প্রশ্নের ঠিকঠাক, যে কোনো বুদ্ধিমান, সাব্যস্ত ব্যক্তির মতো উত্তর দিচ্ছেন তথাকথিত রোগীটি কিন্তু যে মুহূর্তে গরুর প্রশ্ন তুলছেন, গরুর প্রসঙ্গে ফিরে আসছেন, সাহেব হাম্বা করে উঠছেন, বিকট সেই হাম্বা চীৎকার অনেকক্ষণ ধরে। ডাক্তার সাহেব যতই বোঝান ততই সাহেবটি বলেন যে, তাঁকে বুঝিয়ে কোনো লাভ হবে না, কারণ বোঝার কিছু নেই, তিনি নিজের মনে মনে অনেক বুঝে দেখেছেন এবং তিনি ভালো করেই জানেন তিনি সত্যিই গরু, একটি আসল গরু, মানুষ নন, কিছুতেই মানুষ নন।

এমন রোগী এমনকি ঐ মনোবিজ্ঞানের স্বর্গভূমি বিলাত দেশেও খুব বেশি পাওয়া যায় না। ডাক্তার সাহেব ক্লান্ত হয়ে পড়লেন এবং স্বভাবতই জানতে চাইলেন, 'কবে থেকে আপনি বুঝতে পারলেন যে, আপনি মানুষ নন, আপনি গরু?' সাহেবটি তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন, 'সে অনেক কাল থেকে।' ডাক্তার সাহেব বললেন, 'তবু বলুন কতদিন আগে থেকে।' রোগীটি এবার একটু মৃদু হাসলেন, তারপর এক লাফ দিয়ে চেম্বারের কোচের উপর চতুষ্পদ জন্তুর মতো চার পায়ে দাঁড়িয়ে, মৃদু হাম্বা-হাম্বা ধ্বনি তুলতে তুলতে বললেন, 'সেই যবে বাছুর ছিলেম তবে থেকে।' ডাক্তার সাহেব এবার বুঝতে পারলেন, ইনি শুধু বর্তমানের গরু নন, ইনি একদা বাছুরও ছিলেন। এরপর ডাক্তারের আর কিছু করার রইলো না, হাল ছেড়ে দিলেন। তবে মেমসাহেবকে পরামর্শ দিলেন, 'আপনার স্বামীর জন্য আর কিছু করার নেই। তবে ঘাস-বিচালি খেয়ে পুষ্টির অভাবে যাতে মারা না পড়ে সেইজন্য ঘাসের সঙ্গে একটু কয়ে ভিটামিন কমপ্লেক্স মিশিয়ে দেবেন।'

অবশ্য এ কাহিনী একেবারে প্রত্যন্ত সীমার। কাছাকাছির মধ্যে একজন নামকরা কবিকে জানি, যাঁর বয়েস এখন অন্তত ছেচল্লিশ-সাতচল্লিশ। তাঁর ধারণা তিনি এখনো লম্বা হচ্ছেন। তাঁর বাড়ির দেয়ালে স্কেলকাঠি দিয়ে ছকে রেখেছেন। মাঝেমধ্যেই দেয়ালে পিঠ দিয়ে নিজেকে মাপেন, কখনো মনে হয় একটু বেড়েছেন, কখনো তত বাড়ছেন না বলে আপসোস করেন। চৌদ্দ-পনেরো বছরের যে কোনো উচ্চতাকাঙ্ক্ষী, লম্বাপরায়ণ কিশোরের মতো তাঁর উৎসাহ এ বিষয়ে। তিনি নিয়মিত রিং করছেন এবং যোগব্যায়াম। কে তাঁকে বোঝাবে এ জন্মে তাঁর আর লম্বা না হলেও চলবে এবং হাজার চেষ্টাতেও তিনি লম্বা হবেন না, হতে পারেন না।

আমার ভাইয়ের এক সহকর্মী ট্রামের ব্যবহৃত টিকিট সংগ্রহ করতেন। কত লোকের কত রকম বাতিক থাকে, দেশলাইয়ের খোলা থেকে বাঘের চামড়া কত মানুষ কত কি জমায়—সুতরাং টিকিট সংগ্রহকারীর বন্ধু-বান্ধব, অফিসের লোকেরা তাঁর ঐ বাতিক নিয়ে কিছু মাথা ঘামায় নি।

একবার ভদ্রলোক মাসখানেক অফিসে আসেন নি। তাঁর স্ত্রীর চিঠি

পেয়ে আমার ভাই তাঁর বাড়িতে যায়, গিয়ে দেখে তিনি শয্যাশায়ী। ভদ্রলোকের স্ত্রী বললেন অতিরিক্ত ট্রামের টিকিট খেয়ে নাকি তাঁর ঐ অবস্থা। আমার ভাই বিছানার পাশে টেবিলের উপরে তাকিয়ে দেখলো নানা রঙের, নানা দামের রাশি রাশি ট্রামের টিকিট আলাদা আলাদা করে তাড়া বেঁধে রাখা আছে। সামনে একটা প্লেট, প্লেটের পাশে কাসুন্দি, টম্যাটো সস, চিলি সসের শিশি, নুনদান, মরিচদান। আমার ভাই অবাক হয়ে ঐদিকে তাকিয়ে থাকায় শয্যাশায়ী বন্ধু আমার ভাইকে জিজ্ঞাসা করলেন, অল্প কাসুন্দি ও চিলি সস দিয়ে কয়েকটা ধর্মতলা টু হাওড়ার সেকেণ্ড ক্লাশের সবুজ রঙের তাজা টিকিট টেস্ট করে দেখবে কিনা, কিংবা টম্যাটো সসে চুবিয়ে কয়েকটা ধবধবে সাদা বালিগঞ্জ-পার্ক সার্কাস লাইনের টিকিট ? ভদ্রলোকের স্ত্রী বললেন, 'এতদিন তো তবু ভালোই ছিলো ; চিৎপুর, বাগবাজার, বেলগাছিয়ার টিকিট তবু মোটামুটি হজম হচ্ছিলো, কিন্তু এই হাওড়ার আর বালিগঞ্জের টিকিট কিছুতেই ওঁর সহ্য হচ্ছে না। ডাক্তারও দেখাবে না, অথচ হাওড়ার টিকিটের জন্য কি লোভ কি বলবো ?'

সেই ট্রাম-টিকিটলোভী ভদ্রলোকের কি হয়েছিলো, ঈশ্বর জানেন। তিনি আর অফিসে আসেন নি। আমার ভাইও ভয়ে ভয়ে যায় নি।

কিন্তু শুধু কাগজ খাওয়া বা গরু মনে হওয়া নয়, অনেক ছোটখাট মানসিক অস্বাভাবিকতায় আমরা ভুগি। কেউ হয়তো বিনা কারণে ভয় পাই, কারো হয়তো বারান্দার রেলিংয়ের কাছে দাঁড়ালে মাথা ঘোরে, বন্ধ ঘরে দম বন্ধ হয়ে আসে। আবার কেউ হয়তো একা-একা কথা বলে।

এই রকম এক একা-একা কথা বলার রোগী এক মনঃসমীক্ষকের কাছে গিয়েছিলেন। মনের ডাক্তার ব্যাপারটাকে গুরুত্ব দিলেন না, বললেন, 'তাতে কি হয়েছে ? অনেকেই একা একা কথা বলে, আমি নিজেই বলি।' রোগী করুণ কণ্ঠে বললেন, 'কিন্তু, জানেন না তো ডাক্তারবাবু, আমি যে কি সাংঘাতিক বোর! নিজে নিজে কথা বলে আমি একদম টায়ার্ড হয়ে যাই।'

গরু
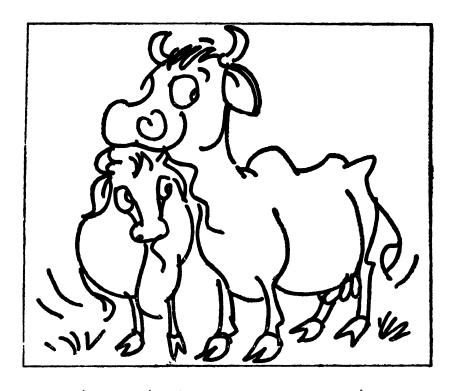
গরুর ইংরিজি কাউ। কিন্তু কোনো গরুর নামও যে কাউ হতে পারে সেটা জানা গেলো ইম্ফলের এক খবরে।

কাউ নামে ইম্ফল শহরের এই বলদটি সংবাদ সৃষ্টি করেছে। সে অন্যান্য ধর্মের ষাঁড়ের মতোই পথচারী এবং বলশালী, সংস্কৃত শ্লোকের ভাষায় বলা যেতে পারে তার ভোজন যত্রতত্র, শয়ন হট্টমন্দিরে। তাকে অনেকে খাবার দেয়, অনেকে দেয় না। কিন্তু এ নিয়ে তার কোনো বাড়াবাড়ি, জোরাজুরি নেই। তরকারির দোকানে গিয়ে সে মুখ বাড়ায়, তরকারিওলা তাকে সামান্য কিছু দিলো কি দিলো না, তারপর পরের দোকানে চলে গেলো। গৃহস্থবাড়ির দরজাতে গিয়েও তাই। কিছু মিললো তো কাউ খুশি মনে

জাবর কাটতে কাটতে পরের দরজায় গেলো। না মিললেও তার কোনো ক্ষোভ, ক্রোধ বা উষ্মা নেই, সরল মনে সে চলে যায়।

কাউয়ের মতো পথের গরু সব জায়গাতেই দেখা যায় বলবান অথচ বিনীত, নিরভিমান, পরমুখাপেক্ষী। কাউ সংবাদ হয়েছে অন্য কারণে। কারণটি রীতিমতো রাজনৈতিক। সে গরুমুক্তি আন্দোলন শুরু করে দিয়েছে। এমনিতে অন্য কোনো গরু বা মানুষের উপরে তার কোনো রাগ দেখা যায় না। কিন্তু কাউ যদি দেখে কোনো গরুকে মানুষ খাটাচ্ছে, যেমন গাড়ি টানাচ্ছে বা লাঙ্গল চালাচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে সে ক্ষিপ্ত হয়ে ছুটে যায়। কাউয়ের সামনে দিয়ে কোনো গরুর গাড়ি নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। চোখে পড়লেই শিং তুলে দৌড়ে আক্রমণ করবে, গাড়িতে যুক্ত বলদ বা ষাঁড় দুটিকে মুক্ত না করা পর্যন্ত গাড়োয়ানের পরিত্রাণ নেই। পারতপক্ষে কাউ যখন যে রাস্তায় থাকে, সে পথ দিয়ে কোনো দুঃসাহসী গাড়োয়ানও গাড়ি নিয়ে যায় না। কৃষকদেরও যথেষ্ট বিপদ, শহরতলীর রাস্তা ধরে জোয়ালে বাঁধা গরু নিয়ে মাঠে চাষ করতে যাওয়া অসম্ভব হয়ে উঠেছে, এই দৃশ্য চোখে পড়লেই কাউ ছুটে আসবে। কৃষকেরা প্রাণের ভয়ে চাষের গরু আলাদা করে মুক্ত অবস্থায় নিয়ে যায়, তার আগে বা পরে লাঙ্গল নিয়ে যায়, যাতে কাউ জোয়ালে বদ্ধ অবস্থায় চাষের গরু দেখতে না পায়।

দিগ্‌দিগন্তে, গ্রামে গ্রামে, জনপদে ইম্ফলের প্রবল পরাক্রান্ত কাউয়ের এই গরুমুক্তি আন্দোলন যদি প্রসারিত হয় তা হলে অদূর ভবিষ্যতে হয়তো এই সুপ্রাচীন দেশের সনাতন ঐতিহ্যের প্রতীক গো-শকট লুপ্ত হয়ে যাবে এবং ক্ষেতে চাষ ঘোড় দিয়ে কিংবা ট্রাক্টর দিয়ে করতে হবে।

কাউ কেন এরকম করে? গরুর মনস্তত্ত্ববিদ থাকলে হয়তো জার্মান ও লাটিন শব্দ কণ্টকিত একটা সাড়ে সাত পাতা ব্যাখ্যা দিতে পারতেন। কিন্তু তার কোনো সম্ভাবনা নেই। তবে গরুর যে বুদ্ধির অভাব নেই সে বিষয়ে আমি নিজেই সাড়ে সাত পাতা লিখতে পারি।

বছর পঁচিশ আগে কালীঘাটে একটা বিখ্যাত ষাঁড় ছিলো। যে কোনো ফৌজদারি মামলার আসামীর মতো তার একাধিক নাম ছিলো (বলহরি

ওরফে শিবু)। কেওড়াতলার দিকে দেখেছি স্থানীয় লোকেরা তাকে বলহরি বলে ডাকে, এদিকে হাজরার মোড়ের দিকে তার নাম ছিলো শিবু। বহু-রকম গোলমেলে কার্যকলাপ ছিলো এই বলহরি ওরফে শিবুর। একাধিক-বার সে বসুশ্রী কফিহাউসের দোতলায় উঠবার চেষ্টা করেছে। বোধ হয় কারো খোঁজে যেতো। চারু মার্কেট থেকে জগুবাবুর বাজার—দক্ষিণ কলকাতার এই বিস্তীর্ণ এলাকা ছিলো তার সাম্রাজ্য। আমাদের পুরনো বাড়ির ভাঙা সঙ্কীর্ণ প্যাসেজে একেকদিন রাতে সে পথ আটকে শুয়ে থাকতো, তাকে টপকিয়ে বাড়ি ঢুকতে হতো। গভীর রাতে ক্লান্ত দেহে একটি পর্বতপ্রমাণ তীক্ষ্ণশৃঙ্গ বলীবর্দকে অতিক্রম করে গৃহপ্রবেশ খুব মধুর ছিলো না, তার অত্যাচারে বেশ কিছু দিন আমাকে নৈশভ্রমণ বন্ধ রাখতে হয়।

চুরি করে বা জোর করে খাওয়া, নিরীহ পথিককে তাড়া করে যাওয়া, শিশু ও মহিলাদের ভয় দেখিয়ে তাদের হাত থেকে মিষ্টি বা সিঙ্গাড়ার চুপড়ি ছিনিয়ে নিয়ে অতি দ্রুত গলাধঃকরণ করা ইত্যাদি ষণ্ডজনিত বহুরকম অন্যায় সে করতো। একবার কি কারণে উত্তেজিত হয়ে কালিকা সিনেমার দশ আনার লাইনের নিরীহ দর্শকদের সে গুঁতিয়ে দেয়। কয়েকবার নির্বিকার চিত্তে ট্রামলাইনে শুয়ে থেকে সে দক্ষিণ কলকাতার ট্রাফিক ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বানচাল করে দেয়; এদিক দিয়ে সে পাতাল রেলের পূর্বসূরী।

এই রকম সব নানাবিধ কুকর্ম করার জন্যেই সে দাগী আসামীদের মতো দুটি নামের সুবিধে গ্রহণ করে। রাসবিহারী পাড়ার লোকের নালিশ শুনে কালীঘাট ফাঁড়ির পুলিস যখন বলহরিকে খুঁজতে বেরিয়েছে, তখন সে নিশ্চিন্ত চিত্তে ঘুরে বেড়াচ্ছে হরিশ মুখার্জি রোডে—সেখানে সে শিবু নামে পরিচিত।

বলহরি যে সব সময় বেআইনী কাজ করতো তা কিন্তু নয়। হাজরার দক্ষিণ-পশ্চিম মোড়ে জুতো পালিশওলাদের বেআইনী অবস্থান সে একাধিকবার গুঁতিয়ে তছনছ করে দেয়। একটি অশ্লীল পত্র-পত্রিকার

দোকানের সব বইপত্র কিছু খেয়ে ফেলে, কিছু ছিঁড়ে পদদলিত করে সে পর্নো-বিপণিটি চিরতরে তুলে দেয়।

আমরা তাকে তার মধ্য-যৌবনে দেখেছি। তখন তার রাশভারি, অভিজাত ভাব। উত্তেজিত বা ক্রুদ্ধ না হলে ছুটোছুটি, গুঁতোগুঁতি করতো না। তবে তার বুদ্ধি তখন তুঙ্গে। বলহরি রাস্তায় দাঁড়িয়ে বিশ্বকর্মা পুজোর সময়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে ঘুড়ি কাটাকাটি দেখতো। ঘুড়ি কেটে গেলে নির্দিষ্ট স্থানে হেলতে-দুলতে সমবেত দৌড়বাজ বালকদের উপেক্ষা করে, কখনো শিং দিয়ে সরিয়ে, সে একটু মাথাটা তুলে উড়ন্ত ঘুড়িটা মুখে ধরে খেয়ে নিতো। ঘুড়িব প্রতি প্রচণ্ড আসক্তি ছিলো তার। কালীঘাটে রথের মেলায় যে বেশ কয়েক বছর ঘুড়ির দোকান বসে নি তার প্রধান কারণ বলহরির অত্যাচার। হাজরার মোড়ে যখন প্রথম বৈদ্যুতিক ট্রাফিক আলো এলো সে সময় লাল-সবুজ-হলুদের পার্থক্য সে আমাদের অনেক আগে বুঝতে পেরেছিলো। প্রৌঢ় বলহরিকে দেখেছি ট্রাফিক লাইটের দিকে তাকিয়ে রয়েছে সবুজ আলোর প্রতীক্ষায়।

তবে শেষের দিকে বলহরি বড় অলস হয়ে গিয়েছিলো। কিছুতেই নড়াচড়া করতো না, খাদ্যসংগ্রহে যেতে চাইতো না। তখন শুধু রুমাল খেতো বলহরি। নিঃশব্দে পথচারীর পকেট থেকে সে রুমাল তুলে নিতো। নিষ্কলঙ্ক ইস্পাতের ছুরি দিয়ে মাখন কাটার মতো ছিলো তার উত্তোলন ক্ষমতা। নিরীহ, অসহায় পথিক ক্ষুণাক্ষরেও কিছু টের পেতো না। শেষে তার এই কর্মপদ্ধতি এত সাবলীল হয়ে ওঠে যে, কোনো কুমারী মেয়ের কোমরে শাড়িতে গোঁজা রুমালও যদি বলহরি জিভ দিয়ে তুলে নিতো মেয়েটি বুঝতেই পারতো না।

অনেকদিন বলহরিকে দেখি নি। মাসখানেক আগে কালীঘাটের পুরনো পাড়ায় গিয়ে তার খোঁজ করেছিলাম। একালে তাকে বিশেষ কেউ চেনে না। এক প্রাচীন ভদ্রলোক বললেন যে কলিযুগের প্রারম্ভে যখন কালীঘাট পার্কের পাশে প্রথম মেট্রোরেলের টিনের চালা উঠলো তখন একদিন রাতে বৃদ্ধ বলহরি উন্মত্তের ন্যায় নিষ্ফল আক্রোশে প্রচণ্ড গুঁতিয়ে কয়েকটি

টিনের চালা ধরাশায়ী করে উত্তরের দিকে চলে যায়; সে কাশী কিংবা বৃন্দাবন চলে গেছে।

আমি বুঝতে পারছি যে এই ইস্কুলের কাউ কিংবা কালীঘাটের বলহরিকে নাকি পাঠক-পাঠিকারা বিশেষ বিশ্বাসযোগ্য মনে করছেন না।

তার চেয়ে ছুটো নির্ভরশীল বিলিতি গরুর গল্প বলি। লস এঞ্জেলসের কাছে একটা খামারে দেখেছিলাম এক বৃদ্ধ কৃষক তাঁর বাছুরের সঙ্গে দাবা খেলছেন। আমি বিস্মিত হয়ে বলেছিলাম, 'আপনার বাছুর তো খুব চালাক, দাবা খেলতে পারছে!' বুড়ো হেসে বলেছিলেন, 'তেমন চালাক কিছু নয়, তেমন খেলতে পারছে না, এই তো পাঁচবারের মধ্যে তিনবারই হেরেছে।'

আরেকবার বার্সেলোনাতে এক মেমসাহেব আমাকে এক স্পেনীয় গরুর গল্প শুনিয়েছিলেন। গল্পের গরু আমাদের দেশে ছুয়েকবার গাছে ওঠে, কিন্তু সেই নীলনয়নার বুলফাইটের দেশের গরু রেস্তোরায় বিয়ার খেতে ঢুকেছিলো। গরুটি মানুষের মতো চেয়ারে ভব্য হয়ে বসে এবং বেয়ারাকে ডেকে বিয়ারের অর্ডার দেয়। যথা সময়ে পান শেষ করে বিল মিটিয়ে দেয়। যখন সে বেরিয়ে যাচ্ছে তখন রেস্তোরাঁর ম্যানেজার সাহেব তাকে সাহস করে বলেন, 'দেখুন, আজ চল্লিশ বছর এই জায়গায় কাজ করছি কিন্তু কোনো গরুকে বিয়ার খেতে আসতে দেখি নি।' গরুটি তিক্ত হেসে বলেছিলো, 'আগে যেমন দেখেন নি, পরেও আর দেখবেন না। গরুদের সাধ্য কি বিয়ার খায়, বিয়ারের যা দাম!'

ভ্রমণকাহিনী

বিশাল বিমানের একপ্রান্তে জানলার পাশে কম্পিত হৃদয়ে বসে-ছিলাম। সেই আমার সামান্য জীবনের আদি এবং অকৃত্রিম বিদেশ ভ্রমণ। একটু আগে বিমানের সিঁড়ি সরিয়ে নেওয়া হয়েছে, ভেতরে ঢোকার দরজা

বন্ধ করা হয়েছে, কোমর-বন্ধনী শক্ত করে আটকানোর জন্যে আলোক-সঙ্কেত জ্বলে উঠেছে। জানলার কাচের সোজাসুজি দেখলাম বিমানের সামনের পাখা তীরবেগে ঘুরছে, এই পাখাকেই বোধহয় প্রপেলার বলে। সে যাই হোক, মুহূর্তের মধ্যে বিমান গতি পেলো এবং সেই মুহূর্তে জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখি নিচের মানুষগুলোকে ছোট ছোট কালো পিঁপড়ের মতো দেখাচ্ছে। সত্যি কি আশ্চর্য, কি তাড়াতাড়ি উড়োজাহাজ কত উঁচুতে উঠে গেছে! বিজ্ঞানের কি আশ্চর্য লীলা!

আমার পাশে যে ভদ্রমহিলা বসেছিলেন, তিনি আমার মতোই এই প্রথম বিদেশ যাচ্ছেন। কিছুকাল আগে তাঁর স্বামী নিউইয়র্কে গেছেন, এবার তিনি স্বামীর সঙ্গে যুক্ত হতে যাচ্ছেন। আমার সঙ্গে একই বিমানে আজ সকালে কলকাতা থেকে দিল্লী এসেছেন, এখন আবার একই বিমানে আমরা বিদেশমুখী। সামান্য আলাপ হয়েছে মহিলার সঙ্গে। ক্ষণিকের মধ্যে

বিমানের ঊর্ধ্বারোহণে মানুষগুলি পিঁপড়ের মতো দেখতে হয়ে যাওয়ায় আমি আমার উত্তেজনা দমন করতে পারি নি, আমি মহিলাকে জানলার কাচের বাইরে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললাম, 'দেখুন, দেখুন, এক মিনিটের মধ্যে প্লেনটা কত উঁচুতে উঠে গেছে, মানুষজন সব পিঁপড়ের মতো দেখাচ্ছে।' কৌতূহলী হয়ে ভদ্রমহিলা উঠে দাঁড়িয়ে আমার মাথার উপর দিয়ে জানলার বাইরে উঁকি দিয়ে দেখে খিলখিল করে হেসে ফেললেন, 'প্লেন এখনো ছাড়েই নি, উপরে উঠবে কি করে ? আপনি যেগুলিকে মানুষ ভাবছেন, ছোট হয়ে পিঁপড়ের মতো হয়ে গেছে ভাবছেন, সেগুলো সত্যিই পিঁপড়ে, সত্যিকারের আসল খাঁটি পিঁপড়ে। প্লেনের জানলায় ঘুরছে, ওগুলো মানুষ নয়।'

তদবধি আমার ভ্রমণ-ভ্রমের শুরু, তদবধি আমার ভ্রমাবলী আমার মসৃণ যাত্রাকে ক্রমাগত কণ্টকিত করেছে।

অবশ্য সমস্তই ভ্রম বলে চালানো যাবে তা বোধহয় নয়। অনেকখানিই আমার মূর্খতা ও অজ্ঞানতা।

কিন্তু আমিই বা জানবো কি করে ?

আমি যে সময়টা মার্কিন দেশে ছিলাম, সেটা সাংঘাতিক শীত ঋতু। বাংলা কাগজে যেমন গরম বা বর্ষা বা বন্যা বা খরা নিয়ে সদাসর্বদাই বলে যে নিদারুণ ব্যাপার, এরকম আর ইতিপূর্বে কখনোই হয় নি, তেমনিই সে বছর সমস্ত মার্কিনী দৈনিকগুলো বলে যাচ্ছিলো, এটাই হচ্ছে শতাব্দীর শীতলতম শীত ঋতু।

সে যাই হোক, আমি আয়োজনের ত্রুটি করি নি। দক্ষিণ কলকাতায় আমার পরিচিত সমস্ত বাড়ি থেকে আমার গায়ের কাছাকাছি মাপের যত সোয়েটার, কোট, ওভারকোট, গরম টুপি, পশমের মোজা সব সংগ্রহ করে নিয়েছিলাম। গলা-উঁচু ফুলহাতা তুলোর গেঞ্জি, তার উপরে সার্জের ফুলশার্ট, তার ওপরে হাতকাটা সোয়েটার, হাতকাটার উপরে ফুলহাতা সোয়েটার, তারপর গলাবন্ধ কোট, তারপর গলায় মাফলার, মাথায় টুপি, সর্বোপরি আমার থেকে তিন সাইজ বড় একটি ওভারকোট—এই ছিলো

আমার উত্তমাঙ্গের পোশাক; নিম্নাঙ্গের সাজসরঞ্জামও কম ছিলো না। এছাড়া ছিলো হাতে গরম দস্তানা, পায়ে গরম ফুল মোজা। জামাকাপড় পরে ওজনের যন্ত্রে ওজন নিয়ে দেখেছিলাম, আমার স্বাভাবিক ওজনের চেয়ে ওজন তিরিশ কেজি বেড়ে যাচ্ছে। ওয়াশিংটন-নিউইয়র্কে মাঝে-মাঝে ভিড়ের মধ্যে টের পেয়েছি সাহেবরা আমাকে গোপনে টিপে টিপে দেখছে, বুঝতে চাইছে আমি প্রকৃতই কি রকম, আমার সারমর্ম কি!

দুঃখের বিষয়, এতো সাজসরঞ্জাম সত্ত্বেও আমার সঙ্গে মাফলার ছিলো মাত্র একটি। একদিন বিকেলে হোটেলে ফেরার পথে ঝোড়ো হাওয়া, ঝিরঝিরে বৃষ্টি আর উড়ন্ত শিমুল তুলোর মতো বরফের আঁশে আমার মাফলারটি জবজবে ভিজে গেলো। পশমের জিনিস একবার ভিজে গেলে সহজে শুকোতে চায় না; পরদিন সকালে বেরোনোর সময় দেখলাম আমার মাফলার তখনো রীতিমত ভেজা রয়েছে, গলায় জড়িয়ে বেরোলে নির্ঘাৎ নিমুনিয়া হবে। যে রাস্তায় ছিলাম সেই গলির মোড়েই একটা বড়সড় জামাকাপড় এবং আরো নানা জিনিসের দোকান। কাচের শো-কেসে দেখলাম, বহু দ্রব্যের মধ্যে দু-চারটি চমৎকার মাফলারও রয়েছে। দোকানে ঢুকে একটা মাফলার চাইলাম।

সুন্দরী বিক্রয়-বালিকা দু'বার স্মিত হেসে আমার ক্ষমা ভিক্ষা করে জানতে চাইলো আমি কি চাইছি, আমি আবার বললাম, 'মাফলার।' স্বাভাবিক সৌজন্যবশতই হোক আর বিদেশী বলেই হোক, মেমসাহেব দোকানের বাইরে সিঁড়িতে বেরিয়ে এসে দূরে অঙ্গুলি নির্দেশ করে আমাকে দেখিয়ে বলে দিলেন, এই ব্লকের অন্যপ্রান্তের দোকানে মাফলার পাওয়া যাবে।

এই দোকানেই মাফলার রয়েছে অথচ আমাকে অন্য দোকানে পাঠাচ্ছে কেন বুঝতে পারলাম না। এমন হতে পারে এদের জিনিসটা তেমন ভালো নয়, একজন বিদেশীকে ঠকাতে চায় না তাই ওখানে পাঠাচ্ছে। আবার এমনও হতে পারে দুটো একই দোকান, জামাকাপড় ইত্যাদি ওখান থেকে বিক্রি হয়, আর সব এখানে।

কিঞ্চিৎ দ্বিধাগ্রস্তভাবে ও-প্রান্তের দোকানে গিয়ে পৌঁছলাম। ও মা! এ তো একটা মোটর পার্টসের দোকান, কাচের শো-কেসে গাড়ির যন্ত্রপাতি সাজানো রয়েছে। মাফলার এখানে কি করে পাবো?

তারপর ভাবলাম, এ দেশে ড্রাগ স্টোরে রেস্টুরেন্ট চলে, রেস্টুরেন্টে ডাকটিকিট বিক্রি করে, হয়তো গাড়ির যন্ত্রপাতির দোকানে গলার মাফলার পাওয়া যাবে। বিরাট মোটামতো লম্বা চওড়া এক দশাসই সাহেব দেড় ফুট একটা লোহার রেঞ্জ হাতে, আমি ভয়ে ভয়ে ঢুকতেই, তার বিরাট থাবা আমার কাঁধে চেপে দিয়ে একটা প্রচণ্ড ঝাঁকি সহকারে চেঁচিয়ে উঠলো, 'হ্যাল্লো।' কারো কণ্ঠস্বর যে আমার থেকে কর্কশ হতে পারে এই অভিজ্ঞতা আমার প্রথম হলো।

একটু হকচকিয়ে গিয়েছিলাম। চিরদিনের নামকরা কাপুরুষ আমি। সব রকম বিপজ্জনক স্থান ও অবস্থা থেকে সব সময় যথাসাধ্য দূরে থাকি। কোনো রকমে কাঁধটাকে সঙ্কুচিত করে সাহেবের সচল থাবার বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা করতেই থাবাটা আরো চেপে বসে গেলো এবং সঙ্গে সঙ্গে আবার অমায়িক গর্জন, 'হ্যাল্লো।' থাবার ঝাঁকির ধাক্কাটা কিঞ্চিৎ ধাতস্থ করে নিয়ে আমি অবশেষে আমার পক্ষে যতটা মিনমিন করে বলা সম্ভব সেইভাবে করুণ কণ্ঠে ঐতিহ্যময় টাঙ্গাইল ইংরিজিতে নিবেদন করলাম, আমি একটা মাফলার কিনতে এসেছি। তারপর ভয় এবং মনের দুঃখে বুদ্ধির খেই হারিয়ে ফেললাম, আমার অসুবিধের কথা বলতে লাগলাম। বললাম, ওয়াশিংটনের এই মারাত্মক বৃষ্টি-বরফে আমার মাফলার ভিজে গেছে এবং এই ঠাণ্ডায় ভিজে মাফলারে আমার খুব কষ্ট হচ্ছে।

একটা সামান্য মাফলার, তাও নিজের পয়সা দিয়ে নগদ কিনবো, তার জন্যে কেন যে আমি এত কাকুতি-মিনতি করতে গেলাম, কেন যে আমার এমন বুদ্ধিভ্রংশ হলো বলা কঠিন।

কিন্তু আমার ভাষার প্রসাদগুণেই হোক কিংবা করুণ কাহিনীর জন্যেই হোক, সাহেব যত শোনে তত ভ্রূকুঞ্চন করে, চোখ গোল গোল করে আর

অবাক হতে থাকে। সেই সঙ্গে মধ্যে মধ্যেই প্রশ্ন করতে থাকে, 'মাফলার? ইউ মিন মাফলার? ওয়েট মাফলার?' আমিও সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিই, 'ইয়েস স্যার, মাফলার স্যার, মাই মাফলার ওয়েট স্যার।'

এই রকম আশ্চর্য কথোপকথন কিছুক্ষণ চলার পরে ঐ দুর্দান্ত সাহেবের বোধহয় একটু মায়া হলো, তার বজ্র থাবা কিঞ্চিৎ শিথিল হলো। তারপর হঠাৎ সাহেব আমাকে জিজ্ঞাসা করলো, 'তোমার গাড়ি কোথায়?'

কেন যে সাহেব এই প্রশ্ন করলো আমি বুঝতে পারলাম না। আমি আরো বিনীত ভাবে জানালাম, 'আমার কোনো গাড়ি নেই। সাহেব, আমি গরিব বিদেশী, এখানে কেন, দেশেও আমার কোনো গাড়ি নেই।'

আমার কথা শুনে সাহেব ভীষণ রকম ঘাবড়িয়ে গেলো, 'ইউ ডোণ্ট হ্যাভ এ কার? তোমার গাড়ি নেই? অথচ মাফলার চাইছো? মাফলার দিয়ে কি করবে?'

এখনো কিছু বুঝতে না পেরে আমি বললাম, 'সাহেব, মাফলার আমার গলার জন্যে চাইছি। আমার একটাই মাফলার, সেটা ভিজে গেছে।'

সাহেব এবারে সশব্দে হোহো করে হেসে উঠলো, তারপর দোকানের ভিতরে যত লোক ছিলো সবাইকে আমার চারপাশে ডেকে আনলো, 'হিয়ার ইস এ ফানি গাই, এ লোকটার গাড়ি নেই কিন্তু মাফলার চাই।' বলে পরমানন্দে আমার কাঁধ ধরে ঝাঁকাতে লাগলো।

এই ঘটনার কার্যকারণ সেদিন বুঝতে পারি নি। পরে জেনেছি, আমেরিকানরা মাফলার অর্থে বোঝে গাড়ির সাইলেন্সার। আমার গাড়ি নেই অথচ সাইলেন্সার চাইছি, এরকম অসম্ভব কথা তারা কখনো শোনে নি। সাহেবদের অট্টহাসি পিছনে রেখে আমি বেকুবের মতো সেই মোটর-পার্টসের দোকান থেকে সেদিন বেরিয়ে এলাম।

প্রসূতি সদন

শ্রীমান কখগ আজ সকালেই পিতৃত্বের গৌরবান্বিত পদে উন্নীত হয়েছেন। তাঁর স্ত্রী শ্রীমতী অআ কলকাতার একটি নার্সিং হোমে একটি সুস্থ সাড়ে আট পাউণ্ড বলবান পুত্র-সন্তানের জন্ম দিয়েছেন। প্রসূতি ও নবজাতক দুজনেই চমৎকার। কোনো গোলমাল নেই। আত্মীয়-স্বজন, পাড়াপ্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধবী বিকেল থেকে ভিড় করে শ্রীমতী অআকে এবং সদ্যোজত শিশুপুত্রটিকে দেখতে এসেছে। রীতিমত আনন্দ-উৎসব। একটু আগে সাতটা বাজতে নার্সিং হোমের বিদায় ঘণ্টা বেজেছে। কিছুটা বিলম্বিত লয়ে হলেও সবাই ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেছে। প্রত্যেককে শ্রীমান কখগ মোড় পর্যন্ত এগিয়ে দিয়েছেন। শেষ দলটিকে ট্রামে তুলে দিয়ে

সন্তর্পণে শ্রীমান কখগ নার্সিং হোমে ফিরে এসেছেন। তারপর সদর দরজায় দারোয়ানকে দুটি টাকা বকশিশ দিয়ে দোতলায় শ্রীমতী অআ-র কেবিনে চলে এসেছেন। তারপর আবার দু'টাকা খরচ। রাতের আয়াকে বকশিশ দিয়ে অনুরোধ করলেন বাচ্চাকে একটু নিয়ে আসতে।

বাচ্চাটি এলো। শ্রীমতী অআ একটু কষ্ট করে খাটে হেলান দিয়ে বাচ্চাটিকে কোলে নিয়ে বসলেন। শার্টের পকেট থেকে বাজারের ফর্দের মতো একটা লম্বা তালিকা বার করলেন শ্রীমান কখগ। এর পরে আরম্ভ হলো তালিকা মেলানো। একটি মনুষ্য-শিশুর শরীরের সমস্ত বিবরণ রয়েছে সেই তালিকায়। শ্রীমান একটি করে আইটেম বলেন আর শ্রীমতী সেটা মেলান, সঙ্গে সঙ্গে টিক পড়ে ফর্দে। মাথা এক, কান দুই, নাক এক, নাকের ফুটো দুই, চোখ দুই, মুখ এক, জিব এক। এইভাবে নামতে নামতে বাঁ হাত এক, বাঁ হাতে আঙুল পাঁচ, ডান হাত এক, ডান হাতে আঙুল পাঁচ। সর্বশেষে গোড়ালি দুই, চৌষট্টি দফায় এই ফর্দে আগাগোড়া যখন টিক পড়লো, শ্রীমান কখগ-শ্রীমতী অআ নিশ্চিন্ত হলেন, 'না, সবই ঠিকঠাক মিলেছে। তাঁদের সন্তান পুরোপুরিই জন্মেছে। কোনো খুঁতখুঁত নেই।' একটা পাষাণভার নেমে গেল দুজনারই বুক থেকে।

এই দুশ্চিন্তা কিন্তু কখগ-অআ দম্পতির নিজস্ব নয়। প্রতিটি দম্পতিরই অন্তত প্রথম সন্তানের বেলায় ভাবনা থাকে কেমন হবে, সব ঠিকঠাক হবে কিনা। তবে এ ব্যাপারে অধিকাংশ ক্ষেত্রে নতুন বাবা নতুন মায়ের চেয়ে অনেক বেশি মাথা ঘামান। এবং সেই মাথা ঘামানো শুধু সন্তানকে নিয়ে নয়, সন্তানের মাকে নিয়েও।

ডাক্তার এবং হাসপাতালের কাছে সন্তানসম্ভবা মাতার চেয়ে সন্তান-সম্ভব পিতা অনেক বেশি বিপজ্জনক। আজ থেকে প্রায় আঠারো বছর আগে আমার ছেলে জন্মানোর সময় চিত্তরঞ্জন সেবাসদনের ভারপ্রাপ্ত ডাক্তার আমাকে তাঁর চেম্বারে তালা দিয়ে আটকিয়ে রাখার চেষ্টা করেছিলেন। সদ্যোজাত অথবা সদ্যসম্ভব সন্তানের বাবা অত্যন্ত বিরক্তকারী প্রাণী। বহু সময়ে দেখা যায় যে-মহিলাটি সন্তান ধারণ করেছেন, তিনি

মোটামুটি নির্বিকার ; দাঁত চিপে, মুখ বন্ধ করে প্রাচীন যন্ত্রণা সহ্য করছেন। কিন্তু ভাবী পিতা অস্থির হয়ে দৌড়োদৌড়ি করছেন। একবার ডাক্তারকে, একবার নার্সকে, এমন কি অচেনা লোককে অস্থির করে দিচ্ছেন তাঁর কাল্পনিক এবং উদ্ভট সমস্ত জিজ্ঞাসা ও দুর্ভাবনা নিয়ে। ধাত্রীবিদ্যার এক বিখ্যাত মহিলা ডাক্তার আমাকে পরোক্ষে একদা বলেছিলেন যে প্রত্যেক প্রসূতি সদনের একতলায় একটি হাজত-ঘর করা উচিত, যেখানে ভাবী বাবাদের তাঁদের সন্তান না জন্মানো পর্যন্ত আটকিয়ে রাখা সম্ভব হবে। তিনি অনুযোগ করেছিলেন, 'বৌয়ের স্ট্রেচারের বা ট্রলির পিছু-পিছু এরা লেবার রুমে পর্যন্ত ঢুকে যায়।'

এ সব সমস্যা সন্তান জন্মানোর সময়কার। তার আগের সমস্যাগুলিও কিছু কম নয়। ওষুধ-পথ্য, আচার-কাসুন্দি, ভালো ডাক্তার, নির্ভরযোগ্য নার্সিং হোম—এ সব সমস্যা তো আছেই ; তার পরেও আছে সেই পুরানো প্রশ্ন, ছেলে না মেয়ে ?

মাঝে-মধ্যেই ফ্রান্স কিংবা কানাডা থেকে ডাক্তারি সংবাদ আসে পেটের বাচ্চা ছেলে না মেয়ে জানার খুব সহজ পন্থা আবিষ্কার হয়ে গেছে। রয়টারের পাঠানো তিন সেন্টিমিটার খবর। কিন্তু খবরটা নির্ভরযোগ্য নয়, কারণ খবরটা পুরনো অথবা বলা চলে পৌনঃপুনিক—'আর চিন্তা নাই' গোছের। ক্যানসারের ওষুধ আবিষ্কার হওয়ার মতো, একটা নিয়মিত ব্যবধানে ও রকম সংবাদ পাঠানো একটা রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তার চেয়ে খনার বচন ভালো। ফুলের নাম, মায়ের নাম, বাবার নাম সব গুণ কিংবা যোগ কিংবা বিয়োগ করে সোজাসুজি তিন দিয়ে ভাগ। ভাগফল দুই হলে ছেলে, এক হলে মেয়ে, আর শূন্য হলে সর্বনাশ।

এই সর্বনাশের কথায় মনে পড়ে যাচ্ছে সেই গোলমেলে গল্পটি। কফি হাউসে বসে কয়েকজন ভদ্রলোক গল্প করছিলেন। গল্পের বিষয়বস্তু অতীব গুরুত্বপূর্ণ ও গুরুগম্ভীর, পণ্ডিতি ভাষায় বলা যায়, 'ভাবী জাতকের উপরে মাতার মানসিক ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাব।'

একজন একটা আশ্চর্য ঘটনা বললেন। তাঁর শ্যালী পেটে বাচ্চা

আসার পর 'শ্যামদেশের যমজ' নামে একটা বই পড়ে খুব চমৎকৃত হয়েছিলেন এবং কি আশ্চর্য, পরশুদিন তার নিজেরই যমজ ছেলে হয়েছে।'

দ্বিতীয় ভদ্রলোক প্রায় একই রকম কিন্তু অধিকতর বিস্ময়জনক কাহিনী শোনালেন। তাঁর এক প্রতিবেশিনী গর্ভবতী জীবনে 'The Strange Stories of Triplets' অর্থাৎ একসঙ্গে তিনটি বাচ্চা জন্মানোর বিচিত্র গল্পমালা নামে একটি ইংরেজি বই পাঠ করেছিলেন, পরিণামে অবশেষে তাঁর তিনটি বাচ্চা জন্মেছে।

টেবিলের অপর প্রান্তে এক নিরীহ ভদ্রলোক এতক্ষণ উৎকণ্ঠার সঙ্গে এই সব কাহিনী শুনছিলেন। এই গল্পটি শোনার পরে তিনি উত্তেজিত হয়ে উঠে দাঁড়ালেন। বন্ধুরা বললেন, 'কি হলো, এতো তাড়াতাড়ি উঠলে কেন? রাত তো তেমন কিছু হয় নি। একটু বসে যাও।' ভদ্রলোক বললেন, 'না ভাই, আমার সর্বনাশ হয়েছে!' সবাই জানতে চাইলেন, 'কেন, কি সর্বনাশ হলো?'

ভদ্রলোক করুণ কণ্ঠে বললেন, 'ভাই, আমার বৌয়ের তো বাচ্চা হবে। সন্ধ্যাবেলা বাড়ি থেকে বেরোনোর সময় দেখলাম সে বসে বসে 'আলিবাবা ও চল্লিশ চোর' পড়ছে। দুই-তিন তবু ভাবা যায়, কিন্তু চল্লিশ চোর? আমার কি হবে?' এই বলে সেই নিরীহ বেচারী পাগলের মতো বাড়ির দিকে ছুটতে লাগলেন। হতভম্ব বন্ধুরা স্তব্ধ হয়ে তাঁর প্রস্থানপথের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

সাহেবরা সন্তান জন্মানোর পরে চুরুট বিলি করেন। চুরুটের মোড়কে লেখা থাকে—ইটস্ এ বয়, ইটস্ এ গার্ল। আমাদের বাল্যকালে মফস্বল শহরে দেখেছি শাঁখ বাজাতে। আমরা কতবার শাঁখ বাজানো হলো গুণতাম। বোধ হয় জোড় সংখ্যা বাজলে ছেলে আর বিজোড় সংখ্যায় মেয়ে, উল্টোটাও হতে পারে। কোন দিক থেকে কোন বাড়ির শাঁখের আওয়াজ আসছে শুনে প্রবীণা গৃহিণীরা বুঝে ফেলতেন, 'আহা, বিপিনের আবার মেয়ে হলো।'

অতঃপর, অশৌচ, আটকড়াই, ছয় ষষ্ঠী ইত্যাদি নানা সংস্কার। ধোপা-

নাপিতের কিঞ্চিৎ আয়। সম্ভবমত প্রতিবেশীদের মিষ্টান্ন লাভ।

এ সব পুরনো দিনের কথা। আজকাল শহুরে নার্সিং হোমে দারোয়ান, বেয়ারা, আয়াকে কিছু বকশিশ দিয়েই মিটে যায়। এক সরকারি হাসপাতালে দেখেছিলাম, এক ভদ্রলোক প্রসূতি ও প্রসূতকে নিয়ে বেরোতে গিয়ে হয়রান হয়ে পড়েছেন। সবাই বকশিশ চাইছে। অবশেষে ভদ্রলোক হাত জোড় করে সবাইকে বললেন, 'ভাইসব, এবার আর নয়। বৌদিকে দেখে রাখুন। উনি এখানে বছর বছর আসবেন, আমিও আপনাদের বছর বছর বকশিশ দেবো।'

পুনশ্চ: একটু অপ্রাসঙ্গিক, তবু একটা উড়ো ঘটনার উল্লেখ করছি। একবার এক প্রসূতি সদনের ডাক্তারবাবুকে কথাচ্ছলে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'ডাক্তারি বিদ্যার এত শাখা থাকতে আপনি কেন এই সন্তান জন্মানোর নারী-ঘটিত ব্যাপারে এলেন, টাকার জন্যে?' ভদ্রলোক বলেছিলেন, 'না, ঠিক তা নয়। দেখুন, ক্যানসারের রোগী দেখলে ভয় হতো আমারো বুঝি ও রকম হয়েছে, টিবির রোগী কাশতো, আমিও কাশতাম। যেখানে যে রোগীর যে রোগ দেখতাম মনে হতো আমারো সে রোগ আছে। সব লক্ষণ মিলে যেতো। অবশেষে এই মাতৃসদনে এসে নিশ্চিত হয়েছি—এই রোগ অন্তত আমার হবে না।

একটা পুরনো গল্প দিয়ে শুরু করছি।

এক ভদ্রমহিলা তাঁর স্বামীর জন্মদিনে উপহার কেনার জন্যে দোকানে গেছেন। গল্পটা বিলিতি, দোকানটিও সেইরকম বিলিতি, বড় দোকান, ডিপার্টমেন্টাল স্টোরস। হরেক রকম জিনিস পাওয়া যায় সেই দোকানে।

অনেক রকম পুরুষালি জিনিসপত্র ভদ্রমহিলা ঘুরে ঘুরে দেখলেন। গলার টাই, টাইপিন, অডিকলোন, সেভিং লোশন, হাতের বোতাম—

কিছুই তাঁর পছন্দ হয়ে ওঠে না। দোকানের বৃদ্ধ ম্যানেজারের নজরে পড়লো, ভদ্রমহিলা কাউন্টারে কাউন্টারে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, কি যেন চাইছেন, খোঁজ করছেন কিন্তু কিছুতেই পাচ্ছেন না। ম্যানেজার সাহেব ভদ্রমহিলার কাছে এগিয়ে গেলেন, গিয়ে বললেন, 'ম্যাডাম, আপনি কি চাইছেন আমাকে বলুন, আমি খুঁজে দিচ্ছি আপনাকে।'

ভদ্রমহিলা কিঞ্চিৎ সঙ্কোচের সঙ্গে তাঁর পতিদেবতার জন্মদিনের জন্যে একটা চমৎকার উপহারের বিষয়ে ম্যানেজারের পরামর্শ চাইলেন। ম্যানেজার ভদ্রলোক বললেন, 'এ আর কি সমস্যা ? কত জিনিস রয়েছে।' ভদ্রমহিলাকে প্রথমে দেখালেন খুব সুন্দর একটা নরম, লাল চামড়ার হাতব্যাগ। মহিলা কিন্তু দেখেই মাথা নাড়লেন, 'এটা চলবে না, আমার বরের ঠিক এইরকম একটা ব্যাগ আছে।' অতঃপর ম্যানেজার একটা হাড়ের হাতল দেওয়া ওয়াকিং স্টিক দেখিয়ে বললেন, 'দেখুন, আপনার কর্তার এটা

ঠিক পছন্দ হবে।' ভদ্রমহিলা কিন্তু আবারও ঘাড় নাড়লেন, 'আমার কর্তার কিন্তু ঠিক এই রকমই একটা স্টিক আছে। ঐ রকমই সাদা হ্যাণ্ডেল লাগানো।' এরপর ধীরে ধীরে সেই ধৈর্যশীল ম্যানেজার রূপোর সিগারেট কেস, হরিণের চামড়ার চপ্পল, এমনকি পাথরের নস্যদানি, রঙীন দস্তানা, অনেক কিছুই ভদ্রমহিলাকে প্রদর্শন করালেন। কিন্তু মহিলার মুখে সেই এক বাক্য, 'না, ঠিক এই রকম সিগারেট কেস আমিই ওকে একটা গতবার দিয়েছি। ঐ রকম চপ্পল, দস্তানা সবই ওর আছে। যদিও ও নস্যি নেয় না, কিন্তু ঠিক ওই রকম একটা কালো পাথরের নস্যদানিও ওর আছে, তার মধ্যে ও ওষুধের ট্যাবলেট রাখে।'

অগত্যা ম্যানেজার সাহেব শেষ এবং চূড়ান্ত পরামর্শ দিলেন মহিলাকে, 'তাহলে আমাদের বুক কাউন্টার থেকে বেছে আপনি একটা বই নিয়ে যান আপনার স্বামীর জন্মদিনের উপহারের জন্যে।' কিন্তু ভদ্রমহিলা এবারেও অম্লানবদনে বললেন, 'না, বই চলবে না, বইও আমার বরের একটা আছে।'

এই কাহিনীটি, বিশেষ করে ভদ্রমহিলার শেষ উক্তিটি কারো কারো কাছে চমকপ্রদ না মনে হতেও পারে। তাঁদের জন্যে আমার সিন্দুকে এই গল্পটির একটু রকমফের আছে।

ঘটনাস্থল, কাহিনী, পাত্র-পাত্রী, পরিবেশ, সময় সবই একরকম। সেই ডিপার্টমেন্টাল স্টোরস, সেই ম্যানেজার, সেই মহিলা গ্রাহিকা। শুধু প্রেক্ষাপটের পরিবর্তন হয়েছে যৎসামান্য। এবার আর ভদ্রমহিলার স্বামীর জন্মদিন নয়, ভদ্রমহিলার নিজের জন্মদিন। এবং আরো বিস্ময়ের ব্যাপার, ভদ্রমহিলা নিজের জন্যে একটি বই কিনতে এসেছেন।

দোকানের ম্যানেজার সাহেব কিন্তু ভদ্রমহিলাকে ভোলেন নি। আগের বারের কথা তাঁর স্পষ্ট মনে আছে। সুতরাং মহিলা যখন বললেন তিনি একটি গ্রন্থ খরিদ করতে এসেছেন, ম্যানেজারের চোখ কপালে উঠলো, 'বই, বলেন কি বই কিনবেন? আপনাদের একটা বই তো আছে!'

ভদ্রমহিলা বললেন, 'কিন্তু সে বইটা আমার স্বামীর।' তারপর লজ্জায় একটু রাঙা হয়ে ভদ্রমহিলা ম্যানেজার সাহেবকে বললেন, 'জানেন, হয়েছে

কি, আজ আমার জন্মদিন! আমার বর আমাকে একটা রিডিং ল্যাম্প, ঐ যে বিছানার সঙ্গে বালিশের ওপাশে ঝালর দেওয়া নতুন ধরনের ল্যাম্প স্ট্যাণ্ড বেরিয়েছে, তাই একটা উপহার দিয়েছে। আমার তো নিজের বই নেই, ঐ রিডিং ল্যাম্পে পড়ার জন্মে একটা বই কিনতে এসেছি।'

এই কাহিনীমালা এব পরে হয়তো আরো দীর্ঘ করা সম্ভব। কিন্তু এই মুহূর্তে আমার নিজের জীবনের একটা দুঃখজনক ঘটনা মনে পড়ছে বই পড়া সম্পর্কে।

বছর দেড়েক আগে আমি বাড়ি পালটেছিলাম। যেমন হয়, ভাঙা চেয়ার, টেবিল, খাট, তোরঙ্গ ইত্যাদির সঙ্গে ছিলো খারাপ-ভালো, নতুন-পুরনো, ছেঁড়া-আস্ত অনেক বই। কিছু যথারীতি উপহার পাওয়া, কিছু চুরি করা, সামান্য কিছু কেনা এবং আরো অজস্র বই কি সূত্রে এখন আমার কাছে, সেটা বলা অসম্ভব; কারণ প্রত্যেকটির ইতিহাস আলাদা।

সে যা হোক, মালপত্র ট্রাকে তোলা হলো, সেই সঙ্গে বই। বই তোলা খুব কঠিন কাজ। খুব সময় লাগে। এক সঙ্গে দশ-বিশটা করে হাতে হাতে যত্ন করে তুলতে হয়। কাজটা রীতিমত ধীরে ধীরে এগোচ্ছিলো। কিন্তু ট্রাক ড্রাইভার মহোদয় ধৈর্য হারিয়ে ফেললেন। কয়েকবার উত্তেজিত হয়ে হর্ন বাজানোর পর ড্রাইভার তাঁর খাসকামরা থেকে নেমে এলেন। তখনো খাট-আলমারির ফাঁকে ফাঁকে আমি বই গুঁজে দিচ্ছি এবং আমার স্ত্রী-পুত্র-ভাই এবং পরিচারকের হাতে হাতে রিলে হয়ে পুরনো বাড়ির দেড়তলা থেকে বইয়ের গাদা ট্রাকে এসে উঠছে। এই দৃশ্য দেখে ট্রাক চালক কেমন যেন বিহ্বল হয়ে গেলেন। তারপর আমাকে বললেন, 'এত বই, এগুলো আগে পড়ে ফেলতে পারেন নি!' ড্রাইভারের ধারণা এ বাড়িতে থাকতে থাকতেই বইগুলো আমার পড়ে ফেলা উচিত ছিলো, তাহলে কষ্ট করে নতুন বাড়িতে নিয়ে যেতে হতো না।

বইয়ের সম্পর্কে লিখতে গিয়ে একটা অতি পরিচিত গল্পকে অনেকক্ষণ ধরে পাশ কাটিয়ে যাচ্ছি। অন্তত ভদ্রতার খাতিরে গল্পটা উল্লেখ করা উচিত। গল্পটির নায়ক সম্পর্কে মতভেদ আছে। অনেকের কাছে শুনেছি বিখ্যাত

এক সাহেব বুদ্ধিজীবীর নাম, কেউ কেউ এক বাঙালী ভদ্রলোককেও উল্লেখ করেছেন। সে যা হোক, গল্পটি ছোটো। এক বাড়িতে গৃহস্বামীর অজস্র বই, মেজের উপর তাকে তাকে সাজানো, গাদায় গাদায় পড়ে রয়েছে। গৃহস্বামীর বন্ধু বললেন, 'এতো বই এ রকম অগোছাল করে মেজের উপর ফেলে রেখেছো। বইয়ের র‍্যাক করে তার মধ্যে বইগুলো সাজিয়ে রাখতে পারছো না?' গৃহস্বামী করুণকণ্ঠে জবাব দিয়েছিলেন, 'ভাই, বইগুলো যেভাবে সংগ্রহ করেছি, বইয়ের র‍্যাক সেভাবে সংগ্রহ করা যাচ্ছে না।' আসলে বইগুলি একটাও কেনা নয়, প্রাকৃতভাষায় বলা যেতে পারে মেরে দেওয়া, বন্ধুবান্ধবের কাছ থেকে ধার করে পড়তে নিয়ে এসে, ফেরত না দেওয়া। এভাবে তো আর বইয়ের র‍্যাক সংগ্রহ করা সম্ভব নয়।

বই যে শুধু পঠনপাঠন বা ঘরের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্যে লাগে তা নয়। বইয়ের ব্যবহার অজস্র রকম। বই মাথায় দিয়ে জীবনে একবার অন্তত ঘুমোয় নি, এমন শিক্ষিত লোক খুঁজে পাওয়া যাবে না, তেমনিই হয়তো খুঁজে পাওয়া যাবে না তেমন কোনো ভদ্রলোককে যিনি কখনো কাউকে বই ছুঁড়ে মারেন নি। আমাদের একটি পায়াভাঙা আলমারির অবলুপ্ত পায়াটির শূন্যস্থান পূর্ণ করে রয়েছে কয়েকটি শক্ত বোর্ড বাঁধাই কাব্যগ্রন্থ, যাতে কোনো একটি কবি দুঃখিত না হন, তাই এর মধ্যে আমার নিজেরও একটি বই রয়েছে। দুগ্ধপোষ্য শিশুদের খেলনার বিকল্প হিসেবে বই চমৎকার। অনেকগুলো বই একত্র করে সাজিয়ে ভালো করে চাদর ঢেকে দিলে বেশ বসবার বা শোবার জায়গা হয়ে যায়।

কিন্তু তবু যারা বই পড়ার তারা বই পড়ে যাবে। পাঠাগারে, রেল-গাড়িতে, অফিসে, শোয়ার ঘরে। কলেজের সিঁড়ি বেয়ে বই পড়তে পড়তে নামবে তরুণ পাঠক, হোঁচট খাবে। নবীনা গৃহিণী রান্নাঘরে মোড়ায় বসে বই পড়তে পড়তে ভাত পুড়িয়ে ফেলবে। খুব ভোরবেলা জানলার ধারে বসে অশীতিপর বৃদ্ধ ঝাপসাচোখে, মোটা কাচে একটা জীর্ণ গ্রন্থের মলিন পৃষ্ঠা সহস্রতম বার আবার পড়বে।

সে সব পড়ার কথা আলাদা। 'প্রিয় প্রসঙ্গ' নামে একটা চমৎকার

বইতে সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় মশায় লিখেছিলেন অন্য এক পড়ুয়ার কথা। বড়লোকের মাকাল ফল ছেলে, তাকে পাত্র দেখতে গেছে কন্যাপক্ষের লোকেরা। বাড়ির চারপাশে অনেক বই চমৎকার বাঁধানো এবং সাজানো। কন্যাপক্ষের লোক অনেক ইতস্তত করে জানতে চাইলেন, 'তা বাবাজীবনের লেখাপড়া কি রকম?' বাবাজীবন বিনীতভাবে জানালেন, 'বিদ্যাসাগর মশায়ের ওয়ার্কস্ দু-এক ভলিউম পড়া আছে।' মানে? মানে হলো বর্ণপরিচয়, প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ।

প্রেসার কুকার

আমি প্রথম প্রেসার কুকার দেখি উনিশশো আটান্ন সালের এক শীতের সন্ধ্যায় বনগাঁ লোকালে। লোকাল ট্রেনে তখন ভিড় ছিলো না। বিশেষ করে সেই শীতের সন্ধ্যাবেলায় কামরায় লোকজন খুবই কম ছিলো।

ভদ্রলোক আমার মুখোমুখি বসেছিলেন, তাঁর সঙ্গে ছিলো দড়ি দিয়ে বাঁধা পিচবোর্ডের বাক্স। ট্রেন ছাড়তে তিনি দড়ির বাঁধন খুলে ঢাকনা দেওয়া, কালো হাতলওলা পাত্রটি বার করলেন, তারপর বেঞ্চির একপ্রান্তে সেটা রেখে কিছু দূরের থেকে অভিভূতের মতো সেটার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

কিছুক্ষণ স্তব্ধ ও অভিভূত হয়ে থাকার পরে আমার কৌতূহলী দৃষ্টি তাঁর নজরে এলো, তিনি কিঞ্চিৎ গর্বের সঙ্গে বললেন, 'প্রেসার কুকার, ষাট টাকা দাম নিলো।'

তখন ষাট টাকা অনেক টাকা, আধ মণ সরষের তেলের সমান দাম। সামান্য একটা ঢাকনি দেওয়া পাত্রের এত দাম, আমি বিস্মিত হয়ে জিনিসটার দিকে তাকিয়ে রইলাম। প্রেসার কুকার কথাটা এর আগে আমি কয়েকবার এদিকে ওদিকে শুনেছি, খবরের কাগজে দু-একটা বিজ্ঞাপনও দেখেছি কিন্তু এই দ্রব্যটিই যে প্রেসার কুকার এবং এটা যে এত

দামী তা আমার ধারণা ছিলো না।

ভদ্রলোক মুগ্ধ হয়ে সদ্য ক্রীত ঝকঝকে জিনিসটি অনিমেষ নয়নে দেখছিলেন, হঠাৎ লাফিয়ে উঠলেন, 'বল, এর মাথার বলটা কি হলো?' তাঁর হাতে 'সচিত্র প্রেসার কুকার ব্যবহার প্রণালী' নামে লোভনীয় সমস্ত রঙিন খাবারের ছবি দেওয়া একটা ইংরিজি পুস্তিকা ছিলো। তাতে পাত্রটির মাথায় একটি গোল মতো ছোট টুপির নকশা রয়েছে, নিচে লেখা সেফটি ভালব্। তিনি সেইটির দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বেঞ্চির উপরে, বেঞ্চির নিচে, বেঞ্চির পিছনে পাগলের মতো খুঁজতে লাগলেন। তাঁর হাতের বইটির সঙ্গে মিলিয়ে দেখলাম সত্যিই বলটি এই পাত্রটিতে নেই, ছবির সঙ্গে মিলিয়ে প্রেসার কুকারটিকে কেমন যেন মুকুটহীন সম্রাটের মতো মনে হলো।

সে যা হোক, ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে নিজের জামা-কাপড় ঝেড়ে বলটি

খুঁজলেন। আমাকে এবং কামরায় আর যে অল্পবিস্তর দু-চারজন যাত্রী ছিলো তাদেরও জামাকাপড় ঝেড়ে দেখতে হলো বলটি কোথাও আছে কিনা। না, কোথাও নেই। ভদ্রলোক উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'তা হলে তিন নম্বর প্লাটফর্মে একবার খুলেছিলাম, সেখানেই পড়ে গেছে' ভদ্রলোক গোবরডাঙার যাত্রী, দশ স্টেশন আগে মধ্যমগ্রামে নেমে পড়লেন উল্টো ট্রেনে হারানো মুকুটটি উদ্ধার করতে যাওয়ার জন্মে।

এর অল্প কিছুদিন পরেই বরানগরে এক বাড়িতে আমি নিমন্ত্রণ পাই। আমার এক প্রায়-বিখ্যাত লেখক বন্ধুর তখন সদ্য বিয়ে হয়েছে। তাঁর স্ত্রী বিয়েতে একটি প্রেসার কুকার পেয়েছিলেন। সেই বাড়িতেই দুপুরের খাওয়ার নিমন্ত্রণ। আমি অবশ্য প্রেসার কুকারটি সেদিন স্বচক্ষে দেখতে পাই নি, তবে সেদিন খেতে বসে জেনেছিলাম, নুন এবং আলুভাজা ছাড়া, ভাত, ডাল, তরকারি, মাংস সেদিনের সমস্ত খাদ্যদ্রব্যই প্রেসার কুকারে নির্মিত।

আমাদের সেই ভোজনের আসরে বিলেত-ফেরত এক কুসংস্কারাচ্ছন্ন বন্ধু ছিলেন, তিনি বললেন, 'প্রেসার কুকারে রান্না খাবার খেলে গেঁটে বাত হয় এবং চোখের অসুখ হয়।' এই বক্তব্য যে সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক এবং প্রেসার কুকারে রান্না খাবার প্রকৃতই খাদ্যগুণে সমৃদ্ধ, এই বিষয়ে আমাদের বন্ধুপত্নী, তিনি আবার শিক্ষিকা, যথেষ্ট লড়াই করলেন। কিন্তু যুক্তিতর্ক কিছুই খাটলো না। আমাদের বন্ধুপত্নীকে ম্লান করে দিয়ে সেই বিলিতি বন্ধুটি শুধু দই-ভাত খেলেন।

এর পরে ক্রমে ক্রমে আমি নানা জায়গায় প্রেসার কুকারের কথা শুনতে পাই এবং কোথাও কোথাও হয়তো প্রেসার কুকারে রান্না খাবারও খাই। কিন্তু সজীব, কর্মরত অবস্থায় প্রথম প্রেসার কুকার দেখি অনেকদিন পরে উনিশশো বাষট্টি সালের শেষাশেষি আমাদের পুরনো কালীঘাট বাড়ির একতলায়।

আমাদের ভাড়াটে ভদ্রলোক প্রেসার কুকারটি কিনেছিলেন। তখন তাঁর সঙ্গে আমার সম্পর্ক ভালো যাচ্ছে না। তাঁর ঘরের সামনের বারান্দা

দিয়ে আমার বাড়ি থেকে বাইরে যাতায়াত করতে হতো। সেই বারান্দায় একটা কয়লার তোলা উনুনে প্রেসার কুকারটি বসিয়ে কি রান্না করছিলেন তাঁর স্ত্রী। সেই মহিলা তখন সেখানে ছিলেন না, কুকারটি উনুনে বসিয়ে ভিতরের ঘরে কি করছিলেন। কিন্তু আমি যেই কুকারটির সামনে দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছি, সহসা যন্ত্রটি তীক্ষ্ণ স্বরে হুঁ-উ-উ-স করে উঠলো, আমি চমকে: উঠে পিছিয়ে এলাম। এরপর কিছুক্ষণ চুপচাপ, আবার আমি যেই এগিয়েছি আবার হুঁ-উ-উ-স। এবার আরো জোরে। আমি ভীত হয়ে দোতলায় ফিরে গেলাম এবং বহুক্ষণ পরে উঁকি দিয়ে দেখে নিশ্চিত হয়ে যে প্রেসার কুকারটি উনুন থেকে নামানো হয়েছে, তারপর আমি অকুস্থল দিয়ে বেরোই।

অবশ্য এই প্রথম নয়। এই ঘটনার পর থেকে আমি লক্ষ করেছি, সব রকম প্রেসার কুকারের আমার উপর কি রকম একটা অস্বাভাবিক রাগ আছে। পরবর্তীকালে অন্যত্র এবং আমাদের নিজেদের বাড়ির রান্নাঘরেও আমি দেখেছি কোনো প্রেসার কুকারই আমাকে সহ্য করতে পারে না। স্ত্রী রান্না করছেন, হয়তো কোনো দরকারি প্রয়োজনে তাঁর সঙ্গে কথা বলতে গেছি, সঙ্গে সঙ্গে প্রেসার কুকার ফোঁস্ করে উঠেছে।

একবার এক ছোটো পিকনিকে প্রেসার কুকারে মাংস রান্না হচ্ছে। কাছে একটা মাদুরে বসে আছি। সামনে থালায় কয়েকটা মাছ-ভাজা। কাছাকাছি সেই মুহূর্তে কেউ নেই, যেই হাত বাড়িয়েছি একটা মাছ-ভাজা খেয়ে দেখবো বলে, সঙ্গে সঙ্গে প্রেসার কুকারটি হুস করে উঠলো। একটু থমকে গিয়ে আবার যেই হাত বাড়িয়েছি, আবার হুস।

এ সব সত্ত্বেও আমাদের গরীবের সংসারে নিজের উপার্জনে প্রথম যে সম্পত্তিটি আমি ক্রয় করি, সেটি ঐ প্রেসার কুকার। সেই প্রথম প্রেসার কুকারটি এখন আর নেই কিন্তু তার বহু স্মৃতি রয়ে গেছে। আমাদের পুরনো বাড়িব রান্নাঘরের ভিতরের দিকের ছাদে একটি নিখুঁত গোল ফিকে হলুদ রঙের বৃত্ত আছে, হঠাৎ দেখলে মনে হতে পারে সূক্ষ্ম মোজায়েকের কাজ। কিন্তু আসলে ওটা হলো আমাদের একদিনের দুপুরের ডাল।

কোনো অজ্ঞাত কারণে প্রেসার কুকারের ঢাকনাটি তীব্র চীৎকার করে ঊর্ধ্বগামী হয়, সমস্ত ডাল ভেতরের থেকে ফোয়ারার মতো উপচিয়ে উঠে ছাদে ঐ বৃত্তের রচনা করে। প্রেসার কুকারের ঢাকনাটির যাত্রা ছাদে ব্যাহত হয়ে জানলা দিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে এবং গ্রহান্তরের ইউ-এফ-ও-র মতো চরকি দিয়ে ওপাশের ফুটপাথে একটি তন্দ্রাচ্ছন্ন মোষকে মাথায় আঘাত করে কয়েক ঘণ্টার জন্যে অজ্ঞান করে দেয়।

কিন্তু আমাদের প্রেসার কুকারে সবচেয়ে বড় ব্যাপারটি ঘটেছিলো, কেনার পরে-পরেই। কুকারে রাতের মাংস রান্না হয়েছে। সুঘ্রাণে সমস্ত বাড়ি ভরে গেছে। আমরা সবাই খেতে বসেছি, শুধু ভাত আর মাংস খাওয়া হবে। পাতে ভাত দিয়ে আমার স্ত্রী মাংস দিতে যাবেন কিন্তু কিছুতেই প্রেসার কুকার আর খুলতে পারেন না। আমি, বিজন দু'জনে তাঁকে সাহায্য করতে গেলাম কিন্তু কি করে যে প্রেসার কুকারের ঢাকনার প্যাঁচ খোলা ? এমনভাবে আটকে গেছে কিছুতেই কিছু বোঝা যাচ্ছে না।

গলির মোড়ে পাড়া সম্পর্কে সর্বাণী পিসিমা থাকেন, তাঁকে গিয়ে আমার স্ত্রী ডেকে আনলেন। আমাদের এলাকায় সর্বাণী পিসিমা সর্বপ্রথম প্রেসার কুকার ব্যবহার আরম্ভ করেছিলেন, সুতরাং তাঁর কারিগরি কুশলতার উপর আমাদের আস্থা। কিন্তু প্রায় আধঘণ্টা ধ্বস্তাধ্বস্তির পর তিনিও ব্যর্থ হলেন। তবে বললেন যে তাঁর এক মামাতো ভাই থাকেন নাকতলায়, তিনি প্রেসার কুকার খোলায় এক্সপার্ট। তখন রাত দশটা বাজে, বিজন সঙ্গে সঙ্গে ট্যাক্সি করে নাকতলায় চলে গেলো। এগারোটা নাগাদ তাঁকে নিয়ে এসে পৌঁছালো। ভদ্রলোক শুয়ে পড়েছিলেন, কিন্তু এত বড় গুরুতর আহ্বান উপেক্ষা করতে পারলেন না। তিনি রান্নঘরে ঢুকে প্রেসার কুকারটার চারপাশে ঘুরতে লাগলেন, তারপর একটা নির্দিষ্ট বিন্দুতে চক্ষু নিবদ্ধ করে কুকারটা কোলে তুলে নিলেন। আমাকে বললেন হ্যাণ্ডেলটা ধরে ক্লকওয়াইজ ঘুরাতে এবং তিনি নিজে পাত্রটি ধরে অ্যান্টিক্লকওয়াইজ ঘোরাতে লাগলেন। কিন্তু নট নড়ন চড়ন নট ফট। তিনি ক্রমশ চাপ বৃদ্ধি করতে লাগলেন। আমিও তালে তালে জোড় বাড়ালাম।

এইরকম এক ঘনীভূত মুহূর্তে আমার হাত থেকে প্রেসার কুকারের হাতলটা ছিটকে বেরিয়ে গিয়ে তাঁর থুতনিতে লাগলো। তিনি অতর্কিতে আহত হয়ে কুকারটি ফেলে দিলেন, সেটা পড়লো তাঁরই পায়ের উপর।

এর পরের অংশ আর না বলাই ভালো। সেদিন রাতে আমরা নুন-তেল দিয়ে ভাত খেয়েছিলাম এবং সেও রাত দেড়টায়।

যা চলে তাই গাড়ি

আমাদের অল্প বয়েসে একটা খুব মজার গল্প ছিলো এক প্রাইভেট গাড়ির ড্রাইভারকে নিয়ে। গল্পটা খুবই পুরনো কিন্তু কাণ্ডজ্ঞানের একালের পাঠক-পাঠিকারা অনেকেই এসব গল্প জানেন না, যেমন তাঁদের কারো কারো চিঠি পেয়ে আবিষ্কার করেছি কাণ্ডজ্ঞানের লেখক নিজেই জানে না একালের অনেক কথামালা। কাণ্ডজ্ঞানের অনেক বিষয়ে কেউ কেউ আমাকে এমন সব গল্প চিঠি দিয়ে জানিয়েছেন যা লিখি নি বলে আমার আফসোস হয়েছে।

আফসোসের কথা থাক, জেনারেশন গ্যাপের সুযোগে প্রথমে পুরনো গল্পটা বলে নিই। এক ড্রাইভার তার দেশোয়ালি ভাইদের সঙ্গে এক ছুটির দিনে যাদুঘর দেখতে গেছে। যাদুঘরে হাজার রকম দেখার জিনিস, দেখতে দেখতে সে তার বন্ধুদের নিয়ে এসেছে ম্যমির ওখানে। ম্যমিটি যে একটা মৃতদেহ সেটা সে বুঝতে পেরেছে কিন্তু ম্যমিটি একটু দেখেই ম্যমির গায়ে কি একটা কথা পড়ে সে দৌড়ে যাদুঘর থেকে বেরিয়ে যায়। তারপর এক দৌড়ে সোজা নিজের আস্তানায়। দেশোয়ালি ভাইয়েরা পরে তাকে এসে ধরলো, 'তুমি ঐ রকম দৌড়ে পালিয়ে এলে কেন?' সে বললো, 'আরে সর্বনাশ, মরাটার গায়ে আমার গাড়ির নম্বর দেখলে না! ঐ লোকটাকেই তো পরশুদিন আমি চাপা দিয়ে মেরে ফেলেছি। গাড়ির নম্বর যখন পেয়েছে এবার পুলিস নিশ্চয় আমাকে ধরবে।' বলে লোকটি বাক্স-বিছানা
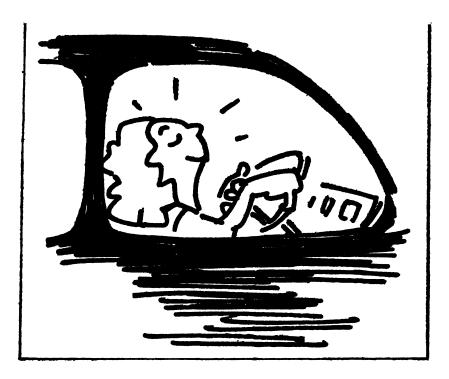
নিয়ে কোথায় পালালো কে জানে? ড্রাইভারটি যে গাড়ি চালাতো তার নম্বর ছিলো ডবলিউ বি সি ৫৪০ আর ম্যমিটির গায়ে লেখা ছিলো বি সি ৫৪০, মানে খ্রীষ্টপূর্ব ৫৪০ অব্দের। এটাই তার ভয় পাওয়ার কারণ।

(অত্যধিক কৌতূহলী পাঠকের কাছে বিনীত নিবেদন, এ নিয়ে বেশি খোঁজখবর করবেন না, গাড়ির নম্বর ও ম্যমির অব্দ অন্যও হতে পারে, তবে দুটোই এক ছিলো।)

এই মুহূর্তে যে দ্বিতীয় গল্পটি কলমের নিবের নিচে সুড়সুড় করে এসে লাইন দিয়েছে সেটাও গাড়ি চাপা নিয়ে। আমার এক বন্ধু খুব বেআইনি গাড়ি চালাতেন, একবার এক মোটর সাইকেল আরোহী সার্জেন্ট অনেক চেঁচামেচি করে তাড়া করে এসে তাঁকে ধরে ফেলেন, 'আমি যে এত চেঁচাচ্ছি পিছনে পিছনে, আপনি শুনতে পান নি?' সার্জেন্টসাহেব প্রথমেই উত্তেজিত হয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন। অস্বীকার করার উপায় ছিলো

না, বন্ধুবর ঢোঁক গিলে বললেন, 'হ্যাঁ শুনেছি।' সার্জেন্টসাহেব আরও ক্ষিপ্ত হলেন, 'তাহলে দাঁড়ালেন না কেন?' বন্ধুটি অকপটে বললেন, 'আমি ভেবেছি আমি বুঝি কাউকে চাপা দিয়েছি, সে-ই চেঁচাচ্ছে। চেঁচাতে চেঁচাতে পিছনে ছুটছে।'

তবে গাড়ি বিষয়ে সবচেয়ে মর্মান্তিক গল্পগুলি এই শহরেরই এক সওদাগরি অফিসের বড়সাহেবের লোকান্তরিতা বেগমসাহেবাকে নিয়ে। বলা বাহুল্য, তিনি লোকান্তরিতা হয়েছেন ঐ গাড়িরই কল্যাণে।

বেগমসাহেবাকে আমি জানতাম একাধিক সূত্রে। কতবার কত জায়গা থেকে, নিমন্ত্রণ-পার্টির শেষে ভদ্রমহিলা আমাকে লিফট দিতে চেয়েছেন, একবারই সে সুযোগ গ্রহণ করেছিলাম। ড্রাইভার ও স্বামীকে পিছনের সিটে বসিয়ে আমাকে পাশে নিয়ে ঈষৎ মত্ত বেগমসাহেবার প্রচণ্ড বৃষ্টির মধ্যে কি ভীষণ গতিতে গাড়ি চালনা! বেশি বৃষ্টি বলেই আমি বাধ্য হয়ে লিফট নিয়েছিলাম। কিন্তু যা হয়েছিলো তা অবর্ণনীয়। গাড়ির সামনের উইণ্ডস্ক্রিনের ওয়াইপার কাজ করছে না, বৃষ্টির স্রোতে পুরো কাচ ঝাপসা হয়ে গেছে, জগৎসংসারে কিছুই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। একটা মোড়ে গাড়িটা একটু দাঁড়াতে সন্ত্রস্ত হয়ে আমি বললাম, 'বেগমসাহেবা, গাড়িটা একটু দাঁড় করান, আমি রুমাল দিয়ে সামনেব কাচটা মুছে দিয়ে আসি।' বেগমসাহেবা আমার হাত ধরে বাধা দিয়ে বললেন, 'কেন মিছিমিছি বৃষ্টিতে ভিজতে যাচ্ছেন। সামনের কাচ মুছে কি লাভ হবে?' আমি অবাক হয়ে তাকাতে বেগমসাহেবা বললেন, 'আমার তো মাইনাস চার চশমা, পার্টিতে আসবো বলে সেটা চোখে দিয়ে আসি নি।'

আরেকবার, সে ঘটনার সঙ্গী অবশ্য আমি নই, অন্য এক বন্ধুর মুখে শুনেছি। একদা প্রভাতকালে আমার সেই বন্ধুটি বেগমসাহেবা এবং তাঁর স্বামীর সঙ্গে গ্রামাঞ্চলের দিকে যাচ্ছিলেন। যথারীতি বেগমসাহেবা গাড়ি চালাচ্ছিলেন। বিদ্যুৎগতিতে গাড়ি ছুটছে, সকালবেলার মফস্বল এলাকার ফাঁকা রাস্তা। কোনো গাড়ি-ঘোড়া নেই, লোকজনও নেই। গাড়ির উদ্দাম বেগ দেখে রাস্তার আশপাশ থেকে গরু, ছাগল, কুকুর ছুটে পাশের মাঠে

নেমে যাচ্ছে। পথের একপ্রান্তে ইলেকট্রিক পোলের উপর উঠে দুজন তার-চোর বিদ্যুতের তার কাটছিলো। বেগমসাহেবা তাদের দেখে ভাবলেন যে বোধ হয় তাঁর গাড়ি চালানোয় ভয় পেয়ে পোলের উপর উঠে বসেছে। তিনি উত্তেজিত হয়ে গাড়ি থামিয়ে যেই জানতে গেছেন, 'তোমাদের এত ভয় কিসের?' চোর দুটো একলাফে আঠারো ফুট নিচে পড়ে ধানক্ষেতের মধ্য দিয়ে বাঁই-বাঁই করে দৌড় দিলো। বেগমসাহেবা এবং তাঁর সঙ্গীরা বিস্মিত হয়ে তাদের পলায়ন দেখলেন।

মৃতা মহিলার সম্পর্কে বেশি দুঃখজনক স্মৃতিকথায় না গিয়ে তাঁর একটি বিখ্যাত উক্তির উল্লেখ করছি। তিনি এক সন্ধ্যায় একটা গাড়িকে গুঁতো মেরেই লাফিয়ে রাস্তায় নেমে এসে সেই গাড়ির ড্রাইভারকে চেপে ধরলেন, 'আমি জানতে চাই, এসব কি হচ্ছে? এই এক সন্ধ্যায় দেড় ঘন্টার মধ্যে পর পর ছ'টা গাড়ির সঙ্গে আমার গুঁতো লাগলো, আমি জানতে চাই কলকাতার ড্রাইভাররা সব হয়েছে-টা কি?'

*   *   *   *

দুর্দান্ত ড্রাইভারের সঙ্গে রাজযোটক সম্পর্ক খারাপ গাড়ির। খারাপ গাড়ি মানে পুরোপুরি ভাঙ্গা নয়, চলছে কিন্তু চলছে না এই রকম গাড়ি। খারাপ গাড়ি হাজার রকমের। শিবরাম চক্রবর্তী একটা গাড়ির নমুনা দিয়েছিলেন, যার হর্ন ছাড়া আর সবই বাজে। এই 'বাজে' শব্দটি বিশেষণ না ক্রিয়াপদ সে নিয়েও যথেষ্ট সংশয় আছে। প্রমথ সমাদ্দার একটা কার্টুন এঁকেছিলেন, অক্সফোর্ড মডেলের গাড়ি। আসলে সেটা একটা মান্ধাতা আমলের ফোর্ড গাড়ি, এখন গরুতে মানে অক্সে টানে তাই ঘুরে নাম হয়েছে অক্সফোর্ড।

এই রকম আরেকটা পুরনো, বহু পুরনো মাইনর মরিস গাড়ির কথা জানি, তার মালিক আমার পুরনো পাড়ার এক প্রতিবেশী গাড়িটাকে রীতিমত হাত দিয়ে চাপড়ে আদর করে বলতেন, 'বুড়ো খোকা, কবে তোমার একুশ বছর পূর্ণ হয়ে গেছে, এখন আর তুমি মাইনর নও, এখন তুমি মেজর মরিস।'

সেই মেজর মরিস সম্পর্কে ভদ্রলোক দাবি করেছিলেন লিটারে পঁচিশ কিলোমিটার যায়। এই অবিশ্বাস্য তৈলাক্ত ঘোষণা আমরা বিশ্বাস করি নি, জোর করে চেপে ধরতে ভদ্রলোক স্বীকার করেছিলেন, ঐ পঁচিশ কিলোমিটারের মধ্যে চার-পাঁচ কিলোমিটার যায় তেলে, আর বাকিটুকু অনিবার্য ভাবে গাড়ি খারাপ হয়ই, তখন কুড়ি-একুশ কিলোমিটার ঠেলে —ঠেলতেই হয়, উপায় নেই।

একেকটা খারাপ গাড়ির একেক রকম দোষ, একেক রকম মেজাজ। এক বিখ্যাত রাশিয়ান উপন্যাসের মাত্র প্রথম পৃষ্ঠাটি আমি পড়েছিলাম, তাতে বোধ হয় লেখা ছিলো, সব সুখী পরিবারের চেহারাই এক রকম কিন্তু অসুখী পরিবারগুলি একেকটা একেকরকম। খারাপ গাড়ি সম্পর্কেও কথাটা সত্যি। পিছনের নাম্বার প্লেট থেকে সামনের নাম্বার প্লেটের মধ্যে যে চার মিটার জুড়ে জিনিসপত্র রয়েছে তার প্রত্যেকটির বিচিত্রভাবে খারাপ হওয়ার যোগ্যতা আছে।

আমি একবার একটা গাড়ির পিছনের সিটের ভাঙা স্প্রিং ও দড়ির মধ্যে দেড়ঘণ্টা আটকে থাকার পর প্রাণপণ চেষ্টায় ক্ষতবিক্ষত হয়ে বেরিয়ে আসি। বসার সময় মোটেই টের পাই নি, সিটটা চাদর দিয়ে ঢাকা ছিলো। আরেকবার হাজারিবাগে একটা প্রাইভেট ট্যাক্সির হাতল ধরে দরজা খুলতে গিয়ে পুরো দরজাটা মাথায় এসে পড়ে।

এগুলো অবশ্য গাড়ির আভ্যন্তরীণ ব্যাপার। আমাদের অফিসের একটা গাড়ি ছিলো, ছাড়বার পাঁচ মিনিটের মধ্যে পুরো গাড়ির ভেতরটা ধোঁয়ায় ধোঁয়াকার হয়ে যেতো। কোথা থেকে কি কৌশলে সেই ধোঁয়া হতো কলকাতার বড় বড় মিস্ত্রিরা তা ধরতে পারে নি। আরেকটা গাড়ি ঠিক পনেরো মিনিট চলার পরে প্রহৃত কুকুরশাবকের মতো কোঁ কোঁ করে কাঁদতো। গাড়িতে কোনো নতুন লোক থাকলে চমকে উঠতো, ভাবতো সত্যি কোনো কুকুরছানা চাপা পড়েছে।

আমি গাড়ির ইঞ্জিন, কলকজার গোলমালের কথা বলতে যাচ্ছি না, সে অনেক বিস্তারিত ব্যাপার। বরং আর একটা পুরনো গল্প দিয়ে শেষ করি।

আমাদের বন্ধু স্বর্গীয় বিমল রায়চৌধুরী একবার একটা ঝরঝরে ট্যাক্সিতে কোথায় যাচ্ছিলেন, গাড়ি অত্যন্ত শ্লথ গতিতে ক্যাঁচক্যাঁচ করে চলেছে। বিমল ড্রাইভারকে বললেন, 'দাদা, একটা ছাগলকে পেট্রোল খাওয়ালে এর থেকে তাড়াতাড়ি যেতো।' সেই ড্রাইভার অম্লান বদনে বললো, 'কিন্তু আমি তো পেট্রোল খাই নি।'

প্রিয়তমাসু

সম্প্রতি পত্রিকান্তরে আমার দুই পুরনো বন্ধুর তথা বিখ্যাত কবির জায়াদ্বয় তাঁদের নিজ নিজ পতিদেবতা সম্পর্কে কিছু কিছু কথা সরলভাবে বলেছেন। এই সাক্ষাৎকারের কথা আগেই কানে এসেছিলো এবং কিঞ্চিৎ চিন্তিত ছিলাম মহীয়সী মহিলাদ্বয় কি বলবেন বা বলতে পারেন এই ভেবে। সুখের বিষয় সাক্ষাৎকার দুটি প্রকাশিত হবার পর আমাদের বুক থেকে পাষাণভার নেমে গেছে। না, ভদ্রমহিলারা কবি স্বামীদের মুখরক্ষা করেছেন, মারাত্মক কিছু বলেন নি। বরং স্বীকার করা ভালো, পড়ে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়েছে যে স্বামী ও সংসার নিয়ে তাঁদের বিশেষ কোনো গর্হিত অভিযোগ নেই, তাঁরা মোটামুটি সন্তুষ্ট।

কিন্তু যদি বিপরীত হয়। যদি কোনো দুঃসাহসী সম্পাদক বা সম্পাদিকা বিখ্যাত ব্যক্তিদের অনুরোধ করেন তাঁদের স্ত্রী-সংসার ইত্যাদি বিষয়ে অকপটে বলতে, তা হলে কি হতো? খ্যাতনামা ভদ্রলোকেরা কি দু-চারটি রোমহর্ষক কিংবা বিপজ্জনক উক্তি তাঁদের স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে বলতেন না?

হয়তো বলতেন, হয়তো বলতেন না। কিন্তু এই ভূমিকা বা অবতরণিকার সুযোগে কাণ্ডজ্ঞানের অনতিবিখ্যাত, হতভাগ্য লেখক তাঁর স্ত্রীর আচরণ সম্পর্কে আপামর পাঠক-পাঠিকাকে সাম্প্রতিক একটি ঘটনা জানাতে চান।

(এই প্রতিবেদন প্রকাশিত হওয়ার পরদিন যদি কোনো কারণে আমার
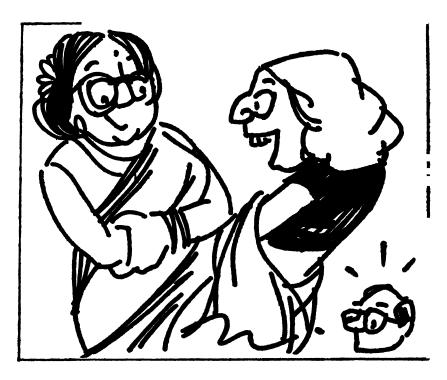
মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা, বাঁ হাতে প্লাষ্টার করা দেখেন, দয়া করে জানবেন বাথরুমে পা পিছলে পড়ে গিয়ে আমার ঐ অবস্থা হয়েছে। তিনি মোটেই দায়ী নন।)

* * *

গত পরশুদিন সন্ধ্যাবেলা অফিস থেকে বাড়ি ফিরে সামান্য বিশ্রাম করে ডাক্তারি নির্দেশানুযায়ী যথারীতি সান্ধ্যভ্রমণে বেরিয়েছি। হেঁটে যখন বাড়ি থেকে প্রায় এক কিলোমিটার দূরে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের অপর প্রান্তে পৌঁছেছি, তেড়ে বৃষ্টি এলো, সঙ্গে জোর বাতাস। কাছাকাছি কোথাও মাথা বাঁচানোর সামান্য আশ্রয় নেই। বেশ জোরে হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে বাড়ি আসার পথে একটি বিদ্যুৎ অথবা টেলিফোন অথবা জল সরবরাহ অথবা পাতাল রেল অথবা ওরিয়েন্টাল গ্যাস অথবা সড়ক বিভাগের প্রাচীন গর্তে পড়ে যাই এবং কোনো রকমে আত্মরক্ষা করে সারা গায়ে জলকাদা মেখে

খোঁড়াতে খোঁড়াতে বাড়ি ফিরি।

আমার স্ত্রীর অবশ্যই উচিত ছিলো আমাকে দেখে 'আহা, উহু' করা, আমার কাছে জানতে চাওয়া কি করে কোথায় আমার এই পরিণতি হলো, তারপর শুকনো তোয়ালে দিয়ে আমার মাথা মুছে দেওয়া, শুকনো লুঙ্গি-গেঞ্জি এগিয়ে দেওয়া এবং নিতান্ত এককাপ ধূমায়িত আদা-চা আমার জন্যে তৈরি করে আনা।

হা কপাল! তার বদলে ভদ্রমহিলা আমাকে ঘরে ঢুকতে দেখেই খেপে গেলেন, 'তুমি এই জল-কাদা নিয়ে ঘরের মধ্যে এলে? তুমি ওরকম এক পায়ে দাঁড়িয়ে আছো কেন? এ-ঘরের জলকাদা কে মুছবে?' তারপর আমার হতভম্ব পরাস্ত চেহারা, নিরুত্তর মুখ দেখে কেমন একটু নরম হয়ে গেলেন, বললেন, 'তুমি কি কোনোকালে মানুষ হবে না, এরকম চিরটাকাল ধরে করে যাবে? সব সময় জলকাদা নিয়ে ঘরে ঢুকবে?'

চিরকাল মানে কতকাল? সব সময় মানে কত সময়? আমার এই মুহূর্তে মনে পড়ছে শেষবার বৃষ্টিতে ভিজে বাড়ি এসেছিলাম সাত বছর আগে উনিশশো ছিয়াত্তর সালে। সেটাও গিয়েছিলাম কলেজ স্ট্রিটে জুতোর দোকানে। আগের দিন স্ত্রী একজোড়া চটি কিনেছিলেন সেখান থেকে, অনেক দেখেশুনেই কিনেছিলেন কিন্তু বাড়ি এসে দেখা যায় এক সাইজ ছোট হয়েছে। সেটা সকালবেলায় পালটিয়ে এক সাইজ বড় নিয়ে এসেছিলাম, কিন্তু সন্ধ্যাবেলায় স্ত্রী বললেন, 'আগের সাইজটাই বোধহয় ঠিক ছিলো, এটা কেমন বড় বড় ঠেকছে।' সেই দ্বিতীয় জোড়াটা পালটিয়ে প্রথম জোড়াটা পুনরুদ্ধার করতে গিয়েছিলাম। পুনঃ পুনঃ জুতো পালটানোর প্রক্রিয়াটি স্বভাবতই সম্মানজনক নয়। তদুপরি সেদিনও রাস্তার জলকাদা ঘরে বয়ে নিয়ে আসার জন্যে আজকের মতই অভ্যর্থনা পেয়েছিলাম।

কিন্তু এসব নিয়ে দুঃখ করে লাভ নেই। আমার স্ত্রী তো আমাকে মারতেও পারতেন। ভেজা নতুন জুতো জোড়া তাঁর হাতেই ছিলো কিংবা ইচ্ছে হলে পুরনো কিছু দিয়েও প্রহার করতে পারতেন। তা তিনি করেন নি বরং ফেরত আনা আগের জুতোজোড়া পায়ে দিয়ে অনেকক্ষণ হেঁটে হেঁটে

দেখলেন, ছোট হলো, বড় হলো, না ঠিক হলো !

আতলান্তিক তীরের এক শহরে শুধুমাত্র পুরুষ মদ্যপায়ীদের একটা দশাসই পাবের দেয়ালে অনেককাল আগে একটা আবেদন দেখেছিলাম। সুরা-রসিকদের প্রতি পাব-মালিকের অনুরোধ, ইংরেজিতে একটি ছড়া, কাঁচা বাংলায় যার অনুবাদ এ রকম হতে পারে—

'বাড়ি ফিরেই সেই তো আজও
বৌয়ের হাতে খাবেন মার,
বরং সখা, থাকুন না কেন,
থাকুন কিছুক্ষণটা আর।'

বলা বাহুল্য, এই নোটিসের গুণেই হোক কিংবা অন্য কারণেই হোক, সেই পাবে রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভিড় বাড়তো, ভিড় কিছুতেই ভাঙতে চাইতো না।

সে যাই হোক, বিলেতে কিন্তু আজকাল মেমসাহেবরা খুব বেশি মারধোর, খারাপ ব্যবহার করেন না স্বামী দেবতাদের সঙ্গে। কারণ আর কিছুই নয়, অধিকাংশ স্বামীই পালানোর জন্যে প্রস্তুত। এখন আর নতুন সাহেব বর জোগাড় করা খুব সহজ নয়। আগে বৌয়েরাই পালাতো, আজকাল নাকি সাহেব স্বামীদেরই পালানোর দিকে বেশি ঝোঁক।

তবে আমাদের দেশে ব্যাপারটা একটু অন্য রকম। স্বামীরা পালাবে কোথায়, পালিয়ে কোথায় যাবে! ভালো করে খোঁজ নিলে দেখা যাবে এক হাজার বৌ পালানোর ঘটনার বিনিময়ে একটি মাত্র বর পালানোর নজির হয়তো পাওয়া যাবে।

তবে একটা গল্প শুনেছিলাম, কে একজন মধ্যবয়স্কা অনূঢ়া মহিলা সহসা বিয়ে করার জন্যে উৎসাহী হয়ে খবরের কাগজে 'স্বামী চাই' বলে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন, কয়েক হাজার চিঠি পেয়েছিলেন তিনি, কিন্তু একটিও কোনো পুরুষমানুষের কাছ থেকে নয়। হাজার হাজার বিবাহিতা মহিলা তাঁদের স্বামীর ফটো পাঠিয়ে, গুণগান করে পত্র দিয়েছিলেন, একটিই অনুরোধ, 'তুমি আমার স্বামীকে নাও।'

এরই বিপরীত দিকে আমার এক বান্ধবী একবার তাঁর স্বামীকে অনুরোধ করেছিলেন, তুমি কাগজে কাগজে বিজ্ঞাপন দাও, 'বিবাহযোগ্যা স্ত্রী আছে', এই বলে।

কে এক নাকউঁচু চিরকুমার কোনো অভিজ্ঞতা বিনাই একদা বলেছিলেন, 'বিবাহ একটি রোমাঞ্চকর কাহিনী যার প্রথম পরিচ্ছেদ শুরু হয় নায়কের মৃত্যু দিয়ে।' আমার অবশ্য কুড়ি বছরের অভিজ্ঞতা কিন্তু এত বড় কথা বলার সাহস আমার নেই। তবে আমি নিপীড়িত, নির্যাতিত স্বামীদের একটি স্তোকবাক্য উপহার দিতে পারি রাশিয়ান কাহিনী থেকে ধার নিয়ে, 'হে ভদ্রলোক, আপনার ছেলেটি আপনাকে যত বড় হীরো ভাবছে, আপনি হয়তো সত্যিই তা নন, কিন্তু আপনার স্ত্রীরত্নটি আপনাকে যত বড় বোকা ভাবছেন আপনি তাও নন।'

আর তাছাড়া সদাসর্বদা স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া করলে ক্ষতিই হবে এমন কোনো কথা নেই। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ অভিধানকারকে তাঁর অভিধান রচনার জন্যে ভূয়সী প্রশংসা করে একজন জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'এই আশ্চর্য অভিধান, এতো বিচিত্র সব শব্দ আপনি কি করে সংগ্রহ করেছেন?' অভিধানকার মৃদু হেসে বলেছিলেন, 'বৌয়ের সঙ্গে ঝগড়া করে।' এই উত্তরে প্রশ্নকারীর বিমূঢ় মুখশ্রী দেখে অভিধান রচয়িতা ব্যাখ্যা করেছিলেন, 'সারা দিনরাত পঁচিশ বছর ধরে ঝগড়া করে, কথার পিঠে কথার পর কথা সাজিয়ে সাজিয়ে এতো শব্দ আমার আয়ত্তে আসে।'

তবু ঝগড়াঝাঁটি হোক কিংবা যাই হোক, বেশি দিন বিয়ে হয়ে গেলেই যে পত্নীর প্রতি ভালোবাসা থাকে না তা নয়। আমার এক প্রৌঢ় সহকর্মী প্রায় প্রতিদিনই সকালবেলায় বাড়িতে ঝগড়া করে এসে অফিসে আমার কাছে খিটমিট করে স্ত্রীর বিষয়ে রাগারাগি করতেন। সেই ভদ্রমহিলা একবার দিন কয়েকের জন্যে স্বামীকে রেখে কি একটা বিয়েটিয়ে উপলক্ষে কলকাতার বাইরে গেছেন। দিনটা বোধহয় ছিলো শুক্রবার। শনি-রবিবার ছুটির পরে ভদ্রলোক সোমবার অফিসে এলেন। প্রৌঢ় বয়সের বিরহ, ভদ্রলোক কেমন যেন চুপসে গেছেন। আমি জিজ্ঞাসা করি, 'কি হলো

মিষ্টার ধরচৌধুরী ?' দেখলাম মিষ্টার ধরচৌধুরী শুধু চুপসেই যান নি, তাঁর মুখ দিয়ে স্বর বেরোচ্ছে না ভালো করে, জড়িয়ে জড়িয়ে বললেন, 'আর বলবেন না, আজ আড়াই দিন খাওয়াদাওয়া প্রায় বন্ধ।' আমি অবাক হয়ে বললাম, 'সেকি, মিসেস ধরচৌধুরী সামান্য চোখের আড়াল হতে আপনি খাওয়াদাওয়া পর্যন্ত ছেড়ে দিয়েছেন!' মিষ্টার ধরচৌধুরী বললেন, 'উপায় নেই। মিসেস যাওয়ার সময় ভুল করে তাঁর নিজের জিনিসপত্রের ভিতরে আমার বাঁধানো দাঁতজোড়া নিয়ে চলে গেছেন', বলে দন্তহীন মাড়ি কিড়মিড় করার চেষ্টা করলেন।

নিজের ওজন নিজে বুঝুন

একটু আগে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। রাস্তাটা অপেক্ষাকৃত ফাঁকা। সন্ধ্যার দিকে চৌরঙ্গী রোড ধরে হেঁটে ফিরছি, হঠাৎ সামনে এক ব্যক্তি এসে উদয় হলেন। দেখে একটু চমকে উঠেছিলাম, আগে-ভদ্রলোক-ছিলাম গোছের চেহারা। শীর্ণ, ময়লা জামা, ছেঁড়া চটি, চোখে-মুখে ক্ষুধার্ত ভাব। অবশ্য একটু পরেই বুঝলাম আমার চমকানোটা অমূলক, লোকটি একজন সামান্য ভিখিরি ; গুণ্ডা বা ছিনতাইকারী নয়।

ব্যক্তিটি আমার সামনে এসে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'দাদা, দশটা পয়সা দেবেন, ছু-দিন কিছুই খাই নি।' বুঝতে পরলাম লোকটি শুধু ভিখিরি নয়, নির্বোধও বটে, ছু-দিন যদি না খেয়ে থাকে, তবে দশ পয়সায়, মাত্র দশ পয়সায় আজকের দিনে কি খেতে পাবে! আমি বাধ্য হয়েই জিজ্ঞাসা করলাম, 'ছু-দিন যদি না খেয়ে থাকেন, তাহলে দশ পয়সা দিয়ে কি হবে?' উত্তরে ক্ষুধার্ত ব্যক্তিটি বললেন, 'একটু ওজন নিয়ে দেখতাম, আমার ওজন কতটা কমেছে।'

একজন পথের ভিক্ষুকের এই রকম বৈজ্ঞানিক মনোভাব দেখে আমি এরপর কতটা চমৎকৃত হয়েছিলাম সেটা বুঝিয়ে বলার নিশ্চয় দরকার নেই।

তবে সেই মুহূর্তে আমারও মনে পড়লো বেশ কিছু দিন আমি নিজেও ওজন নিই নি, বহু কষ্টে শরীরের স্থূলতা মাস কয়েক আগে অনেকটা কমিয়েছিলাম, এখন সন্দেহ হচ্ছে আবার বুঝি মোটা হয়ে যাচ্ছি।

প্রসঙ্গত বলে রাখা ভালো, আমার এই ওজন কমানোর ব্যাপারটা আমার বন্ধুবান্ধব, পরিচিত-পরিজন অনেকেই বিশেষ সহজভাবে নেন নি, অনেকেই আমার মধ্যদেশের দিকে ভ্রূকুঞ্চন করে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন, 'সত্যি রোগা হয়েছো, বলছো?' এমন কি আমার সহধর্মিণী পর্যন্ত এ বিষয়ে গভীর সন্দেহ প্রকাশ করে থাকেন। একবার তাঁর সামনে ওজন নিয়ে ওজন-যন্ত্রের কার্ডে দেখলাম আগের বারের চেয়ে দেড় কেজি ওজন কম। ভদ্রমহিলা ওজনের অঙ্কের দিকে না তাকিয়ে কার্ডের নিম্নাংশের আপ্ত বাক্যটি পড়তে লাগলেন, ইংরেজিতে লেখা সেই সদুক্তি, যার বঙ্গানুবাদ হবে, 'আপনি সৎ চরিত্রের, উদার দিলখোলা লোক। সকলেই আপনাকে

ভালোবাসেন।' ভদ্রমহিলা নির্বিকারভাবে বললেন, 'এই কথাগুলো তোমার সম্পর্কে যেমন মিথ্যে, তেমনি মিথ্যে তোমার ওজনের হিসেব।'

এই সূত্রে এক স্থূলাঙ্গিনী মেমসাহেবের কথা মনে পড়ে যায়। তাঁর স্বামী তাঁর উপরে খুব অত্যাচার করেন, তিনি ক্রমশ কাহিল হয়ে যাচ্ছেন, ক্রমশ কিঞ্চিৎ রোগাও হয়ে যাচ্ছেন। এই রকম সময়ে এক বান্ধবীর সঙ্গে সেই মেমের দেখা। বান্ধবী তাঁকে অনেকদিন পরে দেখে বললেন, 'এ কি, লরা, তোমার একি চেহারা হয়েছে!' লরা মেম তখন তাকে বললেন যে তাঁর স্বামীর অত্যাচারে তাঁর এই অবস্থা হয়েছে। এই বলে নিরালায় বসে চোখের জলে ভিজিয়ে তিনি প্রচুর পরিমাণ পতি-নিন্দা করলেন, অত্যাচারের বিবিধ বর্ণনা দিলেন এবং সর্বশেষে বললেন যে, স্বামীর অমানুষিক ব্যবহারে গত কয়েক মাসে তাঁর পনেরো পাউণ্ড ওজন কমে গেছে। দরদী বান্ধবী তখন সুপরামর্শ দিলেন, 'তা হলে তুমি তোমার স্বামীকে ডিভোর্স করছো না কেন? তুমি যা যা বললে আদালতে জানালে সঙ্গে সঙ্গে ডিভোর্স পেয়ে যাবে।' তখন লরা মেম গম্ভীর হয়ে বললেন, 'ডিভোর্স করবো, নিশ্চয়ই করবো। তবে আরো কিছুদিন পরে।' বিস্মিতা বান্ধবী বললেন, 'বিবাহবিচ্ছেদ যদি করতেই হয় তবে আর কিছুদিন অপেক্ষা করা কেন?' স্থূলাঙ্গিনী লরা বললেন, 'আমার ওজনটা আর পনেরো-বিশ পাউণ্ড কমলেই আমি ওঁর বিরুদ্ধে বিবাহবিচ্ছেদের মামলা আনবো।'

নোবেল প্রাইজের সঙ্গে ধ্বনি সমন্বয় করে ইংরিজিতে একটা বাজে পান (Pun) আছে, নো বেলি প্রাইজ (No Belly Prize)। যে কেউ রোগা হচ্ছেন, খাদ্য কমিয়ে বা পরিশ্রম বাড়িয়ে ওজন ওরফে ভুঁড়ি কমানোর চেষ্টা করছেন, তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়, 'কি হে, তুমি কি নো বেলি প্রাইজের চেষ্টা করছো নাকি?'

আরেকটা মোটা দাগের বিলিতি গল্প আর এক মোটা মেমসাহেবকে নিয়ে। সেই গজেন্দ্রগামিনী তাঁর ডাক্তারকে ফোন করেছিলেন, 'ডাক্তার সাহেব; আজ আমার জন্মদিন।' ও প্রান্তে ডাক্তার সাহেব বললেন,

'হ্যাপি বার্থ ডে।' মোটা মেম বললেন, 'কিন্তু ডাক্তার সাহেব, আমি বড়ো বেকায়দায় পড়েছি, আমাকে শিগগির একটা রোগা হওয়ার জোরালো ওষুধ পাঠিয়ে দিন। ডাক্তার সাহেব শুধোলেন, 'ম্যাডাম, জন্মদিনে রোগা হওয়ার ওষুধ দিয়ে কি হবে?' 'কী বলবো ডাক্তার সাহেব, আমার বর আমাকে একটা উপহার দিয়েছে। কিন্তু সেটা এতই ছোটো যে আমি তার মধ্যে গলতে পারছি না।' মহিলার করুণ কণ্ঠে এই সংবাদ পেয়ে ডাক্তার সাহেব বললেন, 'আপনি পোশাকটা সঙ্গে করে চলে আসুন, দেখি কতটা কি করা যায়?' মোটা মেম আর্তনাদ করে উঠলেন, 'পোশাক? পোশাক কি বলছেন? আমার স্বামী আমাকে একটা গাড়ি দিয়েছে, আমি সেই গাড়ির মধ্যে ঢুকতে পারছি না।'

একদা বড়ো ওজনের মানুষ বলতে বোঝাতো ক্ষমতাবান, কৃতী মানুষদের। তখন মানুষদের সাফল্যের মাপকাঠিই ছিলো তার ওজন। এখন একমাত্র যাত্রাদলের নায়ক-নায়িকা ছাড়া আর কোথাও ওজনের কোনো গুরুত্ব নেই।

চালু কথাই ছিলো, নিজের ওজন বুঝে চলবে, নিজের ওজন বুঝে কথা বলবে। তখন ওজন মানেই ছিলো গুরুত্ব। কিন্তু এখন সবচেয়ে সফল লোকেরা চাইছেন তাঁদের ওজন কমাতে, ছিমছাম, ফিটফাট হতে। অতিরিক্ত দেহ-ভার নাকি কর্মশক্তি, জীবনীশক্তি কমিয়ে দেয়।

কিন্তু এ-কথা বুঝি পুরোপুরি সত্য নয়। এখনো মাঠে-ময়দানে দেখি শেষরাতের অন্ধকারে আর বিকেলের ছায়ায় হাজার হাজার মোটা লোক যেমন হনহনিয়ে ছুটছে রোগা হওয়ার জন্যে, তেমনিই হাজার হাজার রোগা লোক ছুটছে মোটা হওয়ার জন্যে।

মোটা-রোগার কথায় মনে পড়ে, শিবরাম চক্রবর্তীর গল্পের মোটা নায়ক (তাঁর স্ত্রীও মোটা) বলেছিলেন, আমরা বাড়িতে মোটামুটি দু'জন। এরই প্রতিধ্বনি তুলে একদা আমার এক অসুস্থ বন্ধুর তন্বী সহধর্মিণী বলেছিলেন, 'আমরা রোগারুগী দু'জন।'

তবে মোটা-রোগা নিয়ে সবচেয়ে বিখ্যাত গল্প দুই খ্যাতিমান সাহেবকে

নিয়ে। এঁদের হু'জনের নাম আমার বারবার গুলিয়ে যায়, তাই জব্দ হওয়ার ভয়ে লিখছি না (বার্নার্ড শ এবং চেস্টারটন নয় তো ? হে সুশিক্ষিতা পাঠিকা, ভুল হয়ে থাকলে, দয়া করে চিঠি দিয়ে বা ফোন করে অপমান করবেন না। আমার বিদ্যের দৌড় তো আপনি এতদিনে বুঝে গেছেন। আর কাণ্ডজ্ঞানের দৌড়ও প্রায় শেষ।)

সে যা হোক, বার্নার্ড শ যেমন রোগা ছিলেন, চেস্টারটন ছিলেন তেমন মোটা। একদিন কি একটা কথার মধ্যে চেস্টারটন বার্নার্ড শ'র দিকে লক্ষ করে বলেছিলেন, 'তোমাকে দেখলেই মনে হয় দেশে দুর্ভিক্ষ চলছে।' ক্ষুর-জিহ্ব বার্নার্ড শ সঙ্গে সঙ্গে স্থূল চেস্টারটনকে বলেছিলেন, 'অবশ্য তোমাকে দেখলেই বোঝা যায় দুর্ভিক্ষের কারণটা কি।'

এতো সব কথা বলতে গিয়ে ওজনের গল্পগুলো কিন্তু ঠিকমতো বলা হলো না। অন্তত দুটো বলা যাক।

একবার এক প্রগল্‌ভা সুন্দরীকে কে যেন না বুঝে প্রশ্ন করেছিলেন, 'আপনি একটু মোটা হয়ে গেছেন নাকি ?' প্রশ্ন শুনে ভদ্রমহিলা চোখ নাচিয়ে বললেন, 'বাজে কথা। এই জংলি শাড়িটার জন্যে এমন দেখাচ্ছে। জামাকাপড় খুলে আগেও আমার ওজন ছিলো একশো চার পাউণ্ড, এখনো সেই একশো চার পাউণ্ড।' এ ধরনের জবাবে ভদ্রলোক চমকিয়ে গিয়ে বললেন, 'তাই নাকি ?' মহিলা মোহিনী কণ্ঠে বললেন, 'কেন ? সন্দেহ হচ্ছে ? দেখবেন ?'

এ গল্পটা সুরুচির উপকূল ছুঁয়ে গেলো। এরই পাশের গল্পটা অনেক ছিমছাম। একটি অত্যন্ত রোগা, চোখে হাই পাওয়ার চশমা, সত্যবাদী যুবক ইণ্টারভিউ বোর্ডের প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন, 'চশমাসুদ্ধু আমার ওজন একাশি পাউণ্ড।' ইণ্টারভিউ বোর্ডের চেয়ারম্যান জানতে চেয়েছিলেন, 'চশমাসুদ্ধু ওজনের দরকার কি ?' ছেলেটি নিজের মোটা কাচের দিকে নির্দেশ করে বলেছিলো, 'চশমা খুলে ফেললে যে আমি ওজনের স্কেলটা পড়তে পারি না।'

সবশেষে আমার নিজের ওজনে ফিরে আসি। ওজন কমানোর চেষ্টায়

এখন আমার দমবন্ধ দিন কাটছে। কিন্তু আরম্ভটা হয়েছিলো হালকা ভাবে। অন্য একটা অসুখের সূত্রে ডাক্তারবাবু বললেন, অতিরিক্ত মেদ আমার অসুখের কারণ। তিনি নিজেও আমার থেকে কম মোটা নন। কিন্তু আমাকে বললেন, 'আমাদের দশ কেজি ওজন কমাতে হবে।' প্রস্তাব শুনে আমি খুশি হয়ে বললাম, 'আজ্ঞে নিশ্চয়, আপনি পাঁচ কেজি, আমি পাঁচ কেজি।' ডাক্তারবাবু খুশি হন নি।

জীবজন্তুর কথা

লিখেছিলাম নাকি কাণ্ডজ্ঞানে জীবজন্তুর বিষয়ে এর আগে? মাত্র পনেরো মাসেই কি রকম যেন স্মৃতিবিভ্রম হচ্ছে আমার। তাছাড়া একই লোকের কাছে একই রসিকতা দু'বার করার চেয়েও অনেক বেশি বিপজ্জনক একই রসিকতা একই পৃষ্ঠায় একাধিকবার করতে যাওয়া। খেয়াল করতে পারছি, বানর নিয়ে, গরু নিয়ে লিখেছি; কিন্তু পুরোপুরি জীবজন্তু নিয়ে বোধ হয় নয়।

সে যা হোক, এখন যে-গল্পটা উল্লেখ করছি সেটা নিশ্চয়ই আগে লিখি নি, তার কারণ একটা বিলিতি কার্টুনে আমি নিজেই মাত্র গতকাল এটি দেখেছি ও পড়েছি। এটা ক্যাঙারুদের গল্প। খুব ভিড়; সেই ভিড় ঠেলতে ঠেলতে বাপ-ক্যাঙারু আর মা-ক্যাঙারু একটু ফাঁকায় এসে দাঁড়াতেই বাপ-ক্যাঙারু জিজ্ঞাসা করছে, 'খোকা, খোকা কই?' মা-ক্যাঙারু তার শরীরের মধ্যে শূন্য পকেটের দিকে তাকিয়ে বলছে, 'সর্বনাশ, খোকা তো এই ভিড়ের মধ্যে পকেটমার হয়ে গেলো।'

জীবজন্তুর খোকাদের নিয়ে এ-রকম আরেকটি অনেকদিন আগে দেখা ব্যঙ্গচিত্র মনে পড়ছে; সেটি অক্টোপাসদের নিয়ে। একটি বড় অক্টোপাস, তার চারপাশে কিলবিল করছে ছোটো ছোটো অক্টোপাস। সেই ছোটো অক্টোপাসগুলি বড়টির বাচ্চা, তারা তাদের মাকে জোর করছে, 'মা, তুমি

আমাদের বলে দাও, কোন্‌গুলি আমাদের পা আর কোন্‌গুলি আমাদের হাত।'

কিন্তু মা অক্টোপাস এই সাংঘাতিক প্রশ্নের কি উত্তর দেবে! মা অক্টোপাস নিজেই কি জানে কোন্‌গুলো তার হাত, আর কোন্‌গুলো তার পা? আর, সবচেয়ে বড় কথা তা জানারই বা দরকার কি?

অক্টোপাসের ব্যক্তিগত সমস্যা কিংবা তার জ্ঞানবুদ্ধি নিয়ে আমাদের তেমন মাথাব্যথা নেই। বরং একটা কাণ্ডজ্ঞান এবং বাক্‌শক্তি সম্পন্ন বেড়ালের কথা বলি।

এই বেড়ালটি একটি প্রাচীন, মাথামোটা, সাদা-কালো হুলো বেড়াল। আমি নিজে স্বচক্ষে এই বেড়ালটিকে দেখি নি কিন্তু অত্যন্ত বিশ্বাসযোগ্য এক ভদ্রলোকের মুখে এর বৃত্তান্ত শুনেছি।

গরমের দিনের এক ভরদুপুর বেলায় সেই ভদ্রলোক চেতলার এক গলি

দিয়ে গাড়ি চালিয়ে আসছিলেন। সুনসান মধ্য নিশীথের মতো ফাঁকা চারদিক, হঠাৎ গলির মুখের একটু আগেই ভদ্রলোকের গাড়িটা কি করে খারাপ হয়ে .একবার হ্যা-হ্যা-হ্যা করেই বন্ধ হয়ে গেলো। প্রচণ্ড গরমে রাস্তায় পিচ গলছে, চারদিকে রোদ্দুরের ঝাঁজ, আশেপাশে জনমানব চোখে পড়ছে না। অন্তত গাড়ি ঠেলবার লোক সব রাস্তাতেই পাওয়া যায় কিন্তু এই সময়ে সেটাও দেখা যাচ্ছে না। ভদ্রলোক নিজে গাড়ির যন্ত্রপাতি সম্পর্কে ভালো জানেন না, তবু নিরুপায় হয়ে গাড়ি থেকে নামলেন, নেমে সামনেটা খুলে ইঞ্জিনের মধ্যে তাকিয়ে দেখতে লাগলেন কোনো গোলমাল ধরা যায় কিনা। ঘামতে ঘামতে ইঞ্জিন পর্যবেক্ষণ করছেন এমন সময় তাঁর কানে এলো কে যেন মোটা গলায় বলছে, 'কার-বুরেটরে গোলমাল মনে হচ্ছে।' একজন সাহায্যকারী পাওয়া গেলো এই আশায় ভদ্রলোক মাথা তুলে দেখলেন মানুষজন কিছু নয়, একটা বেড়াল। ছোটবেলায় সুকুমার রায়ের হযবরল পড়ে আর দশটি শিশুর মতোই মজা লেগেছিলো তাঁর ; সেই মজা, সেই কল্পকাহিনী কোনোদিন যে সত্যি হতে পারে এ তিনি ঘুণাক্ষরেও কখনো ভাবেন নি।

সামনের একটা শতাব্দী-প্রাচীন তিনতলা বাড়ির অর্ধভগ্ন দেয়ালের উপরে একটি প্রলম্বিত এবং তুলনামূলকভাবে বৃহৎ গন্ধরাজ ফুলগাছের ছায়ায় পূর্ব-বর্ণিত সাদা-কালো অভিজ্ঞদর্শন বেড়ালটি বসে রয়েছে এবং সে-ই কথা বলছে। ভদ্রলোক মাথা তুলতে বেড়ালটি আবার গমগমে গলায় মানুষের মতো অবিকল বললো, 'কারবুরেটরটা সারাতে হবে।'

ভদ্রলোক স্তম্ভিত হয়ে প্রাচীরস্থ বেড়ালটির দিকে তাকিয়ে রইলেন, এমন সময় ঐ তিনতলা বাড়ি থেকে এক বুড়ো ভদ্রলোক বাড়ির বাইরে বেরিয়ে এলেন, 'কালাচাঁদ, এই কালাচাঁদ', এই রকম হাঁকতে হাঁকতে। বেড়ালটিও দেয়াল থেকে এক লাফে ভিতরের দিকে নেমে চলে গেলো। বুড়ো সদর দরজায় এসে গাড়ির সামনে বিপদ্‌গ্রস্ত ভদ্রলোককে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি হলো, গাড়ির কিছু খারাপ হয়েছে?'

বেড়ালকে কথা বলতে দেখার ধাঁধা ভদ্রলোকের তখনো কাটে নি,

তিনি বললেন, 'একটা বেড়াল আমাকে বললে…', অবিশ্বাস্য ব্যাপার, ভদ্রলোককে বাক্য সম্পূর্ণ করতে না দিয়ে বুড়ো বললেন, 'বেড়াল? কালাচাঁদ? ঐ সাদা-কালো যেটা এই দেয়ালের উপরে বসে ছিলো?' ভদ্রলোক বললেন, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, ঐ সাদা-কালো বেড়ালটা।' বুড়ো জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি বলেছে কালাচাঁদ?' ভদ্রলোক রীতিমত বিচলিত হয়ে বললেন, 'বেড়ালটা বললো আমার গাড়ির কারবুরেটরটা নাকি খারাপ হয়েছে।' বুড়ো হো হো করে হেসে বললেন, 'কালাচাঁদ বুঝি তাই বলেছে। কালা-চাঁদের যত মাতব্বরি। ও গাড়ির কি বোঝে? আপনি ওর কথা বিশ্বাস করবেন না।'

এই কাহিনীর বাকি অংশ আমাদের এই জীবজন্তুর কাণ্ডজ্ঞানে প্রয়োজন নেই। বিশ্বাস করার মতো গল্প নয় এটা, শুধু যিনি বলেছিলেন তাঁর উপর আস্থা আছে বলে এই গল্পটা লেখার সাহস হলো।

তবে কিছুদিন আগে সোভিয়েত রাশিয়া থেকে বাতির নামে যে কথা-বলা হাতীর বাচ্চার সংবাদ প্রচারিত হয়েছে, সেটা পড়ার পর বুঝতে পেরেছি শুধু চেতলার বেড়াল নয়, রাশিয়ার হাতীও মানুষের ভাষায় কথা বলতে পারে। আর বাতিরের কথাবার্তা অতি চমৎকার। সে মোটেই কালাচাঁদের মতো শয়তান নয়। তার একটাই দোষ, কাণ্ডজ্ঞান লেখক তারাপদ রায়ের মতো সে অনবরতই নিজের কথা বলে। 'বাতির খুব ভালো, বাতিরকে স্নান করার জল দাও, কই বাতিরের খাবার কোথায়?' ইত্যাদি নিতান্ত আত্মগত ভাষণ বাতিরের, যা টেপরেকর্ডেও ধরা পড়েছে।

অবশ্য ক্যাঙারু, অক্টোপাস, বেড়াল বা হাতীর বাচ্চা নয়, কথা বলার গল্প ঘোড়াকে নিয়েই বেশি।

অনেক গল্পের মধ্যে থেকে দু'রকম দুটো ঘোড়ার কথা বেছে নিচ্ছি। প্রথমটি, ঘোড়দৌড়ের ঘোড়া। ধরা যাক, ঘোড়াটির নাম যেমন হয় 'হ্যাপি বয়'। হ্যাপি বয়ের জীবন কিন্তু খুব হ্যাপি নয়। সে রেসে দৌড়ায় বটে, কিন্তু তার স্থান খুব উঁচুতে নয়, সে মোটেই বাজি জিততে পারে না। জুয়াড়িরাও সেই জন্যে তার উপরে বিশেষ বাজি ধরে না।

সেদিন একটা রেসে অন্যান্য ঘোড়ার সঙ্গে হ্যাপি বয়ও রয়েছে এবং যথারীতি তার উপরে বিশেষ কেউই বাজি ধরে নি। রেস আরম্ভ হওয়ার কিছু আগে রেস কোর্সের বুকিং কাউণ্টারে কর্মরত ভদ্রলোক হঠাৎ শুনলেন ফ্যাসফ্যাসে গলায় কে একজন বলছে, 'দাদা, হ্যাপি বয়ের উপরে দশ হাজার টাকা ধরছি', বলে এক তাড়া নোট কাউণ্টারের সামনে এগিয়ে দিয়েছে। কাউণ্টারের ভদ্রলোক কি একটা হিসেব মেলাচ্ছিলেন, তিনি হঠাৎ মাথা তুলে দেখেন একটা ঘোড়া দশ হাজার টাকার নোটের বাণ্ডিল কাউণ্টারের উপর রেখেছে। সুখের বিষয়, তিনি আঁতকে ওঠেন নি, রেসকোর্সে কাজ করে করে ঘোড়া ও মানুষের প্রভেদ করতে তাঁর একটু সময় লাগে। কিন্তু তাঁর প্রতিক্রিয়া হলো 'হ্যাপি বয়' শুনে, তিনি চঞ্চল হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'হ্যাপি বয়ের ওপরে দশ হাজার টাকা কেন?' কাউণ্টারের ওপার থেকে সেই ঘোড়াটি বললো, 'কারণ আমিই হ্যাপি বয়।'

দ্বিতীয় গল্পের ঘোড়াটি অবশ্য সাধারণ চড়বার ঘোড়া। এক ঘোড়সওয়ার তাঁর ঘোড়া থেকে মাটিতে ছিটকে পড়ে আহত হয়েছিলেন। সেই ঘোড়াটি সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গিয়ে এক পশুচিকিৎসককে ডেকে নিয়ে প্রভুর কাছে অকুস্থলে ফিরে আসে। পরে ঐ ঘোড়ার মালিককে তাঁর ঘোড়ার এই বুদ্ধির প্রশংসা করলেই তিনি আপত্তি জানাতেন, 'একেই বলে ঘোড়ার বুদ্ধি। আমি কি ওর মতো ঘোড়া নাকি যে আমার জন্য ঘোড়ার ডাক্তার ডেকে এনেছে?'

এতো সব অলীক কাহিনীর শেষে একটি সত্যিকারের ঘটনা বলি। সেটা অবশ্য ঘোড়ার কথাবলার গল্প নয়, মানুষের কথা না বলার গল্প।

ছোটবেলায় আমাদের এক প্রতিবেশীর একটি ঘোড়া ছিল। সেটি তাঁর বাড়িতেই থাকত, কালেভদ্রে কখনো চড়তেন। সকালবেলা তিনি ঘুম থেকে উঠে ঘোড়াটিকে নিঃশব্দে ঘাড়ে ধাক্কা দিয়ে আস্তাবল থেকে বার করে দিতেন। ঘোড়ার খাওয়ার পাত্রে ভুষি-ছোলা ইত্যাদি দিয়ে সেই টিনের পাত্রটি একটি লাঠি দিয়ে বাজিয়ে ঘোড়াটি অন্যমনস্ক থাকলে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন খাদ্যের প্রতি। এমনকি, ঐ ঘোড়ায় চড়ে কখনো

কোনো মোড়ের কাছে এলে, 'ডাইনে' বা 'বাঁয়ে' ইত্যাদি না বলে ঘোড়া থেকে নেমে লাগাম টেনে নির্দিষ্টমুখী হয়ে আবার ঘোড়ায় চড়তেন। তাঁর এই ব্যবহারে অবাক হয়ে একদিন আমি জানতে চেয়েছিলাম, অন্যরা যেমন বাঁয়ে-ডাইনে বলে, খাবার দিয়ে ডাকে, আপনি তা করেন না কেন ? ঘোড়া তো এসব কথা বেশ বুঝতে পারে।' তিনি গম্ভীর মুখে আমাকে বলেছিলেন, 'এ ব্যাটা আমাকে তিন বছর আগে একবার অন্যায়ভাবে চাঁটি মেরে ফেলে দিয়েছিলো, তারপর থেকে আমি ওর সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করে দিয়েছি।'

শেষ কাণ্ডজ্ঞান

বিজয়লক্ষ্মী নাম্নী এক মহিলা, টেলিফোনে কণ্ঠস্বর শুনে মনে হয়েছে হয়তো তরুণী। তাকে চোখে দেখি নি তার বাঁশি শুনেছি। সেই মহিলা আজ কিছুকাল, বেশ কিছুকাল হলো, দূরভাষ যন্ত্রের নিরাপদ দূরত্ব থেকে চপল কণ্ঠে আমার কাণ্ডজ্ঞানের পরিমিতি বোধ সম্পর্কে নিয়মিত সংশয় জ্ঞাপন করেন। মহিলার, কি জানি কেন, ধারণা হয়েছিল কাণ্ডজ্ঞান বহু আগে বন্ধ হয়ে যাবে। যে সপ্তাহে কাণ্ডজ্ঞান ছাপা হয় না তিনি হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন এবং মনেপ্রাণে আশা করেন এবার নিশ্চয় তারাপদ রায়ের কাণ্ডজ্ঞান খতম হয়েছে।

বিজয়লক্ষ্মীর দুরাশা এতদিনে সফল হতে চলেছে। আমি ক্লান্ত, সম্পাদক ক্লান্ত, পাঠক-পাঠিকা ক্লান্ত, কম্পোজিটার, প্রুফ রীডার, এমনকি চির সাবলীল অহিভূষণ মালিক পর্যন্ত ক্লান্ত।

সব পাঠকই যে নিতান্ত ক্লান্ত তা নন, অনেকে রীতিমত ক্ষিপ্ত। অনেকের ধারণা কাণ্ডজ্ঞানে যা কিছু হাসি-ঠাট্টা করেছি সবই তাকে নিয়ে, কিংবা তাঁর পরমপূজনীয় মামাশ্বশুর কিংবা স্বর্গীয় দাদামশায়কে নিয়ে করা হয়েছে। অথচ কাণ্ডজ্ঞানের চরিত্রেরা যে আমারই মামাশ্বশুর, আমারই দাদামশাই এবং এর নায়ক যে আমি নিজে একটা কাকে বোঝাবো!

তবে অচেনা লোকদের বিশেষ বোঝানোর দরকার নেই। অহিভূষণ সপ্তাহের পর সপ্তাহ, কোনো কালে আমাকে না দেখে আমার যে ছবি এঁকেছেন সেটাই আমার আত্মগোপন করার পক্ষে সবচেয়ে সহায়ক।

সত্যি কথা বলতে কি, সেদিন দেখলাম অনেকে মিলে একজন টাক-মাথা, চশমাওলা, নাক উঁচু লোককে মারছে, দেখেই চিনতে পারলাম লোকটাকে, অহিভূষণের বর্ণিত কাণ্ডজ্ঞানকার তারাপদ। ভগবানে বিশ্বাস ফিরে পেলাম, ভাগ্যিস অহিবাবু আমাকে দেখে আমার ছবি আঁকেন নি।

এই সূত্রে একটা গল্প বলি। একবার এই রকমই দেখেছিলাম একটা লোককে বেশ কয়েকজন লোক ধরে মারছে। খুব মার খেয়েও লোকটার

কিন্তু মুখে হাসি। মারধোর শেষ হয়ে গেলে লোকটিকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'এত মার খেয়েও হাসছেন?' লোকটা আরো হাসতে হাসতে বললো, 'হাসবো না! লোকগুলো গাধা। ওরা হরগোবিন্দ ভেবে আমাকে মারলো। হরগোবিন্দ আমার শত্রু, আমি হলাম ভজগোবিন্দ।'

বলা বাহুল্য, আমি ওই ভজগোবিন্দের দশায় পৌঁছে গেছি। কিন্তু আমার কি দোষ?

এক অনতিবিখ্যাত আত্মজীবনীকার একদা লিখেছিলেন যে বাল্যকালে তাঁকে জাগ্‌লিংয়ের নেশায় পেয়েছিলো, জাগ্‌লিং মানে হাতে নিয়ে বল লোফা—ফটিকচাঁদ দ্রষ্টব্য। তিনি নানা যাদুকরের কাছে বল লোফা শেখেন। প্রথমে একটা বলা নিয়ে, তারপরে দুটো, তারপর তিনটে, চারটে। একসঙ্গে চারটে বল হাতে নিয়ে শূন্যে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ক্রমাগত নিরবচ্ছিন্ন লুফে নেওয়া। তাঁর গুরুদেব তাঁকে বলেছিলেন পাঁচটি বল লুফতে পারলেই তিনি মোক্ষে পৌঁছে যাবেন, সেটাই হলো কারিগরির চূড়ান্ত। সারা জীবন ধরে সেই আত্মজীবনী লেখক তাঁর সমস্ত কাজকর্ম, জীবনযাত্রার ফাঁকে ফুরসতে চেষ্টা করে গেছেন পঞ্চম বলটি আয়ত্ত করার, কিন্তু দুঃখের বিষয়, পারেন নি। এই নিয়ে তাঁর আফসোস ছিলো যথেষ্টই। কিন্তু শেষ জীবনে তিনি জেনে গিয়েছিলেন যে জাগ্‌লিংয়ে বলের সংখ্যা সর্বোচ্চ চার, কোনো পঞ্চম বল নেই, চোখে দেখে দর্শকের মনে হয় পাঁচ, ছয় বা ততোধিক বল নিয়ে ভেলকি দেখাচ্ছেন যাদুকর, কিন্তু বল আসলে চারটিই।

জাগ্‌লিংয়ের বলের সংখ্যা মাত্র চারটি হলেও, আমার রসিকতার স্টক তার চেয়ে কিছু বেশি, সবসুদ্ধ সাড়ে এগারোটি। এই সামান্য পুঁজি নিয়ে সপ্তাহের পর সপ্তাহ হাসির জাগ্‌লিংয়ের খেলা দেখানো আমি আর পেরে উঠলাম না।

ইতিমধ্যে কখনো কখনো এমন হয়েছে যে বহু কষ্টে হয়তো একটা নতুন মজার গল্প কোথাও থেকে পড়ে বা শুনে এলাম কিন্তু সেটিকে কাগুজ্ঞানস্থ করতে গিয়ে সবিস্ময়ে আবিষ্কার করেছি, অনেক আগেই অন্যভাবে তা বলা হয়ে গেছে। এ সমস্যা অবশ্য আমার একার নয়। শুধু স্থান-কাল-পরিবেশ

এবং পাত্র-পাত্রী রদবদল করে সকলকেই চালাতে হয়।

মেলবোর্ন শহরের এক বালকের কথা বলি। তার শখ ছিলো বুমেরাং নিয়ে খেলা। বুমেরাং ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিতো আর তার কাছে ফিরে আসতো। অনেক খেলে খেলে তার বুমেরাংটি যখন খুব পুরনো হয়ে গেলো, তাকে তার ঠাকুমা একটি নতুন বুমেরাং কিনে দিলেন। নতুন বুমেরাংটি হাতে পেয়ে আহ্লাদে আত্মহারা হয়ে সে যত পুরনো বুমেরাংটি ছুঁড়ে দেয়, ততই সেটা ঘুরে আসে তার কাছে। সে রেগে গিয়ে আরো জোরে ছুঁড়ে দেয়। আরো জোরে ফিরে আসে পুরনো বুমেরাং। শেষাশেষি ঐ মেলবোর্ন বালকের মতোই কাণ্ডজ্ঞানের অবস্থা দাঁড়িয়েছে। যত ত্যাগ করতে চাই পুরনো ইয়ার্কি তত ফিরে ফিরে আসে।

শেষ কাণ্ডজ্ঞানে এসব বে-আক্কেলে কথা না হয় কমই বললাম। বরং কিছু কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা যাক। চতুর পাঠক একটু চেষ্টা করলেই বুঝতে পারবেন কৃতজ্ঞতা স্বীকারের ভণিতায় এ আমার আত্মপ্রচারের চেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নয়।

এখন পর্যন্ত কাণ্ডজ্ঞানের জন্যে আমি সবচেয়ে দামী সার্টিফিকেট পেয়েছি দুর্গাপুরের অরুণ চক্রবর্তীর কাছ থেকে। তিনি পোস্টকার্ডের মারফত আমাকে শিরোপা দিয়েছেন, বলেছেন ভারতবর্ষে এখন দু'জন মাত্র লোক, একজন জ্ঞানী জৈল সিং এবং অন্যজন কাণ্ডজ্ঞানী তারাপদ রায়।

খায়রুল প্রেস থেকে নীলাঞ্জন মুখোপাধ্যায় আমাকে লিখেছেন, রাস্তায় একজন পথিকের সঙ্গে একজন হোমগার্ডের ঝগড়া বাধে। উত্তেজিত হোমগার্ড সেই ভদ্রলোককে প্রশ্ন করেন, 'একটুও কাণ্ডজ্ঞান নেই?' আশ্চর্য, এবার ভদ্রলোক ফিক করে হেসে ফেললেন। কাণ্ডজ্ঞান ব্যাপারটি হাস্যকর পর্যায়ে নামিয়ে দেওয়ার জন্যে নীলাঞ্জনবাবুর চিঠি পড়ে বুঝলাম তিনি আমার উপরে খুব খুশি।

নয়া দিল্লীর স্প্যান পত্রিকার মুরারি সাহা 'ছারপোকার কাণ্ডজ্ঞান' পড়ে আমাকে পুরনো ঢাকা শহরের একটি ছারপোকা-জর্জর ভাড়াটে বিয়ে-

বাড়ির কথা জানিয়েছিলেন, যে বাড়ির ভাঙা দেয়ালে আঁকাবাঁকা লাল অক্ষরে লেখা ছিলো, 'এই বাড়ি কেহ ভাড়া লইবেন না। লইলে ছারপোকার দংশনে টিকতে পারিবেন না। এই কথা কয়টি ছারপোকার রক্ত দ্বারা লিখিত হইল।'

ট্রেনের লেটলীলায় বন্দী দাশরথি রায় বর্ধমান স্টেশনে রাত ছটোয় একই কাণ্ডজ্ঞান তিনবার পড়েছিলেন, তারপর আমার অসীম মূর্খতায় সন্তুষ্ট হয়ে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন, 'পাণ্ডিত্যে সহজ পাঠক আমাদের কাজ নেই।'

কাণ্ডজ্ঞানের জন্যে কেউ কেউ আমাকে শুধু সদুপদেশ দেন নি, গল্পও পাঠিয়েছেন। নিউ আলিপুর থেকে শ্রীমতী প্রণতি দাস তাঁর জামাইবাবুর তোয়ালে পরার একটা কাহিনী পাঠিয়েছিলেন। চমৎকার গল্প কিন্তু গামছার উপরে কাণ্ডজ্ঞান লিখলেও তোয়ালের উপরে আর লেখা হয় নি।

বাংলা উচ্চারণ থেকে চন্দ্রবিন্দু উধাও হয়ে যাচ্ছে, চাঁদ, হাঁস আমার মতো বাঙালদের চাপে চাদ, হাস হয়ে যাচ্ছে। তবু উচ্চারণ প্রসঙ্গে ব্যারাকপুর থেকে সোমনাথ ঘোষ জানিয়ে দিলেন, "হায়! চন্দ্রবিন্দু প্রয়োগ বোধহয় লুপ্ত হতেই চললো। তবে সেদিন শেয়ালদা স্টেশনে আসার পথে বাসের মধ্যে এক মহিলা চেঁচিয়ে উঠলেন, 'পাঁচী এয়েছে? আমি নামবো।' বুঝলাম প্রাচী (সিনেমা হল) এসে গেছে।" কিন্তু এই ঘোষমশায় কি এক অজ্ঞাত কারণে তাঁর এই চিঠির কার্বন কপি এক দূরদর্শন ঘোষিকাকে পাঠিয়েছেন; দূরদর্শনের কি চন্দ্রবিন্দু জ্ঞানের অভাব হয়েছে, কি জানি?

সবচেয়ে মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা হয়েছিলো 'মাতালের কাণ্ডজ্ঞান' প্রকাশিত হবার পর; একাধিক রসিক ব্যক্তি রীতিমত উত্তেজিত হয়ে পড়েন। ইন্দ্র বিশ্বাস রোড থেকে আব্দুস সালাম বিশ্বাস লেখেন, '...আমি নিজে একজন সুরারসিক। আপনার সঙ্গে আমি দেখা করে পরিচিত হতে চাই এবং যদি আপনি নিজে সুরাসেবী হন তবে একদিন আমাদের মিলন হওয়া দরকার নয় কি?'

জানি, কেউ বিশ্বাস করবেন না যে আমি এই আশ্চর্য আমন্ত্রণ গ্রহণ

করি নি। জানি কেউ বিশ্বাস করবেন না যে এই রকম আশ্চর্য প্রেমপত্র আরো দু-একটি আমি পেয়েছি, সকলকে উল্লেখ করতে গেলে কাণ্ডজ্ঞানের সীমানায় কুলোবে না।

এবং আমি এও জানি যে কেউই বিশ্বাস করবেন না যে আমি স্বেচ্ছায়, সজ্ঞানে কাণ্ডজ্ঞান রচনা ছেড়ে দিচ্ছি। বিশ্বাস করুন কিংবা না করুন, এক আমার অন্তরাত্মা ছাড়া আর কেউ আমাকে সত্যি সত্যি জোর করে নি, ভয় দেখায় নি, মারধোর করে নি এ লেখা বন্ধ করার জন্যে।

পুনশ্চ :

শেষ নমস্কার।

এই পুজোয় একজোড়া হরিণের চামড়ার চটি কিনেছি। বড়ো বৃষ্টি হচ্ছে, দোকানীকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'বৃষ্টিতে চটির কোনো ক্ষতি হবে না তো?' দোকানী স্মিত হেসে বললেন, 'বৃষ্টিতে কি হবে? হরিণকে কখনো ছাতা মাথায় দিতে দেখেছেন?'

—